নির্বাচিত বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ-সন্ধান (১৭৭০-১৯৩৩)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে

পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

অর্ণব ঘোষ

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

ভারত

২০২২

Certified that the Thesis entitled

নির্বাচিত বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ-সন্ধান (১৭৭০-১৯৩৩)

Submitted by me for the award of the Degree of Docotor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of **Dr. Rajyeswar Sinha, Professor, Department of Bengali, Jadavpur University** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor :

Dated :

Candidate :

Dated :

স্বীকৃতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পিএচ.ডি স্তরের গবেষণা সন্দর্ভ হিসেবে লেখা হয়েছে ‘নির্বাচিত বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ-সন্ধান (১৭৭০-১৯৩৩)’। ২০১৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই গবেষণার কাজ প্রথাগত ভাবে শুরু করেছিলাম। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই।

এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা গবেষণা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আমাকে অফুরান সাহায্য করেছেন। গবেষণার রূপরেখা নির্মাণ, পদ্ধতি, অধ্যায় বিভাজন প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে তাঁর পরামর্শ আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। গবেষণার ক্ষেত্রে আমার নানা প্রশ্ন-সংশয়ের নিরসন এবং ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর উৎসাহ ছাড়া এই গবেষণা সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার বিষয় নির্ধারণের প্রাথমিক পর্বে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল কাফি। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপককে আমার শ্রদ্ধা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কর্মস্থল সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন এর অধ্যক্ষ ড. পূর্ণিমা বিশ্বাসকে। গবেষণার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ করতে এই কলেজের বাংলা বিভাগে আমার সহকর্মী অধ্যাপক ড. আফরোজা খাতুন, অধ্যাপক দেবযানী বসু (সেন), অধ্যাপক ড. অনিন্দিতা দত্ত (পাল),

অধ্যাপক অঞ্জনা চক্রবর্তী আমাকে সকল সময় সুযোগ দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বই ও পত্রিকা ইন্টারনেট মাধ্যমের পাশাপাশি নানা গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করেছি। এই কাজে জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার এর গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সাহায্য পেয়েছি। ওই গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণা সন্দর্ভটির অক্ষর বিন্যাস এবং সজ্জার কাজ অতি দ্রুত করে দিয়েছেন শুভেন্দু কৃষ্ণ তরফদার। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার কাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন আমার বন্ধু-স্বজন শ্রীময়ী ব্যানার্জী, অঙ্কনা বেতাল, শ্যামল পণ্ডা, স্বাগতা দাস, সৈকত ব্যানার্জী এবং তপন ব্যানার্জী। এঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গবেষণার ত্রুটি এবং মুদ্রণ-বানান-প্রমাদ থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সন্তোষপুর, কলকাতা অর্ণব ঘোষ

সূচিপত্র

ভূমিকা ... . ১ – ১১

প্রথম অধ্যায়: বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত পরিচয় ... ... ১২ - ৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে
তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত বিবর্তন ... ... ৫৮ - ৯৯

তৃতীয় অধ্যায়: বাঙালির ‘হিমালয় দর্শন’: হিমালয়কেন্দ্রিক
তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ-সন্ধান ... ... ১০০ - ১৫৫

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ বিশ্লেষণ ... ১৫৬ - ১৯৬

পঞ্চম অধ্যায়: মুসলমান বাঙালির তীর্থভ্রমণ কাহিনির জগৎ:
কর্তব্য ও গৌরবের কথা ... ১৯৭ - ২৩৫

উপসংহার ... . ২৩৬ – ২৩৮

গ্রন্থপঞ্জি ... . ২৩৯ - ২৪৮

ভূমিকা

বাংলা ভাষার প্রথম তীর্থভ্রমণ কাহিনি *তীর্থমঙ্গল* লেখা হয়েছিল ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে। কবি বিজয়রাম সেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের ব্যবস্থাপনায় গঙ্গাপথে তীর্থে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি পদ্যে *তীর্থমঙ্গল* রচনা করেন।[১] এর পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অজস্র তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখা হয়ে চলেছে। এই ব্যাপ্ত সময় জুড়ে রচিত হতে থাকা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি বিষয়বস্তু, উপস্থাপনের ভঙ্গিমা প্রভৃতি দিক থেকে আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্রপূর্ণ। তবে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা ভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে রচনা-রীতির দিক থেকে একটি বদল লক্ষ করা যায়। এই সময় থেকে ভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণ কাহিনি এবং উপন্যাসের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রবোধ কুমার সান্যালের *মহাপ্রস্থানের পথে* বইটিতে ভ্রমণ কাহিনি এবং উপন্যাসের আশ্চর্য সমাপতন দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে সংরূপগত দিক থেকে এ দুইয়ের মধ্যেকার নতুন সম্ভাবনা পরবর্তী সময়ের রচনাগুলির প্রবণতা এবং অভিমুখকে নিশ্চিতভাবেই কিছুটা বদলে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই গবেষণা নিবন্ধে ১৭৭০ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত লিখিত বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে যে সকল তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত কতকগুলিকে এই গবেষণা সন্দর্ভের জন্য প্রয়োজনীয় ‘প্রাইমারি সোর্স’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে কাশী, হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থ, বাংলা দেশের বিভিন্ন তীর্থ এবং ইসলামি তীর্থগুলিতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে লিখিত কাহিনি। কারণ সংখ্যা বা বৈচিত্রের দিক থেকে

সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়- বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপের বিশ্লেষণে এগুলি কার্যকরী।

এই গবেষণা সন্দর্ভের উপজীব্য বিষয় বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি। ভ্রমণকাহিনির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে নির্দেশ করা যায় তীর্থভ্রমণ কাহিনিকে। নির্দিষ্টভাবে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিকে কেন্দ্র করে গবেষণামূলক গ্রন্থ অপ্রতুল হলেও ভ্রমণকাহিনি বিষয়ক এবং তীর্থবিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানমূলক রচনা রয়েছে। এই গবেষণা সন্দর্ভ লেখার আগে প্রকাশিত ওই বইগুলি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববর্তী গবেষকদের অনুসন্ধান

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের আলোচনা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হল বীরেন সাহা লিখিত *আধুনিক বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ক্রমবিকাশ* ।[২] সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির প্রথম অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত নানা ধরণের ‘ভ্রমণ বৃত্তান্তে’র উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে লেখক আধুনিক সময়ে লেখা বাংলা ‘ভ্রমণ রচনা’র শ্রেণিগত বিভাজনকে চিহ্নিত করেছেন। তীর্থমাহাত্ম্য ও তীর্থ বিবরণ, তীর্থপ্রসঙ্গহীন দেশ-পরিচয় বা স্থান বিবরণ, ভ্রমণকেন্দ্রিক যথার্থ সাহিত্যের সূচনা, উপন্যাসোপম বা কথাসাহিত্যধর্মী ভ্রমণ কাহিনি ইত্যাদি ছয়টি শ্রেণিতে ভ্রমণ কাহিনিকে ভাগ করেছেন তিনি। বইটির পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সমকালীন ও রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়াও তাঁর আলোচনায় ‘ভ্রমণকথাতে’ সমাজ-স্বদেশের ভাবনা এবং সাম্প্রতিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের বিকাশের ধারা আলোচিত হয়েছে।

বনানী চক্রবর্তীর লেখা *বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর* বইটিতে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।[৩] সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে প্রাথমিকভাবে ভ্রমণ কাহিনির সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রমণকাহিনির সঙ্গে অন্য সংরূপ-- উপন্যাস, আত্মজীবনী, গাইডবুক, ডায়েরির সম্পর্কও আলোচিত হয়েছে এখানে। বইটিতে ভ্রমণকাহিনিকে স্থলপথে ভ্রমণ, জলপথে ভ্রমণ, বিমানে ভ্রমণ- শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এখানে বিশ শতকের আগের, এবং বিশ শতকের বাংলা ভ্রমণ কাহিনি নিয়ে সাধারণ আলোচনা রয়েছে। তাছাড়াও লেখক এখানে বিখ্যাত বাংলা ভ্রমণ কাহিনি লেখকেদের রচনার শিল্পরীতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সংক্রান্ত অপর একটি রচনা রেখা ভট্টাচার্যের লেখা *বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী (১৭৭০-১৯৬২)*।[৪] এখানে প্রথমেই ভ্রমণকাহিনি বা ভ্রমণ সাহিত্য কাকে বলে— সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ভ্রমণের বিবরণীগুলিকে কেন ভ্রমণ সাহিত্যের 'পূর্বাভাস' বলা যেতে পারে তাও আলোচিত হয়েছে এখানে।

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের লেখা *হিমালয়ের হিমতীর্থে* বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে। বইটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে।[৫] এই নতুন সংস্করণে প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কথামুখ' শীর্ষক একটি অংশ সংযোজিত হয়েছে। এই অংশে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এই আলোচনাতে ভ্রমণ ও সাহিত্যের সম্পর্ক, ভ্রমণ কাহিনি তৈরির নানা শর্ত, ভ্রমণ কাহিনির শ্রেণিবিভাগ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রমণস্থল হিসেবে হিমালয়ের কথাও এখানে আলোচিত হয়েছে।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের *জলযাত্রা (কালনা থেকে রংপুর)* বইটি উনিশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ কাহিনি। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় জলপথে কালনা থেকে রংপুর ভ্রমণ করেছিলেন এবং গদ্যে একটি ভ্রমণ কাহিনিও রচনা করেছিলেন। সেটি অনেক পরে অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।[৬] সম্পাদক এখানে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই রচনাটিকে 'বাংলা গদ্যে প্রথম ভ্রমণ সাহিত্য' হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাছাড়াও বইটিতে 'ভ্রমণ সাহিত্যের অ-আ-ক-খ' শীর্ষক একটি অংশ সম্পাদক সংযোজন করেছেন। এখানে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এই আলোচনায় বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের পূর্বসূত্র হিসেবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কয়েকটি রচনার ভ্রমণ-বিবরণীর উল্লেখ রয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে লেখা কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনি সম্পর্কেও এখানে তথ্য দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলা ভ্রমণ কাহিনির 'বহুমাত্রিকতার' দিকটি এখানে আলোচিত হয়েছে।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *ভ্রমণ কাহিনি* বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে। অনেক পরে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেটি পাতাউর জামানের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত হয়।[৭] এখানে মূল বইটির আগে সম্পাদক একটি সংক্ষিপ্ত 'ভূমিকা' অংশ সংযোজন করেছেন। এই অংশে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সম্পাদক এখানে 'ভ্রমণে'র ধারণাগত বিবর্তনের কথা বলেছেন। পাশাপাশি বইটিতে ভ্রমণ সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টাও দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়াও সম্পাদক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপরেখার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভারতের তীর্থ সংক্রান্ত আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বই Surinder Mohan Bharadwaj এর লেখা *Hindu Places of Pilgrimage: A Study in Cultural Geography*।[৮] এখানে

লেখক ভারতের প্রায় পঁচিশটি তীর্থ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাতে গুরুত্ব পেয়েছে সংশ্লিষ্ট তীর্থগুলির ক্ষেত্র সমীক্ষা। রয়েছে স্থানগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।

বাংলার তীর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণী আলোচনা পাওয়া যায় E. Alan Morinis- এর *Pilgrimage in Hindu Tradition: A Case Study of West Bengal* বইটিতে।[৯] এখানে লেখক পশ্চিমবঙ্গের তীর্থের শ্রেণি বিভাগ করেছেন। মূলত তারকেশ্বর, তারাপীঠ, নবদ্বীপের তীর্থ হিসেবে বিস্তৃত পরিচয় ও আলোচনা রয়েছে এখানে। স্থানীয়দের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং নানা বই থেকে পাওয়া বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক ওই তীর্থস্থানগুলির যাবতীয় রীতি ও কৃত্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

ভারতের তীর্থযাত্রার সংস্কৃতি বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই Rana P. B. Singh এর লেখা *Hindu Tradition of Pilgrimage: Sacred Space and System*।[১০] এখানে হিন্দু তীর্থযাত্রার ইতিহাস, তীর্থগুলির পৌরাণিক পরিচয় ও বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। তাছাড়াও আলাদা আলাদা অধ্যায়ে একান্ন শক্তিপীঠ, গঙ্গা, এলাহাবাদ প্রভৃতি তীর্থ সম্পর্কে আলোচনা আছে এখানে। বইটিতে তীর্থযাত্রা এবং পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

Samarendra Narayan Arya-এর লেখা *History of Pilgrimage in Ancient India (AD 300-1200)* তীর্থ সংক্রান্ত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই।[১১] আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে প্রাচীন ভারতের তীর্থযাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অঞ্চল অনুযায়ী ভারতের তীর্থগুলিকে ভাগ করে সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় তীর্থযাত্রার নানা ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক প্রসঙ্গ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাঙালির ভ্রমণ সংক্রান্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই হল Simonti Sen- এর লেখা *Travels to Europe, Self and Other in Bengali Travel Narratives, 1870-1910*।[১২] উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালি মহিলা এবং পুরুষদের লেখা ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনি এই বইটির মূল আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনা সূত্রে এখানে উপনিবেশের প্রভাব, বাঙালির আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়ায় ভ্রমণকাহিনির মধ্যে 'স্ব' এবং 'অপর'কে চিহ্নিত করার প্রয়াস, বাঙালির চোখে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিবরণের বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের মূল ভাবনা

এই গবেষণা সন্দর্ভে যে মূল বিষয়গুলির অনুসন্ধান করা হয়েছে সেগুলি হল—

ক) উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত লিখিত হতে থাকা বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির স্বরূপ কেমন ছিল

খ) এই স্বরূপকে বিশেষ কতকগুলি প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব কিনা

গ) এই অনুসন্ধানের সূত্রেই বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিকে নিছক তীর্থ-অন্বিত বই হিসেবে না দেখে তাদের বিকল্প পাঠ সন্ধান

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় পরিকল্পনা

নির্বাচিত বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির নিবিড় পাঠ, পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের পর গবেষণার প্রয়োজন অনুসারে পাঠভিত্তিক সমালোচনার মাধ্যমে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি বিশ্লেষণ করে গবেষণা সন্দর্ভটি লেখা হয়েছে। ভূমিকা ও উপসংহার অংশ ছাড়া সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এর সামগ্রিক বিন্যাস সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল—

- ভূমিকা

- প্রথম অধ্যায়: বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত পরিচয়

ভ্রমণ কাহিনির একটি বিশেষ অংশ বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তার প্রবেশক হিসেবে এখানে ভ্রমণসাহিত্যের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের উদ্ভবের সূত্র হিসেবে মধ্যযুগে লেখা তীর্থের বিবরণমূলক রচনাগুলির কথাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়াও এখানে রয়েছে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এই গবেষণা সন্দর্ভের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভারতীয় তীর্থ সংক্রান্ত ধারণাও এই অধ্যায়ের আলোচনার অন্যতম বিষয়। সেই সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন রচনাতে তীর্থপ্রসঙ্গের উপস্থিতির কথা।

- দ্বিতীয় অধ্যায়: কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত বিবর্তন

আধুনিক সময়পর্বের সূচনাকাল থেকে লিখিত হতে থাকা বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির উপস্থাপনভঙ্গি ও উপস্থাপনযোগ্য-বিষয়ের বিবর্তন ঘটেছে নিশ্চিতভাবেই। এই বিবর্তনের রূপরেখাটিকে একটি তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা, সময়ের নানা পর্বে লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনির নিরিখে প্রদর্শন করা যায়। এই অধ্যায়ে কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে ওই বিবর্তনের রূপরেখাটি দেখানো হয়েছে। এজন্য বিজয়রাম সেনের *তীর্থমঙ্গল*, জয়নারায়ণ ঘোষালের *কাশী পরিক্রমা*, বরদাকান্ত সেনের *ভারতভ্রমণ*, মন্মথ চক্রবর্তীর *সচিত্র কাশীধাম*, ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর *ভারত ভ্রমণ*, গোষ্ঠবিহারী ধরের *সচিত্র তীর্থ ভ্রমণ* প্রভৃতি বই ব্যবহার করা হয়েছে। বইগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে

কীভাবে আঠারো শতকের কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে তীর্থমাহাত্ম্য গুরুত্ব পেয়েছে। আবার পরবর্তী সময়ে লিখিত এই ধারার বইগুলিতে আর্য জাতি বা ভারতের অতীত গৌরবকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। সেই প্রবণতাও ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে এবং কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনি বিশ শতকের প্রথম দিকে 'গাইড বুকে'র দিকে যাত্রা করেছে।

- তৃতীয় অধ্যায়: বাঙালির 'হিমালয়-দর্শন': হিমালয়কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ-সন্ধান

হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে সব থেকে বেশি সংখ্যায় বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখা হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত হতে থাকা এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বৈচিত্রপূর্ণ। এই গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে হিমালয়কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির আলোচনা রয়েছে। এই অধ্যায়ে যদুনাথ সর্বাধিকারীর *তীর্থভ্রমণ*, স্বামী রামানন্দ ভারতীর *হিমারণ্য*, জলধর সেনের *হিমালয়*, সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থের *উত্তরাখণ্ড পরিক্রমা*, বীরেশচন্দ্র দাসের *কেদার বদরি পরিক্রমা* প্রভৃতি বইয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে উনিশ ও বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা-চেতনায় হিমালয়ের অস্তিত্ব কীভাবে এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে ধরা রয়েছে।

- চতুর্থ অধ্যায়: বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণকাহিনির স্বরূপ বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকা তীর্থগুলিকে কেন্দ্র করে লেখা কাহিনির আলোচনা রয়েছে। উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার বাইরের তীর্থে ভ্রমণকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনি লেখা হয়েছে। সেই তুলনায় বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত

তীর্থকে কেন্দ্র করে লেখা কাহিনির সংখ্যা কম। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়াও *কালীক্ষেত্র দীপিকা, চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য, বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধুজীবনী* প্রভৃতি বইয়ের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারার তীর্থভ্রমণ কাহিনির তিনটি প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়েছে—

ক) বিস্মৃতপ্রায়, বিলুপ্তপ্রায় তীর্থকে প্রচারের আলোকে আনতে অথবা জনপ্রিয় তীর্থগুলি সম্পর্কে তীর্থযাত্রীদের তথ্য জানাতে এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

খ) বিশ শতকের প্রথম দিকে লেখা বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলিতে বাংলার ভৌগোলিক ক্ষেত্রকে নানা তীর্থের স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্যমণ্ডিত ও গৌরবমণ্ডিত করে দেখানোর প্রচেষ্টা হয়েছে।

গ) বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলিতে পুরুষ এবং মহিলা লেখকদের রচনার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য প্রকাশিত হয়েছে।

- পঞ্চম অধ্যায়: মুসলমান বাঙালির তীর্থভ্রমণ কাহিনির জগৎ: কর্তব্য ও গৌরবের কথা

মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ইসলামি তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনার উৎসাহ লক্ষ করা যায়। এই অধ্যায়ে সেই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হজকেন্দ্রিক। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে দিল্লি, আজমীরের উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে মহম্মদ বরুদ্দোজার *ভ্রমণবৃত্তান্ত,* খান বাহাদুর আহচ্ছানউল্লার *হেজাজ ভ্রমণ,* মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদের *আজমীর ভ্রমণ'* প্রভৃতি বইয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামি তীর্থভ্রমণ কাহিনির দু'টি প্রবণতা চিহ্নিত

করা হয়েছে-- ক) বাংলা থেকে বহুদূরে অবস্থিত তীর্থগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য, প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা দিয়ে তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির মাধ্যমে ভবিষ্যতের যাত্রীদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এখানে তীর্থযাত্রাকে পবিত্র কর্তব্য বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খ) দিল্লি, আগ্রার মতো স্থানে পৌঁছে ইসলামের 'স্বর্ণযুগ'-এর কীর্তি দেখে এক ধরনের গৌরব এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।

- উপসংহার:

এই গবেষণা সন্দর্ভের শেষে রয়েছে উপসংহার অংশ। সেখানে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ধারণাগুলির উল্লেখ আছে। মূলত তিনিটি বিষয় এখানে উল্লেখিত হয়েছে-

ক) এই গবেষণা সন্দর্ভের মাধ্যমে ১৭৭০ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি লিখিত হওয়ার ইতিহাসের ধারণা পাওয়া যায়।

খ) একাধিক তীর্থভ্রমণ কাহিনির নিবিড় পাঠ এবং বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সন্দর্ভে বাংলার তীর্থভ্রমণ কাহিনির নানা প্রবণতার চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে।

গ) বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিকে দেখানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। ঘোষ বারিদবরণ,*অবগাহন,* সেন বিজয়রাম,*তীর্থমঙ্গল,* কলকাতা, পরশ পাথর প্রকাশন, ২০০৯

২। সাহা বীরেন, *আধুনিক বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ক্রমবিকাশ,* কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০

৩। চক্রবর্তী বনানী, *বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর,* কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৩

৪। ভট্টাচার্য রেখা, *বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী (১৭৭০-১৯৬২),* অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬

৫। দাশগুপ্ত কার্ত্তিকচন্দ্র, *হিমালয়ের হিমতীর্থে,* কলকাতা, পত্রলেখা, ২০১২

৬। চট্টোপাধ্যায় অনাথবন্ধু সম্পাদিত, *বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের জলযাত্রা (কালনা থেকে রংপুর),* কলকাতা, রূপালী, ২০১৬

৭। চট্টোপাধ্যায় বসন্তকুমার, *ভ্রমণ কাহিনি,* পাতাউর জামান সম্পাদিত, হুগলি, ছোঁয়া, ২০১৭

৮। Bharadwaj Surinder Mohan, *Hindu Places of Pilgrimage: A Study in Cultural Geography*, Berkeley, University of California Press, 1973

৯। Morinis E. Alan, *Pilgrimage in Hindu Tradition: A Case Study of West Bengal,* New Delhi, Oxford University Press, 1986

১০। Singh Rana P. B., *Hindu Tradition of Pilgrmage: Sacred Space and System,* New Delhi, Dev Publishers and Distributors, 2013

১১। Arya Samarendra Narayan, *History of Pilgrimage in Ancient India (AD 300-1200),* New Delhi, Minshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 2004

১২। Sen Simonti, *Travels to Europe, Self and Other in Bengali Travel Narratives 1870-1910,* Delhi, Orient Longman Private Limited, 2005

প্রথম অধ্যায়

বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত পরিচয়

'তীর্থভ্রমণ' বা 'তীর্থযাত্রা' একটি আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়া। বাংলার সমাজজীবনের প্রাথমিক পর্ব থেকেই এই ধরনের ভ্রমণের অস্তিত্ব আছে। এর প্রমাণ সংশ্লিষ্ট সময়পর্বের বিভিন্ন ধারার রচনাতে ভ্রমণের উল্লেখ। সংস্কৃত ভাষায় লেখা রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্রজাতীয় ধর্ম-অন্বিত রচনায় নানা তীর্থের বিবরণ, উদাহরণ, মাহাত্ম্যকীর্তন অথবা সরাসরি তীর্থে যাওয়ার নির্দেশ আছে। নিশ্চিতভাবেই এগুলি ছিল বাঙালির তীর্থযাত্রার প্রাথমিক পর্বের প্রেরণা। তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যও ছিল একান্ত ভাবেই আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে 'তীর্থে যাওয়া'র উদ্দেশ্যের বদল ঘটেছে।

এই 'তীর্থযাত্রা' বা 'তীর্থভ্রমণ'-এ যাওয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই অসংখ্য বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখা হয়েছে। তবে সেই তীর্থভ্রমণ কাহিনি সংক্রান্ত আলোচনার আগে এই সংরূপ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় দেখে নেওয়া প্রাসঙ্গিক।

ভ্রমণ-সাহিত্য

প্রথমেই আলোচ্য 'ভ্রমণ সাহিত্য' শব্দটি। সাধারণ ভাবে আমরা ভ্রমণকেন্দ্রিক যে সকল রচনাতে সাহিত্যগুণ লক্ষ করে থাকি তাকেই ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করি। এই সংরূপটি সম্পর্কে J. A. Cuddon তাঁর *Dictionary of Literary Terms and Literary Theory* বইতে জানাচ্ছেন —

> A neglected and much varied genre of great antiquity to which many famous, more or less professional or 'full-time' writers have contributed, but which has also been enriched by a number of occasional writers. For the most part these

> have been diplomats, scholars, missionaries, soldiers of fortune, doctors, explorers and sailors. The genre subsumes work of exploration and adventures as well as guide and accounts of sojourns in foreign lands।[১]

অর্থাৎ ভ্রমণ সাহিত্যের সংজ্ঞা এক কথাতে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ এই সংরূপটির পরিধি অনেকটাই ব্যাপ্ত। ইংরেজি ভাষার 'travel literature' সংরূপটির অগ্রগতি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন Carl Thompson তাঁর *Travel Writing* বইটিতে। সেখানে তিনি লিখছেন-

> For much of the twentieth century at least, the genre [Travel Literature] was usually dismissed by literary critics and cultural commentators as a minor, somewhat middle-brow form. However, travel writing's reputation rose sharply in the later part of the century, with the appearance of a new generation of critically acclaimed travel writers such as Paul Theroux, Bruce Chatwin, Ryszard Kapuscinski and Robyn Davidson. Also leading the way in this regard was the prestigious British literary journal Granta, which ran several travel-themed special issues in the 1980s and 1990s, and thereby played 'a vital part in establishing … travel writing as the popular literary form it has become'।[২]

আধুনিক সময়ের গবেষকদের মধ্যে 'travel writing' বিষয়ে নাটকীয়ভাবে আগ্রহ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে Carl Thompson মনে করেছেন যে এই সংরূপটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। Carl–এর মতে এই সংরূপটির অগ্রগতি

মানববিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানের নানা শাখাতে 'postcolonial studies'- এর চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এ ক্ষেত্রে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে 'travel writing'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে Carl প্রথমে 'travel' শব্দটির বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে-

> One definition that we can give of travel, accordingly, is that it is the negotiation between self and other that is brought about by movement in space।[৩]

এর সূত্রেই তিনি 'Travel Writing' এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবে-

> If all travel involves an encounter between self and other that is brought about by movement through space, all travel writing is at some level a record or product of this encounter, and of the negotiation between similarity and difference that it entailed"।[৪]

'Travel Writing'- এর সীমানা হিসেবে এই ধরনের একটি প্রশস্ত এলাকা নির্দেশ করার পরেও Carl স্বীকার করছেন যে 'travel writing' সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট, পরিচ্ছন্ন, জটিলতামুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কারণ, তাঁর মতে-

> The term is a very loose generic label, and has always embraced a bewilderingly diverse range of material. This is especially the case as one moves back in time, to consider travel writing in its earlier manifestations. Simultaneously, and partly as a result of this intrinsic heterogeneity, travel writing has always maintained a complex and confusing

> relationship with any number of closely related (indeed, often overlapping) genres।[৫]

অর্থাৎ এই সংরূপটি অন্য অনেকগুলি সাহিত্য সংরূপের সঙ্গে দারুণ রকম ঘনিষ্ঠ।

সম্ভবত এই কারণেই 'travel writing' সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে

> ...a notoriously raffish open house where different genres are likely to end up in the same bed. It accommodates the private diary, the essay, the short story, the prose poem, the rough note and polished table talk with indiscriminate hospitality।[৬]

ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনা পাওয়া যায় *The Cambridge History of Travel Writing* বইটিতে। সেখানে বইটির 'Introduction'-অংশে ভ্রমণ কাহিনির অস্তিত্ব বা উদ্ভব সম্পর্কে জানানো হচ্ছে-

> Travel narratives have existed for millennia: so long as people have journeyed, they have told stories about their travels. The two activities go hand in hand. In pre or non-literate societies these stories were spoken or sung or depicted in visual arts. … Yet despite differences of conception and approach, in most cultures narratives have returned repeatedly to tropes of travel. They appear in the Gilgamesh and Enkidu's journey to the Cedar Forest in what is possibly the oldest surviving piece of literature in the world, the Mesopotamian "Epic of Gilgamesh', They are as much a part of the biblical stories of the Fall or the Exodus, as they are of Kalidasa's fifth century C E classical Sanskrit

> poem Meghduta, whose lyrical, secular chorography traces the contours of India as a stray cloud carries the message of an exiled nature sprit to his distant lover।[৭]

যদিও সম্পাদকদ্বয় এর পরেই জানিয়েছেন যে, সাহিত্য হিসেবে ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে অনেক পরে-

> Despite that long history travel writing in its literary sense at least is generally thought of as a more modern phenomenon, beginning in its informational guise in the fifth and sixth centuries. Moveable print technology was a significant factor, not only helping to open up new directions for travel writing, but also offering authors a public voice and influence that would have been inconceivable in a pre-printing-press age।[৮]

এই বইটির 'introduction' অংশেই সম্পাদকদ্বয় ভ্রমণ সাহিত্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করেছেন-

> The remainder of this introduction will present some of the prominent features of travel writing in order to help our readers plot a path through the volume. Commentaries on travel writing often suggest that it has developed from straightforward factual records, usually involving journeys undertaken for purposes of trade, politics, war, or discovery (or a combination of these), to a mode that incorporates more fictional devices. … The quest is a common motif that seems to be at the heart of many travel narratives through the millennia, especially if pilgrimage is also viewed in this

> way. … The second feature is transport. The mode of travel has as much bearing on the journey and its narration as does the motivation for it. … A final consideration is that of *tradition,* both literary and lived by generations of travelers….[৯]

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সংক্রান্ত বইগুলির একটি হল রেখা ভট্টাচার্যের লেখা *বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী*। সেখানে এ বিষয়ে তিনি জানাচ্ছেন- "মানুষ তার ভ্রমণকে অপরের কাছে পৌঁছে দিতে, তার লেখনী থেকে যে বিবরণী রচিত হয়েছে- তাকে স্থায়ী করার প্রয়াস পেয়েছে তাকে বাংলা সাহিত্যে আমরা ভ্রমণ কাহিনী বা ভ্রমণ সাহিত্য নাম দিয়েছি"।[১০] তিনি আরও জানাচ্ছন যে, "ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা রসপুষ্ট হয়ে দ্রষ্টার মানস অভিব্যক্তিতে শ্রীমণ্ডিত হয়ে পাঠকের অদেখা দেশের প্রতি অথবা দেখা দেশকে পুনরায় মানস চক্ষে দেখার প্রতি আকর্ষণ জাগাতে পারে তেমন রচনা" বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে লেখা বইগুলিতে 'দুর্লভ'। তাঁর মতে ওই সময়ে লেখা বইগুলির "মাত্র দু এক জায়গায় আমরা আমাদের দেশের ভ্রমণ সাহিত্য নামধেয় সাহিত্যের পূর্বাভাস লক্ষ্য করি"।[১১] অন্যদিকে, তীর্থকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ কাহিনি লিখিত হওয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য

> আমাদের দেশের প্রথম উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী তীর্থস্থানকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। আমাদের দেশের সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। তাই তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যের একটি নূতন বিভাগের সূচনা হবে একথায় আশ্চর্যের কিছু নেই।[১২]

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে প্রবীর সরকার জানাচ্ছেন-

> ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে ট্রাভেল লিটারেচার (travel literature) বাংলায় তা-ই ভ্রমণ সাহিত্য। কিন্তু উপন্যাস বা ছোটগল্প যে ইউরোপীয় ছোঁয়া নিয়ে বাংলায় এসেছে ভ্রমণকথার ক্ষেত্রে সে কথা খাটেনা। এ কোনো নতুন সংরূপ নয়, বরং উপন্যাস গড়ে ওঠার কিছু আগে থেকেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল এই রূপটি।[১৩]

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বীরেন সাহা তাঁর *আধুনিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* বইতে লিখেছেন যে-

> আধুনিক বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে একথা বলা দরকার যে ভ্রমণকে উপলক্ষ্য বা কেন্দ্র করে রচিত সকল শ্রেণির বর্ণনা, বিবরণ, বৃত্তান্ত ইত্যাদি ব্যাপক অর্থে সবই ভ্রমণসাহিত্য। তবে শুধু পর্যটনের ধারাবাহিক বা আনুপূর্বিক বিবরণ বা প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতার বর্ণনা নয়, সাহিত্যের স্বাদই ভ্রমণ সাহিত্যের মূল আকর্ষণ। ভ্রমণসূত্রে আহৃত স্থান বা দেশ সম্পর্কিত তথ্য তখনই প্রকৃত সাহিত্য হয়ে ওঠে যখন তাতে পর্যটক লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ, উপলব্ধির এবং প্রকাশ ভঙ্গির ছাপ থাকে।[১৪]

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত *ভ্রমণ কাহিনি* বইটির নতুন সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন পাতাউর জামান। সেখানে তিনি ভ্রমণ-নির্ভর সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখছেন-

> ভ্রমণ, ভ্রমণসাহিত্য আর ভ্রমণকাহিনি- তিনটি শব্দ পরস্পর সমার্থক নয়। ... ভ্রমণকাহিনি যখন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাওয়া বা বর্ণনা করা হয়, তখন সেখানে আখ্যানের মতো চরিত্র থাকে, ঘটনা

থাকে। এমনকী একটা প্লটও থাকে। কিন্তু চরিত্র, ঘটনা এবং প্লটকে উপন্যাস বা গল্পের মতো একটু সুতোতে বাঁধা হয় না। আর ভ্রমণ কাহিনি তখন সাহিত্যের মর্যাদাভুক্ত হয় যখন তা সাহিত্যের মতো আনন্দ দানে সমর্থ হয়। ভ্রমণকারীর ভ্রমণের আনন্দে অংশীদারীত্ব যখন তাঁর রচনার গুণে সাহিত্য পদবাচ্য আনন্দদানে সমর্থ হয়, তখন সেটা ভ্রমণ সাহিত্য হয়।[১৫]

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের উদ্ভবের সূত্র

মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন বইতে তীর্থ বা তীর্থযাত্রার বিস্তৃত উল্লেখ থাকলেও সেগুলিকে তীর্থভ্রমণ কাহিনি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কেননা সেখানে এই সংরূপের প্রধান শর্ত- প্রত্যক্ষ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার লিখিত প্রকাশ- বিষয়টি অনুপস্থিত। প্রকৃত অর্থে প্রথম বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি হল আঠারো শতকের শেষ দিকে (১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে) কবি বিজয়রাম সেনের লেখা *তীর্থমঙ্গল*। পদ্যে লেখা বইটি যদিও প্রকাশিত হয়েছিল অনেক পরে, ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে। উনিশ এবং বিশ শতক জুড়ে বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণে ভ্রমণ কাহিনি তথা তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখা হতে থাকে। সাহিত্যের এই একটি নির্দিষ্ট সংরূপের এমন ব্যাপক প্রসারের কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়।

ক) উনিশ শতকের প্রধান লক্ষণ হল শিক্ষার প্রসার। এর ফলে বাংলায় একটি শিক্ষিত লেখক সমাজের পাশাপাশি সাক্ষর পাঠক সমাজ গড়ে উঠেছিল- এক কথায় বই পড়ার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

খ) এই পাঠক সমাজের পাঠের ইচ্ছাকে পূরণ করতে উনিশ শতকেই বাংলা ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যাতে পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল। সেখানে একাধিক তথ্যমূলক, কল্পনামূলক অথবা

তত্ত্বমূলক রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল। সেই সূত্রেই বাংলা গদ্যে নানা প্রকরণের প্রবন্ধ, উপন্যাস-ছোটগল্প কিম্বা ভ্রমণ কাহিনি ধরনের সংরূপের ক্রমবিকাশ ঘটে।

গ) ভ্রমণ কাহিনি সংরূপটি এই সময়ে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কেননা এখানে বাস্তবের তথ্য সন্নিবেশ এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে কল্পকাহিনির বিস্তার- দু'টিরই অবকাশ রয়েছে।

ঘ) তাছাড়াও উনিশ শতক থেকেই শিক্ষিত, আধুনিক বাঙালির মধ্যে নিজের পরিপার্শ্বকে, ভূগোলকে জানবার আগ্রহ গড়ে ওঠে। এই সময়ে একাধিক ভূগোল বিষয়ক বইয়ের প্রকাশ সে বিষয়টিকে প্রমাণ করে। ভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণ কাহিনি এই চাহিদার অন্যতম জোগানদার হয়ে উঠেছিল।

ঙ) পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি ভ্রমণকে সামাজিক বা ধর্মীয় প্রক্রিয়া হিসেবেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং ভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এই ভ্রমণের স্পৃহা আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি- বিশেষত রেলওয়ে প্রচলিত হওয়ার পরে। অজানা-অদেখা কে জানবার-দেখবার ইচ্ছা, সে বিষয়ে শিক্ষিত-তথ্যসমৃদ্ধ হওয়ার বাসনা থেকে অভিযান ধরনের ভ্রমণের প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। আবার দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত, ভ্রমণকারীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোযুক্ত, পরিচিত স্থানে (যা বেশির ভাগক্ষেত্রেই সুপরিচিত তীর্থস্থান) নিরাপদ-নিশ্চিন্ত ভ্রমণের প্রসারও ঘটেছিল। দু'টি ক্ষেত্রেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে কাহিনি রচনা ও প্রকাশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

চ) ভ্রমণের শিক্ষামূলক দিকটি ছাড়াও উনিশ শতকের ব্যস্ত-বদ্ধ নাগরিক পরিসরে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারের অন্যতম উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভ্রমণ। এর বাইরে সংশ্লিষ্ট সময়ে

পেশাগত প্রয়োজনেও শিক্ষিত বাঙালি দেশের বা বিদেশের নানা অংশে ভ্রমণ করছেন। অধিকন্তু, ভ্রমণের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যটিও (তীর্থযাত্রা) সমাজে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। আর এই ধরনের সকল ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই যথেষ্ট সংখ্যায় কাহিনি লেখার প্রবণতা সক্রিয় হয়েছিল।

ছ) উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দিকে ভ্রমণকে আমরা রাজনৈতিক প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখছি। এখানে দেশকে জানা, জাতি গঠন কিম্বা পাশ্চাত্যের বিপরীতে নিজেদের পরিচিতি নির্মাণের উপায় হিসেবে ভ্রমণ এবং ভ্রমণকাহিনি রচনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা তাঁর একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে লিখেছেন- "উনিশ শতকে 'ভ্রমণ'কে আখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবেই আমরা বেশি চিনেছি। এর পেছনে আধুনিক মানুষের 'will to record'- মানসিকতা প্রবল। এটা তার আত্মপরিচয় নির্মাণের অংশ"।[১৬]

এই সকল কারণে উনিশ শতকেই বাংলা ভ্রমণকাহিনি একটি প্রতিষ্ঠিত সংরূপে পরিণত হয়ে যায়। আর বিশ শতকে সংরূপটি বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে আরও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। এই ভ্রমণকাহিনিগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় রয়েছে তীর্থভ্রমণ কাহিনি। এই গবেষণা সন্দর্ভে নির্বাচিত ভ্রমণকাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপরেখা

সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুরাণ, মহাকাব্য, স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে তীর্থ ভ্রমণের নির্দেশ বা তীর্থের মাহাত্ম্য বা তীর্থস্থানের বিবরণ বিস্তৃতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে লেখা প্রচুর রচনায় বিস্তৃতভাবে নানা তীর্থের বিবরণ বা মাহাত্ম্য দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মীয়

প্রসঙ্গে লিখিত এই তীর্থভ্রমণের বিবরণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্জিত এবং লোকশ্রুতি নির্ভর। তাছাড়াও এগুলি অন্যের তীর্থভ্রমণের বৃত্তান্ত মাত্র, কখনোই স্রষ্টার নিজের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রকাশরূপ নয়। তাই এগুলিকে 'ভ্রমণ কাহিনি' হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। যেমন, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের লেখা মনসামঙ্গল মধ্যযুগের বাংলার একটি বহুল প্রচলিত বই। এখানে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার পথ প্রসঙ্গে নানা দেবস্থান বা তীর্থস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়- ক) "স্নান তর্পণ করি কৈল ইষ্ট পূজা/ পূজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদো মহারাজা"।[১৭] খ) "পূজিল নিমাই তীর্থ করিয়া উত্তম/ নিম গাছে দেখে জবা অতি অনুপাম// ... খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দণ্ডবত/ বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত//"[১৮] গ) "চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা/ ..." [১৯] ঘ) "সঙ্কেত মাধবে পূজে হইয়া একমন/ তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পিত্রির তর্পণ//"[২০] ঙ) "তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশ/ তীর্থকার্য করিল রাজা পরম হরিষে//"[২১]। কিন্তু এই জাতীয় রচনা নিছক ভ্রমণবিবরণী হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে, তা ভ্রমণ কাহিনি হয়ে ওঠে না।

বাংলা ভাষায় প্রথম ভ্রমণ কাহিনির সূত্রপাত ঘটে আঠারো শতকে। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়রাম সেনের লেখা *তীর্থমঙ্গল* বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম তীর্থভ্রমণ কাহিনি। "ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (ইনি নিজেও একটি ভ্রমণকাহিনি রচনা করেন – 'কাশীখণ্ড')-এর পিতা এবং কন্দর্প ঘোষালের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা করেন"। তাঁর সঙ্গে যান কবি বিজয়রাম সেন- সম্ভবত চিকিৎসক হিসেবে। তাঁরই পরামর্শক্রমে বিজয়রাম এই *তীর্থমঙ্গল* কাব্যটি রচনা করেন। 'সঙ্গীত অভিলাষী' এই কবি কাব্য রচনা করে সেটি আসরে পড়ে বা গান গেয়ে শোনান। অনেক পরে ১৩২২ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু রচনাটি সম্পাদনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন।[২২] এরপর থেকে উনিশ শতক এবং বিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিপুল সংখ্যাতে ভ্রমণ কাহিনি লেখা হতে থাকে।

বাংলা ভ্রমণ কাহিনি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুবিমল মিশ্র জানাচ্ছেন-

> উনিশ শতকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এই শতকেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উন্মেষ ও পরিপুষ্টি। ভ্রমণ কাহিনি ও ট্রেভেলগ তাদের অন্যতম।[২৩]

বস্তুত উনিশ শতকের আগে আমরা বাংলা ভাষায় লেখা দু'টি ভ্রমণ কাহিনির সন্ধান পাই। প্রথমটি ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা কবি বিজয়রাম সেনের *তীর্থমঙ্গল,* যেটি দীর্ঘ দিন পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি হল ১৭৯৬-৯৭ খ্রিষ্টাব্দে লেখা জয়নারায়ণ ঘোষালের *কাশী পরিক্রমা*। এটিও নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকে লেখা বাংলা ভ্রমণ কাহিনিগুলির উল্লেখের আগে অন্য একটি বইয়ের কথা এখানে বলে নেওয়া প্রাসঙ্গিক। সেটির নাম হল *শিগার্ফ-নামা-ই-বিলায়েত*। এখনকার নদীয়ার চাকদহের পাঁচনূরের অধিবাসী মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দিন ফারসি ভাষায় ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে *শিগার্ফ-নামা-ই-বিলায়েত* নামে একটি বই লিখেছিলেন। এটি হল বাঙালির লেখা প্রথম বিলেত ভ্রমণ কাহিনি, যদিও এর ভাষা বাংলা নয়।

> তিনি প্রথমে বাংলার নবাব মীরজাফরের অধীনে চাকরি করতেন। মীরকাশিম নবাব হলে তিনি ইংরেজের হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। পরে বাদশাহ শাহ আলমের অধীনে কর্মরত থাকা কালে বাদশাহ তাঁকে ইংলণ্ড রাজ তৃতীয় জর্জের কাছে পত্রবাহক হিসেবে

> পাঠান। এদিক দিয়ে তিনিই প্রথম ইউরোপ ভ্রমণকারী বাঙালি। ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেশে ফেরেন এবং তাঁর বিলেত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন।[২৪]

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গবেষক বীরেন সাহা জানাচ্ছেন-

> ... এ কথা স্মরণীয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে এই সময়ের (উনিশ শতকের প্রথম পর্বে) নতুন শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজি সাহিত্যের ভ্রমণকাহিনি ও দেশ আবিষ্কারের নানা কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ফলে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের যথার্থ নবযুগের সূচনা ঘটে। শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক, যাজক ও এদেশীয় লেখকরা শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে দেশবিদেশের- ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে জ্ঞানচর্চার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বেশ কিছু পুস্তক রচনা করেছিলেন।[২৫]

এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত এবং শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগদর্শনে'র প্রথম সংখ্যাতে (এপ্রিল ১৮১৮) কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ ও আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনি প্রকাশিত হওয়ার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও, উইলিয়াম কেরীর *কথোপকথন* (১৮০১) প্রসঙ্গে বীরেন সাহা মনে করেন যে "সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণের ফলেই তৎকালীন কথ্য বাংলা ভাষার এই সংকলনটি কেরীর পক্ষে প্রণয়ন করা সম্ভব হয়"।[২৬] পাশাপাশি তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস্ কেরী জন বুনিয়নের লেখা বিখ্যাত বই *The Pilgrims Progress* দুই খণ্ডে বাংলায় অনুবাদ করেন। "এই গ্রন্থের নাম 'যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ

অর্থাৎ ইহলোক হইতে পরলোক গমন বিবরণ'। প্রথম খণ্ডটি ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৭]

> গ্রন্থ হিসেবে ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হওয়ার আগে উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্রিকায় ভ্রমণকেন্দ্রিক রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। রামমোহন রায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। কাশীতে, তিব্বতে, ভুটানে ইংলণ্ডে তাঁর অবস্থানের কথা তাঁর জীবনীকাররা উল্লেখ করেছেন। তাঁর অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, রামমোহন তাঁর সম্পাদিত 'সম্বাদকৌমুদী' পত্রিকায় তাঁর বাল্য ভ্রমণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[২৮]

তাছাড়াও 'সমাচার দর্পণে'র পাতাতে আমরা ভ্রমণকেন্দ্রিক অনেকগুলি লেখার উপস্থিতি লক্ষ করতে পারি। ১৮১৮ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যবর্তী সময়ে এখানে গঙ্গাসাগর, কাশী, বক্রেশ্বর, বর্ধমান, সংক্রান্ত অনেকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়।[২৯] ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণে' চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ বিষয়ে দুটি চিঠি প্রকাশিত হতে দেখছি। প্রথমটিতে "আন্দুল নিবাসী এক ব্যক্তি তাঁর চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের কাহিনি বিবৃত করে লিখছেন- 'গত মে মাসের ১৭ দিবসে আমি এই উত্তম শীতল স্থানে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে এখানকার জল ও বায়ু অত্যন্ত সুন্দর।...".[৩০] দ্বিতীয়টিতেও চেরাপুঞ্জির বিবরণ পাওয়া যায়। এই "পত্রলেখকের নাম লাল সিং। তিনি ছিলেন চেরাপুঞ্জির দারোগা".[৩১] শুধু 'সমাচার দর্পণ' নয়, সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকাতেও ভ্রমণকেন্দ্রিক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার ইউরোপে ভ্রমণের সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। এর মধ্যে থেকে নয়টি চিঠি বাংলায় অনূদিত হয়ে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'ও ভ্রমণকেন্দ্রিক রচনা প্রকাশিত হতে দেখি। পত্রিকার

সম্পাদক নিজের ১২৫৬ বঙ্গাব্দে থেকে এক বছর সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ করেন। "পত্রাকারে তাঁর এই ভ্রমণের বিবরণ ... 'সংবাদপ্রভাকর'- এ ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ১ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে সংখ্যায় *ভ্রমণকারি বন্ধুর লিখিত বিষয়* এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়"।[৩২] ঈশ্বর গুপ্ত দ্বিতীয়বার ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ 'স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং দেশ ভ্রমণের' জন্য উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি জায়গায় গিয়েছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত চিঠির আকারে *ভ্রমণকারি বন্ধু হইতে প্রাপ্ত* -এই নামে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের তিনের দশক থেকে পত্রিকার পাশপাশি বই হিসেবেও একাধিক ভ্রমণকেন্দ্রিক বাংলা রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- নীলমণি বরাটের *তীর্থকৈবল্যদায়ক গ্রন্থ* (১৮২৮), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দুটি বই *শ্রীশ্রী গয়াতীর্থ বিস্তার* (১৮৩১) এবং *পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা* (১৮৪৪), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের *দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ* (১৮৫৭), কেদারনাথ দাসের *ভারতবর্ষের প্রতীচী দিগ্বিহার* (১৮৭১), রমেশচন্দ্র দত্তের *ইউরোপে তিন বৎসর* (১৮৭৪), রাজেন্দ্রমোহন বসুর *কাশ্মীর-কুসুম* (১৮৭৫) ইত্যাদি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিশেষ করে সাতের দশক থেকে বাংলা ভ্রমণ কাহিনি রচনা ও প্রকাশের দারুণ উদ্যম লক্ষ করা যায়। এই সময় থেকে বিশ শতকের শুরু পর্যন্ত একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় বাংলা ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে- যা এই সংরূপটিকে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বরদাকান্ত সেনগুপ্তের *ভারত ভ্রমণ* প্রথম খণ্ড (১৮৭৭) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৯), দুর্গাচরণ রায়ের *দেবগণের মর্ত্যে আগমন* (১৮৮০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* (১৮৮১), *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী* (১৮৯১), প্রমথনাথ বসুর *লণ্ডনের নক্সা ও ফ্রান্স ভ্রমণ* (১৮৮৪), কৃষ্ণভাবিনী দাসের (বঙ্গমহিলা) *ইংলণ্ডে*

বঙ্গমহিলা (১৮৮৫), রসিক কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত*-এর প্রথম খণ্ড (১৮৮৭) খ্রিষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বোম্বাই চিত্র* (১৮৮৮), শিবনাথ শাস্ত্রীর *ইংলণ্ডের ডায়ারী* (১৮৮৮), প্রসন্নময়ী দেবীর *আর্য্যাবর্ত্ত* (১৮৯০), এ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত *দার্জ্জিলিং ভ্রমণ* (১৮৯০) জানকীনাথ বসাকের *মণিপুর প্রহেলিকা* (১৮৯১), সারদাপ্রসাদ *ভট্টাচার্যের অমরনাথ* (১৮৯৫), দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর *উৎকল ভ্রমণ* (১৮৯৫), তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দার্জিলিং-প্রবাসীর পত্র* (১৮৯৫), গিরিন্দ্রনন্দিনী দেবীর *ঢোলপুর* (১৮৯৬), স্বামী বিবেকানন্দের *পরিব্রাজক* (১৮৯৯), জলধর সেনের *প্রবাস-চিত্র* (১৮৯৯), *হিমালয়* (১৯০০), *পথিক* (১৯০১), স্বামী রামানন্দ ভারতীর *হিমারণ্য* (১৯০১), চুনীলাল বসুর *জুরী যাইবার পথে* (১৯০২), প্রিয়নাথ বসুর *প্রোফেসর বোসের অদ্ভুত ভ্রমণ বৃত্তান্ত* (১৯০২), দুর্গাচরণ রক্ষিতের *ভারত প্রদক্ষিণ* (১৯০৩), হেমদাকান্ত চৌধুরীর *পুরীর চিঠি* (১৯১১), হেমলতা দেবীর *নেপালে বঙ্গনারী* (১৯১২)।

এখানে উল্লেখ্য যে উপরের রচনাগুলি বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার আগে সমকালীন পত্রিকাতে প্রকাশ লাভ করেছিল। 'ভারতী' পত্রিকাতে সত্যেন্দ্রনাথের *বোম্বাই চিত্র* বা রবীন্দ্রনাথের *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী* ছাড়াও প্রকাশ পেয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর *দারজিলিং পত্র*। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনী সুধা' বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* ধারাবাহিকভাবে ১৮৮০ থেকে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'সুরভি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রাজনারায়ণ বসুর লেখা ভ্রমণ কাহিনি *চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশ ও গৌড় ভ্রমণ*। এটি পরে তাঁর আত্মজীবনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে 'নব্যভারত' পত্রিকায় ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর *উৎকল ভ্রমণের বৃত্তান্ত*। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল প্রসন্নময়ী দেবীর *আর্য্যবর্ত্ত* বা দুর্গাচরণ রক্ষিতের *ভারত প্রদক্ষিণের* কিছু অংশ। 'নব্যভারত'

ছাড়াও সমসাময়িক পত্রিকা ‘নবভারত’ বা ‘সাহিত্য’-তেও বেশ কিছু ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় পনের-ষোল বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় একাধিক বাংলা ভ্রমণ কাহিনি বা ভ্রমণকেন্দ্রিক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলি হল বিজয়রাম সেনের *তীর্থমঙ্গল*, জয়নারায়ণ ঘোষালের *কাশী পরিক্রমা*, যদুনাথ সর্বাধিকারীর *তীর্থ ভ্রমণ*, এবং “১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু নরহরি চক্রবর্তীর ‘ভক্তিরত্নাকর’ থেকে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ ভ্রমণের বিবরণ উদ্ধার করে ‘ব্রজ পরিক্রমা’ ও ‘নবদ্বীপ-পরিক্রমা’ নামে দুটি তীর্থবিবরণমূলক পদ্য রচনা” বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন।[৩৩]

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রবোধকুমার সান্যালের ভ্রমণ কাহিনিগুলি। এর ফলে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সংরূপগত দিক থেকে এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর *মহাপ্রস্থানের পথে* (১৯৩৩), *অরণ্যপথ* (১৯৩৭), *পর্যটকের পত্র*, *গঙ্গা পথে গঙ্গোত্রী*, *দেবতাত্মা হিমালয়* (১৯৫৫), *উত্তর হিমালয় চরিত* পরিধি ও গৌরব অনেক অংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, সমরেশ বসু, জ্যোর্তিময় ঘোষ দস্তিদার (শঙ্কু মহারাজ), নবনীতা দেবসেন প্রমুখ লেখকদের রচনায় বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সংরূপটি পরিপুষ্ট হয়েছে।

এই ভাবে উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে বাংলা ভাষায় প্রচুর সংখ্যাতে ভ্রমণ কাহিনি তৈরি হয় এবং বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংরূপ হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। এই বাংলা

ভ্রমণ কাহিনির একটি বিশেষ অংশ হল বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি। এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল উপজীব্য হল বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি।

তীর্থ সংক্রান্ত ধারণা

বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির নানা দিক সম্পর্কে আলোচনার আগে দেখে নেওয়া দরকার বাংলা তথা ভারতীয় জনজীবনে কীভাবে এই 'তীর্থ' বা 'তীর্থযাত্রা' নামক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটল। এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতামত। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ধর্মকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করেছেন ক) বৈদিক খ) বেদবাহ্য। তাঁর মতে- "বৈদিক সভ্যতা ভারতে এসে যাগযজ্ঞময় কর্মকাণ্ড নিয়ে তার যে সংস্কৃতিটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার মূল স্থান হল যজ্ঞবেদী। যজ্ঞবেদীরই চারিদিকে বৈদিক সংস্কৃতির শিক্ষায়তনটি ক্রমে গড়ে উঠল। আর বেদবাহ্য যে অপূর্ব সভ্যতা ভারতে ছিল, তীর্থগুলিকে আশ্রয় করে অগ্রসর হওয়ায় 'তৈর্থিক' বলে তা পরিচিত হল। এই তৈর্থিক সভ্যতার মধ্যে অনেক উন্নত ও মহৎ ভাব ছিল, বৈদিক সভ্যতা ক্রমে সেগুলির দ্বারা ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠতে লাগল"।[৩৪] অর্থাৎ তাঁর ধারণা অনুযায়ী তীর্থের সংস্কৃতি বৈদিক নয়। তা আরও প্রাচীন 'বেদবাহ্য যে অপূর্ব সভ্যতা'- তারই অংশ। সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যখন বৈদিক আচার ও বেদপূর্ব বিশ্বাস সমন্বিত হয়ে হিন্দু ধর্মের কাঠামোটি নির্মিত হচ্ছিল, তখনই 'তীর্থ' নামক সংস্কৃতিটির হিন্দু ধর্মে অনুপ্রবেশ ও বিকাশ ঘটে।

তবে এই বিষয়ে ভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। *Pilgrimage And Fairs: Their Bearing On Indian Life* প্রবন্ধে ভারতে তীর্থের উৎপত্তি সম্পর্কে স্বামী পবিত্রানন্দ লিখছেন-

> In ancient India there were many asramas (hermitage) where rsis used to live far away from the haunts of men, in quiet solitude devoting their time to spiritual culture. They would naturally draw person of a religious frame of mind who would now and then go to them for guidance and advice. Those asramas in course of time became places of pilgrimage to a wide circle of people.[৩৫]

অর্থাৎ, তাঁর মতে প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমগুলি আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে সাধারণ মানুষদের আকর্ষণ করত। পরবর্তী সময়ে এই আশ্রমগুলিই 'তীর্থ' হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি তিনি লিখছেন-

> … all the places associated with the life activities of Rama, Krsna and other such mighty souls, … places which had some connection with any incident narrated in Puranas- সেই স্থানগুলিও তীর্থ হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকে।[৩৬]

এছাড়াও তিনি মনে করছেন যে,

> As Hinduism began to spread through its cultural conquest or its assimilation of the aboriginal tribes, the number of sects in Hinduism began to increase. And every sect began to regard the places connected with the name of its founder as holy, and they became in the course of time places of pilgrimage।[৩৭]

স্বামী পবিত্রানন্দ অবশ্য মন্দির কেন্দ্রিক তীর্থগুলি তৈরি হওয়ার কারণ হিসেবে বলছেন-

> With the rise of Mahayana school of Buddhism, image worship came largely into vogue amongst the Hindus also. Thus arose the necessity of building temples for worship.

> Every place where a big sanctuary was built and worship was performed with gorgeous ceremonials began to attract crowds of people and became a place of pilgrimage to following generations.[৩৮]

অন্য দিকে ভারতীয় তীর্থের উৎপত্তি এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামী অগেয়ানন্দ ভারতী তাঁর *Pilgrimage in Indian Tradition* প্রবন্ধে তীর্থযাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে জানাচ্ছেন-

> The merit of travelling per se, not of the more specified travelling for pilgrimage, appears to be first mentioned in Vedic times. The God Indra says to king Harischandra, 'There is no happiness for the person who does not travel; living amongst men, even the best man frequently becomes a sinner; for Indra is the traveler's friend. Hence travel'. Yet it appears that pilgrimage proper is not mentioned in Vedic literature.[৩৯]

অর্থাৎ তাঁর মতে বৈদিক সাহিত্যে ভ্রমণের উল্লেখ থাকলেও তা কখনোই 'তীর্থযাত্রা'র গুরুত্ব বা পবিত্রতা অর্জন করেনি। উদাহরণ হিসেবে তিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে ইন্দ্র-হরিশ্চন্দ্র অংশের উল্লেখ করেছেন। অগেয়ানন্দের মতে যাস্কের নিরুক্ত কিম্বা মনুসংহিতাতেও তীর্থযাত্রার মহিমাময় উল্লেখ নেই-

> Yaska's Nirukta does not list pilgrimage the meaning of Yatra. ….. Even much later, Manu does not regard visit to Ganges or to Kurushekshtra- a very ancient sacred site- as meritorious.[৪০]

তাঁর মতে মহাভারত বা পৌরাণিক সময় পর্ব থেকেই তীর্থযাত্রা পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হতে শুরু করেছে-

> … to my knowledge there are no pilgrimages enjoyed, nor even recommended, in any literature earlier than the Mahabharata and Puranas.[৪১]

মহাভারত বা পুরাণের পাশাপাশি স্মৃতিশাস্ত্রগুলির মধ্যে গৌতমই যে প্রথম তীর্থকে গুরুত্ব দিলেন- সেকথাও উল্লেখ করেছেন অগেয়ানন্দ-

> The law-teacher Gautama (ca. 200B.C.) however, declares "all mountains, all rivers, holy lakes, thirthas (places of pilgrimage) the abode of seers, cow-pens, and temples of gods are sin-destroying localities.[৪২]

মধ্যযুগ এবং আধুনিক সময়ে তীর্থের ক্রমবিকাশ বিষয়ে তাঁর ধারণা-

> Medieval and modern pilgrimage is certainly due to Brahmin revival, and to the ruralisation of religion in the Hindu Middle Ages through its partial absorption into local, non-Brahmanic cults.[৪৩]

তীর্থ ও তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে অবশ্য রাণা পি. বি. সিং ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে-

> The notion of *tirtha* symbolises at least four connotations in ancient Hindu literature: 1) a route to a place where one can receive power (*Rig Veda*, RgV 1. 169. 6; 1.173.11); 2) the bank of a river where people can dip in the water as a rite of purification (RgV 8.47.11; 1.46.8); 3) the sacred site itself

> which possesses the power of manifestation (RgV 10.31.3); 4) places that sacrilized based upon divine happenings and work of the god(s) that took place there (*Satapatha Brahmana* 18.9).[৪৪]

অর্থাৎ তাঁর মতে প্রায় বৈদিক সময় থেকেই 'তীর্থ' শব্দের সঙ্গে পবিত্রতার ধারণা যুক্ত হয়ে আছে।

'তীর্থ' শব্দটির উৎপত্তি এবং অর্থের বিচার করে তীর্থের ধারণার বিবর্তন সম্পর্কে খোঁজ চালাতে চেয়েছেন অনেক গবেষক। এই ধারার একজন হলেন Knut A. Jacobsen। তিনি বুৎপত্তিগত দিক থেকে 'তীর্থ' কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে-

> The Sanskrit word *tīrtha* is derived from the verbal root *tr.* , which means to cross over (a river), step over or sail across. The causative form of the verb (*tārayati*) denotes to rescue, save and liberate and has the meaning of salvific. The basic intention of calling a pilgrimage place a *tīrtha* seems perhaps to refer to the ability of the place to grant people salvific liberation – the salvific power of place. Perhaps the word also refers to the presence of divinities at the place – that is, their crossing over, in the same meaning as *avatāra*, from the same root *tr.* (and with the prefix *ava*: "down"). In this way, the meaning of *tīrtha* can be a place where salvific and divine power is available. The term *tīrtha* does not seem to have been etymologically derived from a dualism of sacred and profane.[৪৫]

Knut A. Jacobsen এর মতোই 'তীর্থ' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বুৎপত্তিগত আলোচনা পাওয়া যায় Diana L. Eck- এর 'Indian's Tirthas: *"Crossings" in the Sacred Geography* প্রবন্ধে। সেখানে তিনি জানাচ্ছেন-

> In the wider Hindu tradition, these places, particularly those associated with waters, are often called tirthas, and pilgrimage to these tirthas is one of the oldest and still one of the most prominent features of Indian religious life. A tirtha is a 'crossing place', a 'ford,' where one may cross over to the far shore of a river or to the far shore of the worlds of heaven. Hence, tirtha has come to refer to these places of pilgrimage, where the crossing might be safely made. The word tirtha is from the Sanskrit verb tr/tarati, meaning 'to cross over'. The noun tirtha means a ford, as well as any watering or bathing place. It sometimes means a path or passage more generally. The root verb tr includes subsidiary meanings-to master, to surmount, to fulfill, to be saved-as well as its primary meaning, to cross. The noun taraka, also derived from tr, means a boat or ferry, as well as a pilot or savior. Tirtha, with its many associations, is a word of passage. It refers not to the goal, but to the way, the path one travels.[৪৬]

তীর্থ সংক্রান্ত ধারণার এই নানা ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে সমরেন্দ্র নারায়ণ আর্যের মতামত বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি তাঁর *History of Pilgrimage in Ancient India, (AD 300-1200)* বইটিতে জানাচ্ছেন-

> The Term tirtha has been referred to in the Rgveda at several places. On the basis of these reference some scholars think that the idea of tirtha as a place of pilgrimage goes back to the time of Rgveda. It is however imperative to consider the meaning of tirtha referred to in the Rgveda. Tirtha means way or path in certain hymns. In some other passages the term tirtha means a high bank of a river as two hymns of Rgveda suggest. … The Taittirriyasamhita and the Vajasaneyisamhita repeat the same statement. The term tirtha also appears in the Arthasastra of Kautilya in the sense off a government department. … It is from the early Christian era that the term tirtha began to be used in the sense of a holy place or a place of pilgrimage.[৪৭]

অর্থাৎ তিনি স্পষ্টই বলছেন যে ঋগ্বেদে 'তীর্থ' শব্দটি 'পবিত্রস্থান' অর্থে নয়, ব্যবহৃত হয়েছে 'পথ' অর্থে। এবং খ্রিষ্টিয় প্রথম শতকের শুরুর সময় থেকে 'তীর্থ' অর্থে পবিত্রস্থানকে বোঝানো প্রচলিত হয়। তাঁর মতে —

> The early centuries of the Christian era marked the beginnings of a new religious ethos which called for new religious motivation and broaden social responses. Many of the old practices either passed out of use or took on an entirely new significance. The Yajna rituals were discontinued and the client priest relation was fast conforming to the social and economic milieu. Temples and image worship were soon to become the most popular forms of religious expression. The proclamation of certain places as tirtha and brahmanical exhortations relating to the

practice of pilgrimage can be stood only in the background of these new religious development.[৪৮]

অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সময়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেক পুরোনো আচারের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং যজমান-পুরোহিতের সম্পর্কের বদল ঘটতে থাকে। প্রচলিত হয় নতুন রীতি যার একটি হল তীর্থযাত্রা। সমরেন্দ্র নারায়ণ আর্য এখানে তীর্থের ক্রমবিকাশের আর্থ-সামাজিক কারণও নির্দেশ করেছেন-

Although there were several reasons for the development of the practice of pilgrimage, the decline of the commerce and the gradual decay of urban centres seemed to have contributed in large measure to this process. Most of the urban settlement which declined from about the third-fourth centuries were recognised as tirtha in Gupta and post Gupta period. The very purpose of the proclamation of these settlement by brahmanas was to revive the gift exchange system which remained as the main basis of their livelihood. … It needs no emphasis to state that construction of temple went a long way in reviving the values of gift exchange system in decaying settlements and there by sanctify the concerned place as sacred spot fit for pilgrimage. …. Apart from decaying urban centre towns also came up in feudal headquarters and garrison.[৪৯]

তীর্থের উৎপত্তি বিষয়ে এই ধারণা অবশ্য এর আগেও রমেন্দ্র নাথ নন্দীর লেখাতে উল্লেখিত হয়েছে-

> The concepts of tirtha (sacred place) and the practice of tirthayatra as a popular form of piety are mentioned for the first time in the Visnusmriti, a work of third century A.D. Thereafter the idea is mentioned by almost all the authors of puranic texts with the number of sacred places multiplying endlessly. … Places proclaimed as tirtha includes crossroads, river crossings, banks of river … and important towns. The mode of such proclaimation sometimes made by god and sometimes by godmen is the fabrication of a new mythology wchich sanctifies the the tirtha by associating it with the 'sacred' besides publicizing the performance of *dana* rituals at the proclaimed tirtha as act of unparalleled religious merit. [৫০]

তিনি আরও লক্ষ করেছেন যে বিষ্ণুস্মৃতির তুলনায় পরবর্তী সময়ের পুরাণগুলিতে 'পবিত্র স্থান' বলে চিহ্নিত জায়গার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থেকেছে। মধ্যযুগের শুরুতেই লুপ্ত হতে থাকা বা গুরুত্ব হারাতে থাকা শহরগুলিকে এই 'পবিত্রস্থানে'র তালিকার অন্তর্গত করে তাদের 'তীর্থগৌরব' দান করা হয়েছে। রমেন্দ্র নাথ নন্দীর মতে এই প্রক্রিয়া সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল-

> The decay of Towns and subsequent proclaimation of a large number of them as places of pilgrimage and giftmaking do not appear to be isolated phenomena; … the decay of towns affected the prosperity of the city based Jajmanas, which in turn led to the decline of the samaskara religiosity in towns and cities. The concepts of tirtha, on the other hand

represents an attempt to revive the prospects of gift exchange in all the settlements including town।[৫১]

নানা রচনাতে তীর্থের উপস্থাপন

তীর্থের উৎপত্তি এবং তীর্থযাত্রার সাংস্কৃতিক প্রসারের বিষয়টি দেখে নেওয়ার পরে বিভিন্ন ধারার রচনাতে কীভাবে তীর্থকে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রথম আলোচ্য ঋগ্বেদ (অনুমানিক ১৫০০ খ্রি. পূ.)। ঋগ্বেদে আমরা 'তীর্থ' শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হতে দেখছি। ১/৪৬/৮, ১/১৬৯/৬, ১/১৭৩/১১, ৮/৪৭/১১ ইত্যাদি ঋকসমূহে আমরা 'পথ' অর্থে শব্দটিকে ব্যবহৃত হতে দেখছি।[৫২] অষ্টম থেকে ষষ্ঠ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে লেখা *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এও 'তীর্থ' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে এর অর্থ- 'ঐশ্বরিক কর্মকাণ্ডের স্থান'।[৫৩]

বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যেও আমরা নানা প্রসঙ্গে তীর্থের উল্লেখ পেয়েছি। যেমন- বালকাণ্ডে আমরা পুষ্কর তীর্থের উল্লেখ পাচ্ছি।[৫৪] অযোধ্যা কাণ্ডে দেখি বনবাসে যাওয়ার সময়ে সীতা গঙ্গা নদীকে বলছে- "মহারাজ দশরথের এই পুত্র তোমার প্রসাদে কর্তব্য পালন করে চতুর্দশ বৎসর পরে আমাদের সঙ্গে ফিরে আসবেন। ... তোমার তীরস্থ সকল দেবালয়ে ও তীর্থে পূজা দেব"।[৫৫] লঙ্কা থেকে রাবণ বধের পরে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাওয়ার সময়ে বিমান থেকে রাম সীতাকে সেতুবন্ধ তীর্থ দেখাচ্ছে। এই কাণ্ডেই আমরা পরশুরাম তীর্থেরও উল্লেখ পাচ্ছি।[৫৬]

তবের তীর্থের উল্লেখ বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় মহাভারতে। এখানে ভারতীয় তীর্থের বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে। আদি পর্বে বহুবার তীর্থ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়- যেমন 'শৌনকের আশ্রমে সৌতি' অংশে সৌতি বলছেন "... কৃষ্ণদ্বৈপায়নরচিত বিচিত্র মহাভারতকথা বৈশম্পায়নের মুখে শুনেছি।

তারপর বহু তীর্থে ভ্রমণ করে সমন্তপঞ্চক দেশে যাই, যেখানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল"।[৫৭] 'কদ্রু-বিনতার গজকচ্ছপ-অমৃতহরণ' অংশে পাই "এক নখে গজ আর এক নখে কচ্ছপকে তুলে নিয়ে গরুড় অলম্ব তীর্থে গেলেন"।[৫৮] 'আস্তীকের জন্ম- পরীক্ষিতের মৃত্যু বিবরণ' অংশে পাই- "সৌতি বললেন।– ভগবান শেষ নাগ (অনন্ত, বাসুকি) কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি মাতার অভিশাপের পর নানা পবিত্র তীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন"।[৫৯] চৈত্ররথপর্বাধ্যায়ের 'ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত- গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ' অংশে পাই "পাণ্ডবরা পাঞ্চালদেশে যাত্রা করলেন। এক অহোরাত্র পরে তাঁরা সোমাশ্রয়ণ তীর্থে গঙ্গাতীরে এলেন"।[৬০] অর্জুনবনবাসপর্বাধ্যায়ে 'অর্জুনের বনবাস- উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও বর্গা- বভ্রুবাহন' অংশে পাই "উলুপীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, তারপর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্র তীর দিয়ে মণিপুরে এলেন"।[৬১] সুভদ্রাহরণপর্বাধ্যায়ে 'রৈবতক- সুভদ্রাহরণ- অভিমুন্যপ-দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র' অংশে পাই "যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুনকে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি সুভদ্রাকে বিবাহ করে এক বৎসর দ্বারকায় রইলেন, তারপর বনবাসের অবশিষ্ট কাল পুষ্কর তীর্থে যাপন করলেন"।[৬২] তবে, 'মহাভারতে'র বনপর্বে তীর্থের উল্লেখ রয়েছে সব থেকে বেশি পরিমাণে। বনপর্বের একটি অংশের নামই 'তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায়'। এখানেই 'যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা'- অংশে তীর্থযাত্রাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের থেকেও বেশি পুণ্যকর্ম বলে উল্লেখ করা হচ্ছে- "... বহু শত তীর্থের কথা সবিস্তারে ... বিবৃত করে নারদ বললেন, যে লোক যথারীতি তীর্থপরিভ্রমণ করে সে শত অশ্বমেধ যজ্ঞেরও বেশি ফল পায়"। মহাভারতের এই অংশেই সম্ভবত প্রথম পাওয়া গেল তীর্থযাত্রীর যোগ্যতা বা প্রস্তুতির নির্দেশ- "... এই বার্তা জানিয়ে (অর্জুনের দেবরাজের কাছে অস্ত্রশিক্ষা) লোমশ (মুনি) বললেন, ইন্দ্র আর অর্জুনের অনুরোধে আমি তোমার (যুধিষ্ঠির) সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করব এবং সকল ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা

করব। যুধিষ্ঠির তুমি লঘু হও, লঘু হলে সহজে ভ্রমণ করতে পারবে"। লক্ষণীয় অনুবাদক রাজশেখর বসু পাদটীকায় লিখছেন- 'অর্থাৎ বেশী লোকজন জিনিসপত্র নিও না'। এই প্রাথমিক নির্দেশ থেকেই যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রার সম্ভাব্য কৃচ্ছ্রসাধনের রূপটি আন্দাজ করে তাঁর অনুগামীদের জানালেন-

> ... যে ব্রাহ্মণ ও যতিগণ ভীক্ষাভোজী, যারা ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম আর শীতের কষ্ট সইতে পারেন না, তাঁরা নিবৃত্ত হন। যাঁরা মিষ্টভোজী, বিবিধ পাকান্ন লেহ্য পেয় মাংস প্রভৃতি খেতে চান, যাঁরা পাচকের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন না। যাঁদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাঁরাও নিবৃত্ত হন।"[৬৩]

এর থেকে প্রাচীন ভারতে তীর্থযাত্রীর মানসিকতার একটি ধারণা পাওয়া যায়। মহাভারতের এই অংশে ভারতের বিভিন্ন তীর্থে যাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়— ক) "পাণ্ডবগণ নৈমিষারণ্য প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করে অগস্ত্যের আশ্রম কণিমতীপুরীতে এলেন। লোমশ বললেন, পুরাকালে এখানে ইল্বল নামে এক দৈত্য বাস করত"। খ) "তারপর পাণ্ডবগণ ভৃগুতীর্থে এলে লোমশ বললেন, পুরাকালে রাম রূপে বিষ্ণু ভার্গব পরশুরামের তেজ হরণ করেছিলেন"। গ) "পাণ্ডবগণ কৌশিকী নদীর তটদেশ থেকে যাত্রা করে গঙ্গাসাগরসংগম কলিঙ্গদেশস্থ বৈতরণী নদী প্রভৃতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন"। ঘ) "পাণ্ডবগণ গোদাবরী নদী, দ্রাবিড় দেশ অগস্ত্য তীর্থ সূর্পরাক তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করে সুবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন"। ঙ) "পাণ্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন করে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন যেখানে মান্ধাতা ও সোমক রাজা যজ্ঞ করেছিলেন"। চ) যুধিষ্ঠিরাদি প্রসর্পণ ও প্লক্ষাবতরণ তীর্থ, সরস্বতী নদী, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধু নদ, কাশ্মীরমণ্ডল, পরশুরামকৃত মানস সরোবরের দ্বার ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, ভৃগুতুঙ্গ, বিতস্তা নদী প্রভৃতি দেখে যমুনার পার্শ্ববর্তী জলা ও উপজলা নদীতীরে উপস্থিত হলেন"। লোমশ এখানে তাঁদের রাজা উশীনরের

উপাখ্যান শোনালেন।[৬৪] এই অংশেই পাণ্ডবদের হিমালয় তথা বদরিকাশ্রমে যাওয়ার উল্লেখ আছে। এই বিবরণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই দুর্গম পথে যাত্রার জন্য পাণ্ডবগণ এখানে সহায়ক নিয়েছেন— "উশীরবীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করে যুধিষ্ঠিরাদি সপ্তাধারা গঙ্গার নিকট উপস্থিত হলেন। লোমশ বললেন এখন আমরা মণিভদ্র ও যক্ষরাজ কুবেরের স্থান যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গন্ধর্ব, কিন্নর যক্ষ ও রাক্ষসগণকর্তৃক রক্ষিত, তোমরা সতর্ক হয়ে চল। যুধিষ্ঠিরাদি সকলে পুলিন্দরাজ সুবাহুর বিশাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন ... পরদিন সূর্যোদয় হলে পাচক ও ভৃত্যদের পুলিন্দরাজের নিকট রেখে তাঁরা পদব্রজে হিমালয় পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন"। এর পরে দেখি যাত্রাপথের দুর্গমতায় দ্রৌপদী শ্রান্ত ও বিবশ হয়ে গেলে ভীম ঘটোৎকচকে স্মরণ করলেন। সে ও তার পরিচরবর্গ রাক্ষস এসে পাণ্ডবদের বহন করে নিয়ে চলল। তাঁরা বদরিকাশ্রমে পৌঁছালেন।[৬৫]

মহাভারতের 'উদ্যোগ' পর্বেও তীর্থের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে দেখা যায় বলরাম যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন যুদ্ধে কৌরবদের বিনাশ তিনি দেখতে পারবেন না। সে জন্য তিনি সরস্বতী তীর্থে ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন।[৬৬] তীর্থ ভ্রমণে বলরাম কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তার তালিকাও দেওয়া হচ্ছে- ক) বলরাম প্রথমে প্রভাস তীর্থে গেলেন। খ) তারপর বলরাম ক্রমশ উদপান তীর্থে গেলেন। গ) বলরাম সপ্তসারস্বত কপালমোচন প্রভৃতি সরস্বতী তীরস্থ বহু তীর্থ দর্শন করে আদিত্য তীর্থে উপস্থিত হলেন। ঘ) তারপর বলরাম সমন্তপঞ্চকে এলেন ঙ) তারপর বলরাম হিমালয়ের নিকটস্থ তীর্থ সকল দেখে মিত্রাবরুণের পুণ্য তীর্থে এলেন।[৬৭] এছাড়াও, শান্তি পর্ব, অনুশাসন পর্ব ও মৌষল পর্বে তীর্থের উল্লেখ রয়েছে।

হিন্দু তীর্থের তালিকা, তাদের মাহাত্ম্য, তীর্থফল ইত্যাদি বিস্তৃত আকারে বিবৃত হয়েছে বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে। পুরাণগুলির রচনাকাল সম্পর্কে সুকুমার সেনের মত- "পুরাণ নাম দেওয়া

গ্রন্থগুলি বিভিন্ন কালে রচিত ও সংকলিত হইয়াছিল। প্রাচীনতম পুরাণের সংকলন কাল ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে যাইবে না। অর্বাচীনতম পুরাণ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা"।[৬৮] স্মৃতিশাস্ত্রের পাশাপাশি এই পুরাণগুলি ভারতীয় তথা বাংলার হিন্দু সমাজকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পালনীয় রীতি বিষয়ে শাসন ও পথপ্রদর্শন করে গিয়েছে। এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় সমরেন্দ্র নারায়ণ আর্যের লেখাতেও। তিনি জানাচ্ছেন-

> The Puranic texts which in their pesent form, are a characteristic product of the early medieval period, fully reflect the religious temper of the age. Traditionally, the Purans are said to have five underlined features. These include creation (sarga), recreation (pratisarga), genealogy (vamsa ....), cosmic cycles (manvantara) and account of royal dynasties (vamsacharita). However, as R.C. Hazra rightly observes, most of the available Puranas, ignore either partially or totally these five characteristics and instead give much emphasis on social and religous matter"।[৬৯]

এই 'social and religous matter'-এর অধিকাংশই ছিল তীর্থ সংক্রান্ত। যেমন বায়ুপুরাণের একটি বিশাল অংশে গয়া তীর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সেখানে কুরুজাঙ্গাল, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস ইত্যাদি তীর্থ সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে গোকুল, ব্রজ, বৃন্দাবন, মথুরা তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিষ্ণু সংক্রান্ত পুরাণগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন পুরাণ হল মৎস্যপুরাণ। সেখানে নানা তীর্থের বিস্তৃত তালিকা এবং তীর্থকৃত্যের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। কূর্মপুরাণে গয়া, প্রয়াগ, প্রভাস, বারাণসী, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র তীর্থের বিবরণ। বরাহপুরাণেও তীর্থের তালিকা এবং তীর্থকৃত্যের বিস্তৃত উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

বামনপুরাণে তীর্থের বিবরণ আছে। ভট্ট লক্ষ্মীধর তাঁর 'কৃত্যকল্পতরু' লেখার সময়ে এই বামনপুরাণের তীর্থ সংক্রান্ত অংশ গ্রহণ করেছেন। নারদীয়পুরাণও তীর্থ সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য পুরাণ। এখানে তীর্থকৃত্যের পাশাপাশি নানা তীর্থে দানের বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে। পদ্মপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে তীর্থ এবং তীর্থের মহাত্ম্য। এছাড়া স্কন্দপুরাণ পুরাণও তীর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখযোগ্য উৎস। এর কাশীখণ্ড এবং প্রভাসখণ্ডে কাশী ও প্রভাস তীর্থের মাহাত্ম্য আলোচিত হয়েছে।[৭০] এই পুরাণগুলিতেই তীর্থকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করতে দেখা যায়। যেমন-

> The Brahmapuran gives an ancient classification of tirtha and mentions them as Daiva, Asura, Arshya and Manushya, according to their origin. The Daiva types of tirthas are those which were revealed by the Trinity (Brahma, Vishnu, Mahesh)… Kshai, Pushkara, Prabhasa are examples of this type. Gaya is an Asura tirtha. The Arsha tirtha derived their origin from sages. The Manushya Tirthas are those which were made holy by rulers of the solar and lunar dynasties।"[৭১]

তীর্থের আরও একপ্রকার বিভাজনের দেখতে পাওয়া যায়-

> Places of Pilgrimage according to Mahabharata and Puranas may be divided into four broad types as follows: i) Prapta tirtha … ii) Vikalpa Sanjukta tirtha … iii) Ardhalupta tirtha … iv) Lupta tirtha ...[৭২]

প্রাপ্ত তীর্থ হল কাশী, পুরী ইত্যাদি। বিকল্প সংযুক্ত তীর্থ হল একই নামের তীর্থ যেগুলি দেশের নানা প্রান্তে অবস্থিত, যেমন বাল্মীকি আশ্রম। অর্ধলুপ্ত তীর্থ বলতে সেই স্থানগুলিকে বোঝানো

হয়েছে যেগুলি তাদের গুরুত্ব কিছুটা হারিয়েছে, যেমন কালীঘাট। আর, নানা শাস্ত্রে উল্লেখ থাকলেও যাদের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই সেগুলি হল লুপ্ততীর্থ।

বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির পূর্বসূত্র

ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নানা তীর্থস্থানে ভ্রমণের প্রক্রিয়াটি বাঙালির মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রমণকাহিনি লেখার প্রবণতাটি অনেক পরবর্তী সময়ে সূচিত হয়েছে। যদিও নানা তীর্থস্থান বিষয়ে লোকশ্রুতি নির্ভর ধারণা থেকে বাংলা ভাষাতে তীর্থবিবরণমূলক রচনার সূত্রপাত মধ্যযুগেই দেখতে পাওয়া যায়।

বেদ, পুরাণ, সংস্কৃত মহাকাব্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তীর্থের এই ব্যাপক উল্লেখ বাংলা ভাষার সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে লেখা বিভিন্ন জনপ্রিয় গ্রন্থে তীর্থ প্রসঙ্গের সন্নিবেশ পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষায় রচিত বইগুলির মধ্যে তীর্থের উল্লেখ সম্ভবত প্রথম দেখা যায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ। এই বইয়ের দান খণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন – "তোহ্মে গঙ্গা বারাণসী সরূপেঁসি জাণ।/তোহ্মে মোর স তীত্থ তোহ্মে পুণ্য স্থান।।"[৭৩] দানখণ্ডের অন্য এক জায়গায় রাধার শরীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখা হচ্ছে- "নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপমা"।[৭৪] এই অংশেই পাপ খণ্ডনের জন্য ভৈরবপতনে দেহ বির্সজন বা গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যার কথা আছে।[৭৫]

কৃত্তিবাসের রামায়ণে তীর্থের উল্লেখ আছে। এখানে আদিকাণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে- "মহাদেব চিরিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে। সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে।।/ যেবা নর স্নান দান করে হরিদ্বারে।/ তার পুণ্য সীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে।।"। এখানে আরও পাওয়া যায়- "পঞ্চক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডীরেখা।।/ সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী।"[৭৬] এই অংশে

গঙ্গার গতিপথের বিবরণ প্রসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়- "আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া" ; "সপ্তগ্রাম তীর্থ যেন প্রয়াগ সমান" বা "সাগরের সঙ্গে আমি করি গে মিলন।।/ মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম।"[৭৭] এই কাণ্ডেই 'সর্বতীর্থজল' মাহাত্ম্য বা সরযূ 'পুণ্যতীর্থে' স্নানের উল্লেখ পাওয়া যায় ।[৭৮] এর পরেও কাব্যটিতে কয়েকবার তীর্থমাহাত্ম্য বা প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম জনপ্রিয় বই *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। ভাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুসরণে মালাধর বসুর এই বইটি রচিত হয়েছিল। এখানেও একাধিকবার তীর্থের উল্লেখ আছে। রাজ্যাভিষেক বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে বলা হচ্ছ "নানা তীর্থের জল ঘটেতে পুরিয়া।/ অভিষেক করিল রাজা নিজ রার্য্য দিয়া।।"[৭৯] আবার, 'সূর্যগ্রহণে স্নানার্থ কৃষ্ণের প্রভাস গমন'-এর উল্লেখ আছে।[৮০] 'যদুবংশ ধ্বংস' অংশেও 'প্রভাস তির্থবরে'র উল্লেখ রয়েছে।[৮১] বইটির শেষে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠের ফলশ্রুতি' অংশে বলা হচ্ছে- "সুনিতে সুনিতে মন হইবে নির্ম্মল।/ ঘরে বসি পাবে নর সব তির্থের ফল।।"[৮২]

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বইগুলির মধ্যে তীর্থের বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায় কাশীরামদাসের মহাভারতে। এই বইটির আদিপর্বে পাওয়া যাচ্ছে- "দুরাচার ভাই সব দেখি নাগরাজ।/ বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদি মাঝ।।/ সকল ত্যজিয়া গেল তপ করিবারে।/ নানা তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে"।[৮৩] এই পর্বেই আছে হিমালয়ের 'মহাপুণ্য তীর্থ' 'ইন্দ্রদুম্ন্য সরোবর', 'বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র', 'দক্ষিণ সাগরে'র 'পঞ্চতীর্থ' এবং 'প্রভাস তীর্থে'র উল্লেখ।[৮৪] বনপর্বেও একাধিক তীর্থের উল্লেখ দেখা যায়। এখানে পুষ্কর তীর্থ, নৈমিষ কানন, সিন্ধু সাগর সঙ্গম, প্রভাস, কামাক্ষ্যা, কুরুক্ষেত্র, গোকর্ণ, রামঋষি, কপিল তীর্থ এবং তীর্থ হিসেবে সরযূ, গোদাবরী, নর্মদা, কাবেরী, সরস্বতী, যমুনা গঙ্গাতে স্নানের কথা বলা হয়েছে।[৮৫] তবে এই পর্বে যুধিষ্ঠিরকে নারদ তীর্থে যাওয়ার জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ- "যার হস্ত পদ মন সদা

পরিষ্কৃত।/ বিদ্যাকীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত।।/ পতিগ্রহ নাহি করে সর্ব্বদা সানন্দ।/ অহঙ্কার নাহি যার নহে ক্রোধে অন্ধ।।/ অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার।/ আত্মতুল্য সর্ব্বপ্রাণি দৃষ্টিতে যাহার।।/ ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থফল পায়।/ পদে পদে যজ্ঞ ফল ত্যজি তীর্থে যায়।।/ দরিদ্রের শক্য নাহ নাহি হয় যজ্ঞকর্ম।/ যজ্ঞের বিশেষ তীর্থস্নানে পায় ধর্ম্ম।।/ দৃঢ়ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে।/ সর্ব্বযজ্ঞফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে।।"[৮৬] - এই বক্তব্য জানানোর পরে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন তীর্থের ফল সম্পর্কেও জানিয়েছেন। গদাপর্বে কাশীরাম দাস 'বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ' অংশে বলরামের তীর্থের তালিকা দিয়েছেন। 'ব্রহ্মহত্যা'র পাপস্খালন করতে বলরাম "গেলেন বশিষ্ঠ তীর্থে সরস্বতী তীরে।/", সেখান থেকে 'সোমতীর্থ', তারপর 'দধিচী তীর্থ' ইত্যাদি।[৮৭] এই বইয়ের শান্তিপর্বে 'পরশুরামের তীর্থপর্য্যটন' অংশেও তীর্থের তালিকা দেওয়া হয়েছে— "ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।/ বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুহ্রদ বিরজা দুষ্কর।।/ ইন্দ্রদুম্ন্য সরোবর সরযূ কেদার।/ মান-সরোবর আদি তীর্থ হরিদ্রার।।/ একে একে সব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।/ ব্রহ্মহ্রদ ক্ষেত্রে তবে করিল গমন।।"[৮৮]। এখানে তীর্থ হিসেবে 'গয়াক্ষেত্রে'র উল্লেখও রয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলার জীবনযাত্রার একটি যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায় কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে। এখানে বাঙালির তীর্থের চিত্র অঙ্কিত হয়েছ। বইটির প্রথমেই আমরা বারণসীর উল্লেখ পাই- "ছায়া সঙ্গে ধর্মকেতু/ ভাবিলেন মুক্তি হেতু/ বারাণসী করিলা পয়ান"।[৮৯] পরবর্তী অংশে ধনপতি ও শ্রীপতির বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে নানা তীর্থ বা পুণ্যস্থানের উল্লেখ আছে- "ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রানি/ ইন্দ্রেশর পূজা কৈল দিয়া পুষ্পপানি/ ... বামভাগে হালিশহর ডাহিনে ত্রিবেণী/ দূন্দলের কোলাহলে কিছুই না শুনি/লক্ষ লক্ষ জন একবারে করে স্নান/ বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান/ ... পূজা করি সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ/ শোকাকুল সওদাগর

চলে রাত্রিদিন/ ... ডানি ভাগে বন্দনা করিআ নীলাচলে/ উত্তরিলা সওদাগর সমুদ্রের কূলে/ লোচন ভরিয়া সভে দেখে জগন্নাথ/ ... কিনিয়া প্রসাদ অন্ন করিল ভোজন/ ... নবদ্বিপে ডিঙ্গা আসি দিল দরশন/ চৈতন্য চরণে সাধু করিল প্রণাম/ ... তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপাম/ সপ্ত ঋষির শাসন বলায় সপ্তগ্রাম/ ... কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি/ ত্রিবিনিতে স্নানদান করেন শ্রীপতি"।[৯০] তাছাড়াও এখানে একটি বড় অংশ জুড়ে 'গঙ্গা মাহাত্ম্য' উল্লিখিত হয়েছে।[৯১]

এছাড়াও চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে সরাসরি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে চৈতন্যের তীর্থযাত্রার বিবরণ ধরা রয়েছে। বৃন্দাবন দাসের লেখা 'চৈতন্যভাগবত' বইটিতে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের তীর্থভ্রমণের উল্লেখ প্রসঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তারিত তীর্থ বিবরণ আছে। বইটির 'নিত্যানন্দের ভ্রমণ' অংশটি হল চৈতন্য পরিকর নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণের বিবরণ। সেখা বলা হচ্ছে— "হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।/ নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে/ তীর্থ যাত্রা করিলন বিংশতি বৎসর/ তবে শেষে আইলেন চৈতন্যগোচর/ ... প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর/ তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর/ গয়া গিয়া কাশী গেলা শিবিরাজধানী/ যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী/ ... প্রয়াগে করিয়া মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান/ তবে মথুরায় গেলা পূর্ব জন্মস্থান/বৃন্দাবনাদি যত দ্বাদশয়াদি বন/ একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ/ ... তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি/ চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী/ ...। তবে দ্বারিকায় আইলেন নিত্যানন্দ/ সমুদ্রে করিয়া স্নান হইলা আনন্দ/ সিন্ধুপুর গেলা যথা কপিলের স্থান/ মৎসতীর্থে করিলা মৎসকে অন্নদান/ শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ/ ... কুরুক্ষেত্র পৃথুদক বিন্দু সরোবর/ প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর/ ত্রিস্তুক মহাতীর্থ গেলেন বিশালা/ তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থ চলিলা/ প্রতস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী/ নৈমিষারণ্য তবে গেলা মহামতি/ তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগর/ ... তবে গালা সরযূ কৌশিকী করি স্নান/ তএ গালা পুলহ

আশ্রম পুণ্যস্থান/ গোমতী গণ্ডকী শৈলে তীর্থে স্নান করি/ তবে গেলা মহেন্দ্র চুড়োপরি/ প্রুশুরামেরে তথা করি নমস্কার/ তবে গেলা গঙ্গা জন্মভূমি হরিদ্বার/ পম্পা ভীমরথি গেল সপ্ত গোদাবরী/ বেনুতীর্থে পিপাসায় মজ্জন আচরি/ ... তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন/ দেখিয়া বৈকুণ্ঠনাথ কামকোষ্ঠী পুরী/ কাঞ্চীপুরী দেখি পুনঃ গেলেন কাবেরী/ তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান/ তবে করিলেন হরিক্ষেত্রের পয়ান/ ঋষভ পর্বত গেলা দক্ষিণে মথুরা/ কৃতমালা তাম্রপর্নীযমুনা উত্তরা/ মলয় পর্বত গেলা অগস্ত্য আলয়/ ... বদরিকাশ্রম গেলা পরম আনন্দ/... তবে নন্দীগ্রাম গেলা ব্যাসের আলয়/ ... তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন/ ... তবে প্রভু আইলেন কন্যকা নগরে/ দুর্গাদেবী দেখি জলে দক্ষিণ সাগরে/ তবে নিত্যানন্দগেলা শ্রীঅনন্তপুরে/ তবে গেলা পঞ্চ অপ্সরার সরোবরে/ গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে/ ... রেবা মহেশ্বরীপুরী মল্লতীর্থ গেলা/ সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা/ ... হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেমরসে/ সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে/ ধনুতীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর/ তবে আইলেন প্রভু বিজয়ানগর/ মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া দেবীপুরী/ ত্রিমল্ল দেখিয়া কুর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান/ শেষে নীলাচলচন্দ্রের নগরে" ইত্যাদি। [৯২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-তেও এমনি একটি ভ্রমণবিবরণী পাওয়া যায়- "চব্বিশ বৎসর শেষে যে মাঘ মাস/ তার শুক্লপক্ষ প্রভু করিল্য সন্ন্যাস/ সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন/ রাঢ় দেশে তিনি দিন করিলা ভ্রমণ/ ... এই মত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে/... রেমুনাতে গোপীনাথ পরমমোহন/ ভক্তি করি কৈলা প্রভু তাঁর দরশন/ ... এই মত চলি আইলা যাজপুর গ্রামে/ বরাহঠাকুর দেখি করিল প্রণামে/ ... / কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে/ ... জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা/ ... সবা সঙ্গে প্রভু আলালনাথ আইলা/ ... এইমত কইলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে/ ... গোদাবরী তীরে চলি আইলা কতদিনে/ ... বিদ্যাপুরে নানামত

লোক বৈসে যত/ ... গৌতম গঙ্গায় যায় কৈল তাতে স্নান /... মল্লিকার্জুন তীর্থে যাইয়া মহেশ দেখিল/ ... দাসরাম মহাদেব করিল দর্শন/ অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন/ ... সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি/স্কন্ধক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্ধ দরশন/ ... বৃদ্ধ কাশী আসি কৈলা দরশনে/ ... মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে/ চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট অঞ্চলে/ ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন/... শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন/ ... বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ/ ... ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল হস্তি স্থান/ ... পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব দর্শন/ বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন/ ... কাবেরী তীরে আইলা শচীর নন্দন/ ... অমৃতলিঙ্গ শিব আসি দর্শন করিল/ ... শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন/ ... দক্ষিণে চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া/ ... ঋষভ পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি/ ... মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে/ ... তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী/ দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হইতে/ ... কৃতমালায় স্নান করি আইলা দূর্বেশন/ ... মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম করিলা বদন/ সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান/ রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম/ ... পাণ্ড্য দেহসে তাম্রপর্নী আইল গৌরহরি/ ... ময় ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে/ চিড়িয়তালা তীর্থে শ্রীরাম লক্ষ্মণ/ তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন/ গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণু মূর্তি/ পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি/ চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ/ শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল শিব দরশন/ মলয় পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্যবন্দন/ কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি/ মল্লার দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি/ ... সেদিন চলি আইলা পয়স্বিনী তীরে/ ... পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ/ সিংহারি মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে/ মৎসতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে/ মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী/উডুপকৃষ্ণ দেখি হৈল প্রেমোন্মাদী/ ... ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি/ ... পঞ্চাপ্সরা তীর্থ আইল শচীর নন্দন/ গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী/ সূর্পারকতীর্থে আইলা ন্যাসিশিরোমণি/ কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখ ক্ষীর ভগবনী/ ... তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র/ বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ/ ... তবে প্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা

তীরে/ তাপী স্নান করি আইলা মহিষ্মতী পুরে/ ... ঋষ্যমূক পর্বতে আইলা দণ্ডক অরণ্যে/ ... কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী/ ... পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর'।[৯৩]

এই বইটিতে চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন ভ্রমণের বিবরণও পাওয়া যায়- "প্রভুর ইচ্ছা হইল যাইতে বৃন্দাবন/ শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন/... সেই নৌকা চড়ে প্রভু আইলা পানিহাটি/ ... প্রাতে কুমারহট্ট আইলা যাহা শ্রীনিবাস/ ... শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে ঐছে গেলা/ ... তবে বামকেলি গ্রাম প্রভু যৈছে গেলা/ ... মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড/ ... প্রভু লইয়া গেলা বিশ্বেশ্বর দর্শন/ তবে আসি দেখে বিন্দুমাধবচরণ/... প্রাতে উঠি মথুরা চলিলা গৌরহরি/ ... প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান/ ... যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া//"[৯৪]

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের এই ধরনের রচনাগুলিকে ভ্রমণ কাহিনি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ ভ্রমণ কাহিনি হল লেখকের প্রত্যক্ষ ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার ফসল। অথচ এই রচনাগুলি ভ্রমণ কাহিনির সেই প্রধান শর্তটি পূরণ করেনি। তাই এগুলি তীর্থভ্রমণ বিবরণী হিসেবেই বিবেচিত হয়। তবে ভারতীয় তথা বাঙালি ঐতিহ্যে 'ভ্রমণ' নামক পক্রিয়াটি যেহেতু দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে ভ্রমণে'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই বাংলা ভ্রমণ কাহিনি রচনার প্রথম পর্বে তীর্থকে কেন্দ্র করে লেখা ভ্রমণ কাহিনিই বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়। এই গবেষণা সন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। Cuddon J. A., *Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, Wiley-Blackwell, 2013, p. 736

২। Thompson Carl, *Introduction, Travel Writing*, London and New York, Routledge, 2011, p. 2

৩। Ibid, p. 9

৪। Ibid, p. 10

৫। Ibid, p.11

৬। Raban Jonathan, *For Love and Money: Writing- Reading- Travelling 1968-1987,* London, Picador, 1988, p. 253–54

৭। Das Nandini and Youngs Tim Edited, *Introduction, The Cambridge History of Travel Writing,* Cambridge University Press, 2019

৮। Ibid

৯। Ibid

১০। ভট্টাচার্য রেখা, *বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী(১৭৭০-১৯৬২),* অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬

১১। ওই, পৃ. ১৬

১২। ওই, পৃ. ২২

১৩। দাস কার্ত্তিকেয় চন্দ্র, *কথামুখ, হিমালয়ের হিমতীর্থে,* কলকাতা, পত্রলেখা, ২০১২, পৃ. ১৫

১৪। সাহা বীরেন, *আধুনিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ,* কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০, পৃ. ১৫৪

১৫। জামান পাতাউর সম্পাদিত, *ভূমিকা,* চট্টোপাধ্যায় বসন্তকুমার, *ভ্রমণ কাহিনি,* কলকাতা, ছোঁয়া, ২০১৭

১৬। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর,*বাঙালির ভ্রমণ, ভ্রমণকাহিনি এবং তীর্থভ্রমণ বিষয়ে একটি প্রস্তাব,* কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রাক্ শারদীয়া ২০১২,

১৭। বিশ্বাস অচিন্ত্য সম্পাদিত, *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল,* কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০২, পৃ. ৪৫

১৮। ওই, পৃ. ১৩৫

১৯। ওই, পৃ.১৩৫

২০। ওই, পৃ. ১৩৮

২১। ওই, পৃ. ১৩৮

২২। ঘোষ বারিদবরণ, *অবগাহন,* সেন বিজয়রাম, *তীর্থমঙ্গল,* কলকাতা, পরশপাথর, ২০০৯

২৩। মিশ্র সুবিমল, *উনিশ শতক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য,* সাম্পান(ভ্রমণ সাহিত্য সংখ্যা), জানুয়ারি, ২০২২, পৃ ৪২

২৪। ওই, পৃ ৪৪

২৫। সাহা বীরেন, *আধুনিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ,* কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০, পৃ. ২৭

২৬। ওই, পৃ. ৩০

২৭। ওই, পৃ. ৩০

২৮। ওই, পৃ. ২৭

২৯। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫

৩০। ওই, পৃ. ৩২

৩১। ওই, পৃ. ৩৩

৩২। সাহা বীরেন, *আধুনিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ,* কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০, পৃ.৪২

৩৩। ওই, পৃ. ২৪

৩৪। সেন ক্ষিতিমোহন, *ভারতের সংস্কৃতি,* বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৫০

৩৫। Swami Pavitrananda, *Pilgrimage And Fairs: Their Bearing On Indian Life,* Bhattacharya Haridas Edited, *The Cultural Heritage of India, Volume IV- The Religions*, Calcutta, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, 1983, p. 496

৩৬। Ibid, p. 496

৩৭। Ibid, p. 496

৩৮। Ibid, p. 497

৩৯। Bharati Agehananda, *Pilgrimage in Indian Tradition, History of Religion,* Vol. 3 No. 1, The University of Chicago Press, Summer 1963

৪০। Ibid

৪১। Ibid

৪২। Ibid

৪৩। Ibid

৪৪। Singh Rana P.B., *Pilgrimage in Hinduism, Historical Context and Modern Perspectives,* Timothy Dallen J. and Olsen Daniel H. Edited, *Tourism, Religion and Spiritual Journeys,* London New York, Routledge, 2006

৪৫। Jacobsen Knut A., *Pilgrimage in the Hindu Tradition Salvific space*, New York, Routhledge, 2013, p. 9

৪৬। Eck Diana L., *Indian's Tirthas: "Crossings" in the Sacred Geography*, Paul Copp & Christian K. Wedemeyer Edited, *History of Religion,* 20 (4), University of Chicago, 1981, P. 323-344

৪৭। Arya Samarandra Narayan, *History of Pilgrimage in Ancient India*, *(AD 300- 1200)*, Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2004, Pp. 1-2

৪৮। Ibid, p. 2

৪৯। Ibid, p. 2, 6

৫০। Nandi Ramendra Nath, *Social Root of Religion in ancient India*, Calcutta, K P Bagchi and Company, 1986, p. 46

৫১। Ibid, p. 48

৫২। দত্ত রমেশচন্দ্রের অনুবাদ অবলম্বনে, *ঋগ্বেদ-সংহিতা,* কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৩৮৩

৫৩। Singh Rana P.B., *Pilgrimage in Hinduism*, *Historical Context and Modern Perspectives,* Timothy Dallen J. and Olsen Daniel H. Edited, *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*, London New York, Routledge, 2006

৫৪। বসু রাজশেখর সারানুবাদ, বালকাণ্ড, *বাল্মীকি রামায়ণ*, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৫৩, পৃ. ৫০-৫১

৫৫। ওই, অযোধ্যা কাণ্ড, পৃ. ১০৯

৫৬। ওই, যুদ্ধ কাণ্ড, পৃ. ৩৮৭, ৩৩৫

৫৭। বসু রাজশেখর সারানুবাদ, *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত*, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৫৬, পৃ. ১

৫৮। ওই, পৃ. ১৭

৫৯। ওই, পৃ. ১৯

৬০। ওই, পৃ. ৭২

৬১। ওই, পৃ. ৯৪

৬২। ওই, পৃ. ৯৬

৬৩। ওই, পৃ. ১৮৪-১৮৫

৬৪। ওই, পৃ. ১৮৭-২০০

৬৫। ওই, পৃ. ২০৭

৬৬। ওই, উদ্যোগ পর্ব, পৃ. ৩৬০

৬৭। ওই, শল্য পর্ব, পৃ. ৫২৪

৬৮। সেন সুকুমার, *ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৯, পৃ. ৮৪

৬৯। Arya Samarendra Narayan, *History of Pilgrimage in Ancient India*, Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2004, p. 8

৭০। Ibid, Pp. 9-10

৭১। Ibid, Pp. 9-10

৭২। Ibid, p. 11

৭৩। ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন সম্পাদিত, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০০৪, পৃ. ২১২

৭৪। ওই, পৃ. ২২৪

৭৫। ওই, পৃ. ২২৯

৭৬। মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ সম্পাদিত, *রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭, পৃ. ২০-২১

৭৭। ওই, পৃ. ২২-২৩

৭৮। ওই, পৃ. ৫৫, ৬৭

৭৯। বসু মালাধর, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়,* ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮, পৃ. ২৭৪

৮০। ওই, পৃ. ৪০৬

৮১। ওই, পৃ. ৮৬২

৮২। ওই, পৃ. ৪৭৬

৮৩। *সচিত্র কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত,* কলকাতা, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত, ১৩৩২, পৃ. ৩৯

৮৪। ওই, পৃ. ১০০, ১২৬, ১৮৯, ২২২

৮৫। ওই, পৃ. ৩৫৮

৮৬। ওই, পৃ. ৩৫৭

৮৭। ওই, পৃ. ৬৭৭-৬৮২

৮৮। ওই, পৃ. ৭৫৬

৮৯। সেন সুকুমার সম্পাদিত, *কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ৪৪

৯০। ওই, পৃ. ২০১-২৩৮

৯১। ওই, পৃ. ২৩৭

৯২। দাস বৃন্দাবন, *চৈতন্যভাগবত,* কাঞ্চন দাস সম্পাদিত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ২০০১, পৃ ৪৭

৯৩। কবিরাজ কৃষ্ণদাস, *চৈতন্যচরিতামৃত,* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ২০০৫, পৃ. ১০৭-১৬৩

৯৪। ওই, পৃ. ২১১-২২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত বিবর্তন

বাংলা ভাষার প্রথম তীর্থভ্রমণ কাহিনি বিজয়রাম সেনের *তীর্থ-মঙ্গল* লেখা হয়েছিল ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে। এরপরে উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে বাংলা ভাষায় প্রচুর সংখ্যায় তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখা হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত হতে থাকা বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি একরৈখিক থাকেনি। সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই এই কাহিনিগুলির বক্তব্য উপস্থাপনের ভঙ্গি, প্রকরণ এবং কোন্ কোন্ বিষয় উপস্থাপন করা হবে — তার নির্বাচনের যুক্তি বা রুচিরও বিবর্তন ঘটেছে। এই অধ্যায়ে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির সেই সংরূপগত বিবর্তনের রূপরেখাটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কোনো একটি নির্দিষ্ট তীর্থকে কেন্দ্র করে সময়ের নানা পর্বে গড়ে ওঠা একাধিক কাহিনির বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত ক্রমিক বিবর্তনকে স্পষ্টভাবে দেখানো যায়। এক্ষেত্রে তীর্থস্থান হিসেবে কাশীকে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ বাংলার তীর্থভ্রমণ কাহিনির সূচনাকাল থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত- দীর্ঘ সময়ের নানা পর্বে কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনি লিখিত হয়েছে। তবে বিবর্তন সংক্রান্ত সেই আলোচনার আগে তীর্থ হিসেবে কাশীর গুরুত্ব বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

তীর্থস্থান কাশী

তীর্থযাত্রায় বাঙালির কাশী যাওয়ার সংস্কৃতি অনেক দিন ধরেই প্রচলিত। এর প্রাথমিক কারণটি হল পৌরাণিক ঐতিহ্যের অনুসরণ বা পুরাণের অনুপ্রেরণা। তীর্থ হিসেবে কাশীর মাহাত্ম্যের উল্লেখ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে গবেষক সমরেন্দ্র নারায়ণ আর্যের অভিমত-

> The kingdom of Kashi of which the capital was Benares, is known to history as a tirtha from the third century onwards.

> The early Puranas such as the Vayu, the Matsya, the Vishnu and the Kurma mention the sanctity of Benares or Varanasi. Further the Agnipurana, the Naradiyapurana, the Skandapurana, the Padmapurana, the Kalikapurana and the Lingapurana devote a number of verses to the glory of Kashi.[১]

মহাভারতের আরণ্যক পর্বে বারাণসীতে স্নানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে বারাণসীতে স্নানের ফলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। তাছাড়াও বারাণসীতে স্নানের পুণ্যকে রাজসূয় যজ্ঞের ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তীর্থস্থান হিসেবে কাশীর উল্লেখ পাওয়া যায় বিষ্ণুস্মৃতিতেও। পৌরাণিক ধর্মের অগ্রগতি এবং শৈব ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাশী শৈব তীর্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কূর্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বায়ুপুরাণের মতো পুরাণগুলিতে কাশীর পবিত্রতার উল্লেখ রয়েছে।

পুরাণগুলির মধ্যে মৎসপুরাণে কাশীর বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ছয়টি অধ্যায়ে কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণে দেখা যায় শিব পার্বতীকে বলেছেন—

> এই পরম গুহ্যতম বারাণসী ক্ষেত্র সর্ব্ব ভূতের মোক্ষের হেতুভূত। ... এই ক্ষেত্রে মন্মনা মদ্ভক্তগণ আমাতে সর্ব্ব ক্রিয়া সমর্পণ করিয়া যেরূপে মোক্ষলাভ করেন, অন্যত্র কুত্রাপি সেরূপ মোক্ষলাভ ঘটে না। আমার এই পুরী গুহ্য হইতেও অতি গুহ্যতর। ... এই ক্ষেত্র অতি প্রিয়তম, সেই জন্যই সর্ব্বদা আমার ইহাতে রতি। আমি কখন ইহা পরিত্যাগ করি নাই, বা করিবও না; সেইজন্য ইহার নাম অবিমুক্ত। লোক সকল নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার ও পুষ্কর তীর্থে স্নান বা ঐ সকল তীর্থের সেবা করিয়া যে সকল ফল প্রাপ্ত না হয়, এই বারাণসীতে তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত

> হইয়া থাকে ইহাই বারাণসীর বিশেষত্ব। ... যাহারা বিত্ত বিষয়ে আসক্ত ও ধর্ম্মানুরাগ-বর্জ্জিত, তাদৃশ নরও এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় আর সংসারে আর প্রবেশ করে না। হে সুব্রতে! যাহারা নির্মম, ধীর, সত্ত্বস্থ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রতাচারী, সঙ্গ-বর্জ্জিত ও মদেকনিষ্ঠ সেই সকল ধীসম্পন্ন পুরুষেরা দেহান্তে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন। সহস্র সহস্র জন্মে যোগানুষ্ঠান করিয়া যে যোগফল মোক্ষ পাওয়া যায়, সেই পরম মোক্ষ এই স্থানে দেহত্যাগ মাত্রেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[২]

আবার এই পুরাণের অন্যত্র বলা হচ্ছে

> ... জপ, দান, হোম, তপস্যা, ধ্যান ও অধ্যয়ন ইত্যাদি যে কিছু কর্ম্ম ঐ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন সহস্র জন্ম সঞ্চিত পাপ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই বিনষ্ট হইয়া যায়।[৩]

কাশীর বিশেষত্ব সম্পর্কে 'মৎস পুরাণে'র বক্তব্য

> ... প্রাণান্তকালে মনুষ্যদিগের মর্ম্ম সকল বায়ু প্রেরিত হইয়া ছিন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাদের স্মৃতিশক্তিও লোপ পায়; কিন্তু এই অবিমুক্তক্ষেত্রে কর্ম্মফলে যে সকল ভক্তজনের প্রাণান্তকাল উপস্থিত হয় স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করিয়া থাকে।[৪]

তাই শেষ পর্যন্ত অন্য সকল তীর্থ অপেক্ষা কাশী বা বারাণসীর শ্রেষ্ঠত্ব এখানে স্বীকৃত হয়েছে- "... যেমন আমার সমান পুরুষ নাই, তোমার সমান রমণী নাই, তেমনি অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সমান তীর্থও নাই এবং কখনও হইবে না।"[৫]

একইরকম ভাবে পদ্মপুরাণেও কাশীর মাহাত্ম্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সেখানেও মহাদেব পার্বতীকে কাশী সম্পর্কে বলছেন- আমি এখন তোমাকে বারাণসীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে

অবহিত করছি। শুধুমাত্র এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেই মানুষ ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই বারাণসী হল আমার গুহ্য ও সর্ব পবিত্র ক্ষেত্র। অন্য সকল পবিত্র স্থানের থেকে এই স্থান বেশি পবিত্র। সকল নিবাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমার ভক্তরা এই স্থানে আমাতে প্রবিষ্ট হয়। অবিমুক্ত হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ স্থান, পরম মঙ্গলময়। যারা এই স্থানে গভীর সমর্পণের সঙ্গে বসবাস করে, আমি তাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করি।[৬]

স্কন্দপুরাণে কাশীর মাহাত্ম্যের বিশদ উল্লেখ রয়েছে। এই পুরাণে কাশীর মাহাত্ম্যকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে- যার প্রমাণ এর মধ্যে 'কাশী খণ্ড' নামক বৃহৎ একটি অংশের উপস্থিতি। সেখানে কাশীকে কীভাবে দেখানো হয়েছে একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা বোঝানো যেতে পারে–

> কাশীস্থ ব্যক্তি পাপ অথবা পুণ্যকর্ম্মরাশি অনুষ্ঠান করিয়া মৃত হইলে তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ... কাশী পুরীত বেদান্তবেদ্য পরমব্রহ্মের নিদিধ্যাসনা ব্যতিরেকে সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মনির্ম্মূলনকর তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীতও শুদ্ধ শশিমৌলি মহেশ্বরের প্রসাদেই মৃত ব্যক্তি মুক্ত হয়। ... কালক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তারকমন্ত্রের উপদেশে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ... এই কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগই দান, দেহত্যাগই তপস্যা এবং দেহত্যাগই যোগ ও নির্ব্বাণ সুখপ্রদ।[৭]

এই সকল উল্লেখ থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে পুরাণের প্রভাবে তীর্থ হিসেবে কাশীর 'অসাধারণত্ব' বাঙালি তীর্থযাত্রীদের কাছে দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে কাশীর সঙ্গে বাংলার সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থাও কাশীকে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় করেছিল।

কাশী ও বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাঙালি তীর্থযাত্রীদের কাশীতে যাওয়ার দ্বিতীয় এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অন্যান্য তীর্থের তুলনায় কাশীর সঙ্গে বাংলা ভূখণ্ডের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা। দীর্ঘ দিন আগে থেকেই স্থলপথে বা নদীপথে বাংলা থেকে কাশী যাওয়ার সুবিধা ছিল। বাংলার সঙ্গে কাশীর নিবিড় সম্পর্ক বহু দিনের।

> সম্ভবত গৌড় অথবা বাংলার রাজা শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন বর্ধনরাজকে পরাভূত করে কনৌজকে নিজের অধীনে আনেন সেই সময়েই বাংলা ও বারাণসীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কনৌজের অংশ হওয়ার ফলে কাশী স্বাভাবিকভাবেই শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। কনৌজ অভিযানের সময় শশাঙ্ককে প্রথমে কাশীর দখল নিতে হয় এবং সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে হয়। কারণ বাংলা থেকে কনৌজ আক্রমণ করতে গেলে কাশীর মধ্যে দিয়েই তা করতে হত। শশাঙ্ক কনৌজ অভিযানের সময় যখন রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে দূরে ছিলেন তখন রাজা হর্ষবর্ধনের মিত্র এবং শশাঙ্কের চিরশত্রু কামরূপের ভাস্করবর্মণ কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করেন। এর ফলে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণে ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং সেই সুযোগে হর্ষবর্ধন কনৌজ পুনরধিকার করেন।[৮]

এরপরে নবম শতাব্দীতে বাংলা ও কাশীর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাতে যখন রামপাল রাজত্ব করছেন কাশী তখন গহদাভল রাজবংশের শাসনাধীন। এই গহদাভল বংশের শাসক গোবিন্দচন্দ্রের রানি ছিলেন রামপালের সেনাপতি দেবরক্ষিতের কন্যা কুমারদেবী। এই বৈবাহিক সম্পর্ক কাশীর সঙ্গে বাংলার নৈকট্যের দ্যোতক। আবার বাংলার

সঙ্গে কাশীর সংযোগের উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক ঐতিহাসিক দাবী করেন যে সেন বংশের শেষ শক্তিশালী শাসক লক্ষ্মণসেন কলিঙ্গ, কামরূপের সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীও জয় করেছিলেন। এর পরে তিনি কাশীর পঞ্চক্রোশী পথটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

মধ্যযুগে বাংলার সঙ্গে কাশীর যোগাযোগ আরও প্রতিষ্ঠিত হয়। "ভারতের আফগান সম্রাট শের শাহের (শাসন কাল ১৫৩৯-১৫৪৫ খ্রি.) সময় থেকেই বাংলা থেকে বারাণসী হয়ে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড" তৈরি হয়।[৯] দীর্ঘদিন পরে, আঠারো শতকের শেষ দিকে রানি অহল্যা বাঈ এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ভগ্নপ্রায় কলকাতা-বারাণসী অংশটি সংস্কার করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্ব বাংলার যশোরের জমিদার- যাঁরা সে সময়ে ভুঁইঞা নামে পরিচিতি ছিলেন- রাজা প্রতাপাদিত্য ষোল শতকের শেষের দিকে দিল্লির মোগল বাদশার সঙ্গে নানা ধরনের ব্যবসায়িক আদান প্রদান শুরু করেছিলেন। এ কারণে রাজা প্রতাপাদিত্য বাংলা থেকে আগ্রা যাওয়ার পথে বেশ কিছুদিন কাশীতে বসবাস করেছিলেন। এই সময়েই তিনি এখানে চৌষট্টি ঘাট এবং চৌষট্টি যোগিনী মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। অনুমান করা যায় এই সময়ে বাংলা থেকে কাশী যাওয়ার পথ আরও সুগম হয়েছিল।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-কাশী যোগাযোগের সম্পর্ক উন্নততর হতে থাকে। আঠরো শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা দেশের অন্যতম খ্যাতনামা জমিদার ছিলেন রাণি ভবানী। তাঁর সময়ে তিনি দানশীলতার কারণে বাংলার বাইরেও বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। এই বিখ্যাত মহিলা-জমিদার রাণি ভবানী বাংলা থেকে কাশী পর্যন্ত একটি সড়ক পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে, বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে বারাণসী হয়ে সাম্রাজ্যের পূর্ব ও উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সুপরিকল্পিত, সুরক্ষিত এবং সুচিহ্নিত স্থলপথের আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই অনুযায়ী ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মূলত ডাক চলাচল ও সামরিক প্রয়োজনে গঙ্গার পশ্চিম তীরে কলকাতার বিপরীত দিকে অবস্থিত হাওড়ার সালকিয়া থেকে পাটনা হয়ে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত বেনারস রোড নির্মিত হয়।[১০]

তবে স্থল পথ ছাড়া নদী পথেও বাংলা ও কাশী সম্পর্কিত ছিল। বিশেষ করে বাণিজ্য বা পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে স্থলপথের তুলনায় বাংলা থেকে বারাণসী পর্যন্ত জলপথ ছিল বেশি নিরাপদ ও দ্রুত গমনের উপযোগী। তাই তীর্থভ্রমণের ক্ষেত্রে দলবদ্ধ ভাবে জলপথে বাংলা থেকে কাশী যাওয়ার রেওয়াজ আঠারো শতকেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। *তীর্থমঙ্গলের* কবি বিজয়রাম সেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে জলপথের ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কাশীতে তীর্থযাত্রা করেছিলেন।[১১]

রেলওয়ে চালু হয়ে যাওয়ার পরে বাংলা থেকে কাশী যাওয়া অনেক বেশি সহজ ও নিরাপদ হয়ে যায়- "By 1863 the line was opened all the way from Howrah to Benares"।[১২] হাওড়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত রেলপথের সূত্রপাত বিষয়ে আরও বিশদে জানা যায়-

> The distance from Calcutta by rail to Benares is 541 miles. Work was begun in 1851. The line to Burdwan was opened in February 1855, to Adjai in October 1858, to Rajmahal in October 1859 … and to opposite Benares in December[১৩]

এই রেলপথে যে প্রথম থেকেই প্রচুর যাত্রী যাতায়াত করছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় 'Extract from 'Official Gazette' থেকে। সেখানে দেখা যায় ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ অগস্ট

বাংলা রেলওয়ের সেক্রেটারি ভারত সরকারের সেক্রেটারিকে লিখছেন- "… The vast amount of traffic booth in passengers and goods, which has been attracted to the Railway during the first six months of its operating"। [১৪]

এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে অতীত সময় থেকেই পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রভাব ও যাতায়াতের সুবিধা বাঙালির কাছে কাশীকে জনপ্রিয় তীর্থ করে তুলেছিল। এই জনপ্রিয়তার প্রমাণ ধরা রয়েছে মধ্যযুগের বাংলার বিভিন্ন রচনায় কাশীর উল্লেখে। যেমন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন- "তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরূপেঁসি জান।/ তোহ্মে মোর সব তীত্থ তোহ্মে পুন্যস্থান।।"[১৫] বৃন্দাবনদাসের লেখা 'চৈতন্যভাগবতে'ও পাই তীর্থ হিসেবে কাশীর উল্লেখ- "গয়া গিয়ে কাশী গেলা শিবিরাজধানী।"[১৬] কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-তেও পাচ্ছি চৈতন্যদেবের কাশী যাত্রার কথা। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'ও বারণসীর উল্লেখ আছে- "ছায়া সঙ্গে ধর্মকেতু/ ভাবিলেন মুক্তি হেতু/ বারাণসী করিলা পয়ান"।[১৭] কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বা কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে'ও তীর্থ হিসেবে কাশী বা বারাণসীর উল্লেখ আছে। আধুনিক যুগের সূত্রপাতের প্রাক্ মুহূর্তে লেখা হয় বাংলা ভাষার প্রথম ভ্রমণকাহিনি বিজয়রাম সেনের 'তীর্থ-মঙ্গল'। সেখানেও প্রধানত রয়েছে কাশীর উল্লেখ।

উনিশ শতকে ছাপাখানার বিপুল বিস্তার, শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বই পড়ার সংস্কৃতির প্রচলনের কারণে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধরনের বই লেখার উৎসাহ দেখা গেল। সেই সূত্রেই বাংলা ভ্রমণ কাহিনি, বিশেষ করে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হতে শুরু করে। সেখানেও কাশী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকল। বিশ শতকেও বাঙালির কাশী যাওয়ার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাহিনি লেখার প্রীতি বা প্রবণতা বজায় ছিল।

তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত বিবর্তন

দীর্ঘ সময় ধরে রচিত হওয়া বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি রচনারীতি, প্রকরণ দিক থেকে মোটেও একরৈখিক নয়। এই ক্রমিক বিবর্তনের রূপরেখাটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় কাশী-কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে।

বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম তীর্থভ্রমণ কাহিনি হল বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'। "ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে যান কবি বিজয়রাম সেনও- সম্ভবত চিকিৎসক হিসেবে। তাঁরই পরামর্শক্রমে সেন-কবি এই 'তীর্থ-মঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন। ... ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ... পয়ার ছন্দে গাঁথা কাব্যটি কবি বিজয়রাম সেন গেয়ে গেয়ে পড়ে শোনালেন"।[১৮] অনেক পরে ১৩২২ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু এই রচনাটি সম্পাদনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন। গবেষক বারিদবরণ ঘোষ শুধুমাত্র ভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণ কাহিনি হিসেবেই বিজয়রাম সেনের লেখা এই 'তীর্থ-মঙ্গল'কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। তিনি এই রচনাটিকে আঠারো শতকের কাশীর 'ঐতিহাসিক চিত্রের দলিল' হিসেবেও বিবেচনা করেছেন।[১৯]

'তীর্থ-মঙ্গল' কাব্য আকারে লিখিত। এই কাব্য রচনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় সংরূপ মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অধ্যায় বিভাজনে 'সূচনা', 'যাত্রারম্ভ', 'নবদ্বীপ হইতে হাঁড়রা', 'রাজমহলের বর্ণনা', 'কাশীর বিবরণ', 'কাশী মাহাত্ম্য' ইত্যাদি শিরোনামের ব্যবহার সেই মধ্যযুগীয় সাহিত্য সংরূপের ছাপকে সুপষ্ট করে। বইটির শুরুও মঙ্গলকাব্যের সূচনার মতো করেই হয়েছে- 'বন্দো দেব নারায়ণ/ যার সৃষ্টি ত্রিভুবন/

ভকত বৎসল মহাশয়" ইত্যাদি।[২০] তীর্থভ্রমণে কাশীতে গিয়ে কবির পৃষ্ঠপোষক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই শিব প্রতিষ্ঠার বর্ণনার সূত্রেই কবি বিজয়রাম সেন কাশীর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কাব্যের মধ্যে। শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভোজন ও দান নিতে আসা যে সকল ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন বিজয়রাম তার থেকে আঠারো শতকের শেষের দিকের কাশীর অধিবাসীদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন- "কাশীতে আছেন যত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।/ সবাকারে মহাশয় কৈলা নিমন্ত্রণ।।/ ... আশীর্ব্বাদ করি গেলা বাঙ্গালী সমাজ।। ... কাশীতে উপরী শূদ্র আছয়ে বাঙ্গালী।/ফকির বৈষ্ণব আর যতেক কাঙ্গালী।।/ ... পাঁচশত গঙ্গাপুত্র কাশীর ভিতরে।/ ... সাত শত বাঙ্গালী বিপ্র পায়্যা নিমন্ত্রণ।/...।"[২১] কাশীতে বাঙালির বসবাসের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। বিজয়রাম সেনের এই বর্ণনাতে কাশীবাসী বাঙালিদের নানা শ্রেণিতে বিভক্ত রূপটিকে জানতে পারা যায়। কবি কাশীতে বসবাসকারী বাঙালি সমাজের একটি বিরাট অংশ- বাঙালি বিধবাদের কথাও একবার উল্লেখ করছেন তাঁর কাব্যের মধ্যে- "কাশীর মধ্যেতে আছেন বিধবা যতেক।/ সবাকারে দিলা কর্ত্তা তঙ্কা এক এক" ইত্যাদি।[২২]

শুধু জনবৈচিত্রই নয়, কবি বিজয়রাম সেনের কাব্যে কাশীর এক বিশেষ রীতিরও আভাস পাওয়া যায়। শাস্ত্র শিক্ষা ও শাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা-বিতর্কের অন্যতম স্থান কাশী। বিশেষত এখানকার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের শাস্ত্রজ্ঞদের বিতর্কমূলক আলোচনা দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাশীর প্রচলিত সংস্কৃতির অংশ ছিল। *তীর্থমঙ্গল* কাব্যে আঠারো শতকের শেষের দিকের কাশীর 'শাস্ত্র' বিচার বা আলোচনা সভার একটি 'স্কেচ' দেখতে পাওয়া যায়- "একদিন বারাণসীর যতেক পণ্ডিত।/ কর্ত্তার নিকটে আসি হৈলা উপস্থিত।।/দুলিচা গালিচা পাতা প্রস্তুত আছিল।/ বিচার করিতে সবে আসনে বসিল" ইত্যাদি। "[২৩]

তবে কবি বিজয়রাম কাশীর সামগ্রিক পরিচয় তাঁর কাব্যতে উপস্থাপিত করেননি। কাব্যের একটি অংশে তিনি অতি সংক্ষেপে কাশীর বাড়ি ঘরের বিবরণ দিয়েছেন। কাশীর বাসিন্দাদের পরিচয় দিতে গিয়েও তিনি শুধুমাত্র 'অপূর্ব্ব বসন', 'ভালেতে চন্দন'ওয়ালা ব্রাহ্মণ ও 'গজেন্দ্রগামিনী নাগিরী'দের উল্লেখমাত্র করেছেন। এমন কী কাশীর অসংখ্য খ্যাত-বিখ্যাত দেবতার ও মন্দিরের মধ্যে থেকে তিনি শুধু তিলভাণ্ডেশ্বরের বিবরণই দিয়েছেন। সেটাও আবার তাঁর পৃষ্ঠপোষক 'কর্ত্তা'র এই দেবতা বিষয়ক কৌতুহল নিবারণের কারণে।[২৪] অথচ এর বিপরীতে কবি বিজয়রাম সেন *তীর্থমঙ্গল* কাব্যের অনেকটা অংশ জুড়ে লিখেছেন 'কাশী-মাহাত্ম্য'। এই অংশে যথেষ্ট বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে কাশীবাসের ফল- "শুনহে ভকত লোক আছ জত জীব।/ জনম অবধি ভজ কাশীনাথ শিব।।/ অন্তিম কালী পাপী তর‍্যা জাবা সুখে।/ কাশীনাথ কাশীনাথ বল সদা মুখে।।/দেশ ছাড়ি জেই জন কাশীতে রহিবে।/ কাশী মৈলে মুক্তিপদ অবশ্য হইবে।।/পথে ঘাটে হাটে মাঠে যেখানে সেখানে।/পড়িয়ে মরিলে মুক্তি হবে সেই ক্ষণে।।/ কাশীনাথের পুরী মধ্যে জেইজন মরে।/ তাহার গতির কথা কে বলিতে পারে" ইত্যাদি।[২৫]

কবি বিজয়রাম সেনের তীর্থভ্রমণ কাহিনি *তীর্থমঙ্গল* প্রকরণগত দিক থেকে একান্তভাবেই হিন্দু ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে তীর্থযাত্রা বিধি এবং তীর্থমাহাত্ম্যের উল্লেখের সমন্বয়ে তৈরি একটি বই। এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে কবির নিজের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গিয়ে স্থান পেয়েছে কাশীর মাহাত্ম্য। আধুনিক যুগের কিছুটা পূর্ববর্তী সময়ে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা এই তীর্থভ্রমণ কাহিনি সংরূপগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্পষ্টতই মধ্যযুগের তীর্থমাহাত্ম্যমূলক রচনার অনুসারী হয়েই থেকে গিয়েছে। যার অন্যতম প্রমাণ ভণিতা অংশ– "তীর্থমঙ্গল কথা যেই জন শুনে।/ অন্তিমকাল স্বর্গ তার কবিরাজ ভণে।।"[২৬]

কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনির দ্বিতীয় উদাহরণটি হল ভূকৈলাসের 'রাজা' জয়নারায়ণ ঘোষালের লেখা *কাশীপরিক্রমা*। আঠারো শতকের শেষে লিখিত হলেও এই রচনাটি প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে। 'নানা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী ও গ্রন্থকারের জীবনীসহ' নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় *কাশীপরিক্রমা* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকের লেখা 'মুখবন্ধ' অংশ থেকে জানা যায় যে এই বইটি জয়নারায়ণের উদ্যোগে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত বৃহৎ কাশীখণ্ডের শেষাংশ মাত্র। 'রাজা' জয়নারায়ণ স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডের একশ অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ করিয়েছিলেন। আর তার শেষে এই অংশটি নিজে রচনা করে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কারণ সম্পাদকের মতে-

> তাঁহার অবস্থানকালে তিনি বারাণসীর অবস্থা যাহা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন, ... যে রূপে কাশীযাত্রা সম্পন্ন হইত, ... যে যে দ্রষ্টব্য স্থান ছিল, সাধারণের ব্যবহার্য্য ও বাণিজ্যপযোগী যে যে জিনিস পাওয়া যাইত, ... [সেই] বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা তিনি নিতান্ত কর্তব্য বোধ করিয়াছিলেন।[২৭]

*কাশী পরিক্রমা*ও কাব্যের আকারে পয়ারে লেখা। বইটির নানা অংশে আঠারো শতকের শেষের দিকে (১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ *কাশী পরিক্রমা* লিখিত হয়) কাশীর একটি ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে কবি জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীর বিখ্যাত ঘাটগুলির বিবরণ হাজির করেছেন। তাছাড়াও জয়নারায়ণের অবস্থানকালে কাশীতে ঘটে যাওয়া কয়েকটি বাস্তব ঘটনার কথাও এই বইটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। 'নাগরিক প্রসঙ্গ' অংশে লেখক ব্রাহ্মণদের বেদপাঠ, তাদের বিভিন্ন পেশা, কাশীবাসীর খাদ্যদ্রব্যের বৈচিত্র, সেখানকার নারীদের অলংকারের বিবরণ দিয়েছেন তিনি। কাশীর পুজো আর বিখ্যাত শাড়িশিল্পের উল্লেখও আছে তাঁর লেখাতে। এই

ধরনের বিষয়ের সন্নিবেশ এবং সমকালের কাশীর একটি 'আদর্শ চিত্রনির্মাণে'র প্রচেষ্টা জয়নারায়ণ ঘোষালের *কাশী পরিক্রমা*-তে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকরণের দিক থেকে এটিও কাশী আধ্যাত্মিক মহিমার প্রচারক তীর্থমাহাত্ম্যের সমগোত্রীয় রচনা।

কারণ নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাশী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কবি জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁর রচনাকে 'কাশীখণ্ড' নামক তীর্থমাহাত্ম্যমূলক একটি বইয়ের অংশ হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। তাছাড়াও *কাশী পরিক্রমা* বইটির অন্তর্গত 'পঞ্চক্রোশী যাত্রা', ঋতুযাত্রা', 'তিলভাণ্ডেশ্বরকথা', 'মানসিংহের মহিমা', 'নগরবর্ণন', 'কাশীস্থঘাটবর্ণন' ইত্যাদি অধ্যায়ের নামকরণ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে *তীর্থমঙ্গলের* মতো এটিও অনেকটা মঙ্গলকাব্যের রচনারীতিকে অনুকরণ করে লেখা। এটি শুরুও হয় মধ্যযুগের বাংলা বইয়ের রীতি মেনে- "অবধান করি সভে শুন সভাজন।/ কাশী কথা ছাড়িবারে নাহি চাহে মন" ইত্যাদি।[২৮] এছাড়া *কাশীপরিক্রমা*তে কাশীর বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে তথ্য দেওয়ার ভঙ্গিমাটি লক্ষণীয়। আগম-নিগম শাস্ত্রে যে ভাবে হর-পার্বতীর প্রশ্ন এবং উত্তরের পরম্পরায় কোনো একটি বিষয় উপস্থাপিত হয়- ঠিক একইরকম ভাবে- "সদয় হইয়া দীন প্রতি ভগবতী।/জিজ্ঞাসিলা করি নুতি পশুপতি প্রতি।।"[২৯] – এই ধরনের পঙক্তি ব্যবহার করে এখানে কাশী বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। কবি জয়নারায়ণ ঘোষাল এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই কাশী তীর্থে পালনীয় যাবতীয় শাস্ত্রীয় আচরণ বা বিধি– যেমন 'পঞ্চক্রোশী যাত্রাবিধি', 'প্রদক্ষিণ বিধান', 'যাত্রায় পূজাক্রম' 'সাময়িক যাত্রাবিধি' ইত্যাদি সম্পর্কে নানা তথ্য পার্বতীর প্রশ্নের উত্তর হিসেবে শিবের কথনের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। তাই *কাশী পরিক্রমা* তীর্থভ্রমণের কাহিনি হয়েও তীর্থমাহাত্ম্যমূলক রচনার সমগোত্রীয়।

উনিশ শতকে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি হল যদুনাথ সর্বাধিকারীর *তীর্থভ্রমণ*। বইটিতে ১২৫৯-৬০ থেকে ১২৬৪ বঙ্গাব্দ (১৮৫২ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)- পর্যন্ত সময়ের তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত রয়েছে। মনে রাখতে হবে এটি বাংলা থেকে কাশী পর্যন্ত রেলপথ চালু হওয়ার কিছু দিন আগে লেখা। আগের দুটি বইয়ের মতো এই বইটিও নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির প্রথম অংশে থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ১২৫৯ বঙ্গাব্দে (১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ) 'অম্বলের ব্যামোহ হইয়া শূল উপস্থিত' হওয়ার পরে জাগতিক বিষয়ে বীতস্পৃহ হয়ে লেখক তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু বইটির 'ভূমিকা' অংশে জানাচ্ছেন 'নিজের তৃপ্তির জন্য এবং আত্মীয়স্বজনকে শুনাইবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া' লেখক এই রোজনামচা লিখে রেখেছিলেন। তাঁর মতে "নানা স্থানের সমাজচিত্র, লোকচরিত্র, আচার ব্যবহার, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইতিকথা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য"' বিষয়ই লেখকের রচনায় আছে।[৩০]

যদুনাথ তাঁর তীর্থযাত্রাতে দু'বার কাশী গিয়েছেন। প্রথম বার ১২৬১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। সে সময়ে অবশ্য বেশি দিন কাশীতে থাকেননি তিনি। তবে যে ক'দিন ছিলেন প্রতি দিন 'স্নান তর্পণাদি' করে তীর্থগুলি 'দর্শন' করেছেন এবং তার বিবরণ দিয়েছেন। তারপর 'বসন্ত ওলাউঠা দুই রোগে বহু মনুষ্য কাশীপ্রাপ্তি' হওয়াতে তিনি কাশী ত্যাগ করে চলে যান।[৩১] এরপরে দ্বিতীয় দফায় যদুনাথ ১২৬৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস থেকে ১২৬৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস কাশীতে ছিলেন। আর তখনই তিনি কাশীর তীর্থগুলি সম্পর্কে বিশদে লিখেছেন। তাঁর লেখাতে বিশ্বেশ্বর মন্দিরের অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে- "বিশ্বেশ্বর মন্দিরের চারি দ্বার। পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে নাটমন্দির। ... নাটমন্দিরের পশ্চিমে দণ্ডপাণীশ্বর শিব।..."[৩২] ইত্যাদি। আছে

জ্ঞানবাপী, অন্নপূর্ণা মন্দির, কেদার ঘাট, তিলভাণ্ডেশ্বর, দুর্গাকুণ্ড, মণিকর্ণিকার ভৌগোলিক বিবরণ। যদুনাথ কাশীর গলিপথের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন-

> ... এমত গলি পথ কত শত আছে তাহার সংখ্যা নাই। ... সহরে পাঁচ হাজার ফটক। এক এক ফটকের মধ্যে পাঁচ ছয় সাত গলি আছে। গলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পথ অনুসন্ধান করা অতি সুকঠিন। ... বিদেশী মানুষ পথ ভুলিলে শীঘ্র ঠিকানা করিতে পারে না।[৩৩]

এর পাশাপাশি যদুনাথের *তীর্থভ্রমণ*-এ কাশীর বাজার, বাজারের পণ্যদ্রব্যের প্রায় তালিকা উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর লেখাতে কাশীর 'ভৈরব জাতা'-কে কেন্দ্র করে তাঁর সময়ে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের কথাও উঠে এসেছে। মহাবিদ্রোহের সময়ে যদুনাথ কাশীতেই ছিলেন। তাঁর 'তীর্থভ্রমণে' সেই মহাবিদ্রোহের বিবরণও ধরা রয়েছে- "কাশীনগরে অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়া ধনাঢ্যগণ ধন সকল গোপন করিয়াছেন। বণিকগণের দোকান বন্ধ। সাহেবগণ ত্রাসিত হইয়া স্থানে স্থানে লুক্কায়িত, আপন আপন স্ত্রীপুত্রগণকে চণ্ডালগড়ে প্রেরণ করিয়া সহরে যত ফটকবন্দী চৌকিদার ছিল ইহাদের কর্ম্মে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া ঐ চৌকিদারদিগকে থানার বরকন্দাজি ভার দিয়াছে"[৩৪] ইত্যাদি।

এই সকল উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যদুনাথের এই বইটি তীর্থমাহাত্ম্য জাতীয় রচনার প্রভাব কাটিয়ে সম্পূর্ণ তীর্থভ্রমণ কাহিনি হয়ে উঠেছে। তাঁর দেওয়া বিবরণ অনেকটাই বাস্তবধর্মী, চাক্ষুষ বিবরণী। তাছাড়াও বইটির রচনারীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখন আর পদ্যতে নয়, যদুনাথ লিখছেন গদ্যে। অধ্যায় বিভাজন করে তীর্থের মাহাত্ম্য হাজির করছেন না তিনি। বরং তিনি লিখছেন রোজনামচা বা 'ডায়েরি' পদ্ধতিতে। অর্থাৎ কোন একটি স্থানকে

তিনি নিজে কীভাবে অনুভব করেছেন- সেই চেতনা উঠে আসছে তাঁর লেখাতে। এই সকল কারণে যদুনাথের *তীর্থভ্রমণ* সংরূপগত দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মহাবিদ্রোহের পরে উনিশ শতকের ছয়ের দশক থেকেই বাংলায় ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে। ১৮৬৭ খিষ্টাব্দে হিন্দু মেলার প্রবর্তন থেকে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা এবং তার পরে জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে হিন্দু-পুনরুত্থানবাদ বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। হিন্দু ধর্মের নানা রীতি-আচারকে 'বিজ্ঞান সম্মত' বলে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি প্রাচীন ভারতকে গৌরবময় করে সাহিত্যে উপস্থাপন করা হিন্দু-পুনরুত্থানবাদের অন্যতম লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ক্ষেত্রে অতীতকে গৌরবময় করে দেখাবার প্রবণতা উনিশ শতকের শেষ দিকে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুনর্ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধে লিখছেন-

> উনিশ শতকের শেষাশেষি, জাতীয়বাদের উন্মেষলগ্নে, প্রাচীনতার ঢেউ লাগে বাংলা সাহিত্যে। ঔপনিবেশিক ঘোর ও বিচ্ছিন্নতার যাতনা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াসে অনেকেই তখন আক্রান্ত হন দুর্মর সব দূরাকাঙ্ক্ষায়- অল্প দিনের ভেতর অতীত-প্রয়াণকে ঘিরে তৈরি হয় এক বিশেষ সাহিত্য প্রকল্প এবং অচিরে তা ছড়িয়ে পড়ে শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায়। ... বঙ্কিম থেকে বলেন্দ্রনাথে মূল ধূয়ো একটিই: অমৃতস্য পুত্র বৈদিক দেবতাদের আশিসধন্য সন্তানেরা ভুলে গেছে তাদের বংশমর্যাদা; ইতিহাসের পাকেচক্রে ঘটে চলেছে অবিরাম এক সরণ; স্থির সূচনাবিন্দুর পুণ্য সংশ্রয় হারিয়েছেন বলেই এই হীনাবস্থা। সুতরাং ধারাবাহিক অধোগতির মুখ যদি উল্টো দিকে ঘোরাতে হয়, ছিন্নসূত্র ফের জোড়া লাগাতে হয়, তাহলে 'হিন্দু'কে ফিরতে হবে সময়ের পরপারে- অর্থাৎ এগোতে চাইলে হাঁটতে হবে সময়ের বিপ্রতীপে।[৩৫]

এই 'জাতীয়তাবাদের ঢেউ' বাংলা সাহিত্যের অপরাপর সংরূপের মতো বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতেও স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য বা প্রচার বা সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রকাশ কে সরিয়ে দিয়ে সে জায়গায় সংশ্লিষ্টস্থানের অতীত গৌরব প্রাধাণ্য পেতে শুরু করে। লেখকের শ্রদ্ধার বা ভক্তির ক্ষেত্র হয়ে ওঠে ঐতিহ্যশালী অতীত। এই সূত্রেই বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে।

অতীত ভারতের গৌরবময় যুগের স্মারক হিসেবে বা প্রাচীন ঐতিহ্যময় ভারতের অবশেষ হিসেবে কাশীকে তুলে ধরার চেষ্টা কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে লক্ষ করা যায়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বরদাকান্ত সেনগুপ্তের লেখা *ভারতভ্রমণ* প্রকাশিত হয়। বইয়ের শুরুতেই লেখা হচ্ছে যে বাংলা ভাষায় 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত' প্রায় নেই। সেই অভাব পূরণ করতে গিয়ে লেখক তিন বছর ধরে ভারতের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা লিখিত আকারে এখানে প্রকাশ করেছেন।[৩৬] কিন্তু বাংলা ভ্রমণ কাহিনির 'অভাবপূরণ' করতে গিয়ে লেখক যে বই লিখলেন তাতে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিষয়টিই একমাত্র উপজীব্য থাকল না। তিনি গবেষকের মতো নানান উৎস থেকে সংশ্লিষ্ট স্থানের ইতিহাসের বিবরণ দিলেন। লেখক নিজেই জানাচ্ছেন যে, এ বিষয়ে তিনি নির্ভর করেছেন ইতিহাস গ্রন্থ, বিদেশী ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, জনপ্রবাদ এবং কিংবদন্তির উপর। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করছেন যে তাঁর মূল উদ্দেশ্য 'সত্য উদ্ধার'। লক্ষণীয় 'উদ্ধার' শব্দটি। বিলুপ্ত বা বিস্মৃত 'সত্য' অর্থাৎ আর্য গৌরব কিম্বা প্রাচীন ভারতের গৌরবকে নিজের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, অন্যের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, ইতিহাস-গ্রন্থ, জনপ্রবাদের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারে নেমেছেন লেখক।[৩৭]

ভ্রমণকালে প্রথমবার কাশী দেখে লেখক বরদাকান্তের মনে হয়েছে- "নানা প্রকার সচূড় হর্ম্ম্যমালায় শোভিত থাকিয়া আর্য্য তীর্থক্ষেত্র বারাণসী জাহ্নবী সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।"[৩৮]

লক্ষণীয় এই 'পবিত্র আবেগে'র উৎস ধর্মবিশ্বাস নয়। কারণ লেখক কাশীর গঙ্গাপুত্র- যারা তীর্থযাত্রীদের থেকে দক্ষিণা আদায় করেন- তাদের সম্মান বা দানের 'ধর্মীয়' রেওয়াজকে উপেক্ষা করেছেন। মনে করেছেন গঙ্গাপুত্রদের একটি পয়সাও দক্ষিণা দেওয়া পয়সাটি জলে ফেলে দেওয়ার মতো অপব্যয়।[৩৯] শুধু তাই নয়, লেখক হিন্দু তীর্থ বিষয়েও বিরূপ মন্তব্য করেছেন-

> ... ব্রাহ্মণ উত্তর করিল জ্ঞানবাপীর জল। আগ্রহে হাত পাতিয়া জল লইলাম। মুখের নিকট তুলিয়া দেখি জগিতে ইহা অপেক্ষা দুর্গন্ধময় পদার্থ আছে কিনা সন্দেহ। পেটের ভিতর অন্নপ্রাশনের ভাতগুলি পর্য্যন্ত বাহির হইবার উপক্রম হইল। বড় ঘৃণা পাইয়া তাহা ফেলিয়া দিলাম।[৪০]

এই ধরনের মন্তব্য বা আচরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কাশী বিষয়ে ধর্মবিশ্বাসজাত বা ধর্মীয় আচার-কেন্দ্রিক মাহাত্ম্যে আপ্লুত নন লেখক। তীর্থকৃত্যের মাধ্যমে কাশীর পুণ্যপ্রদায়িনী মহিমাতেও বিশেষ ভক্তি নেই তাঁর। বরং তাঁর কাছে কাশীর ঐতিহ্যশালী প্রাচীনত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাশীকে তিনি আর্যগৌরবের স্মারক হিসেবে- 'আর্য্যজাতির আর্য্যধর্ম্মের এক প্রকাণ্ড লীলাক্ষেত্র' হিসেবে দেখতে চেয়েছেন।[৪১]

এই গৌরব প্রতিষ্ঠায় তিনি কখনও কাশীর মহিমা প্রচারক পুরাণের উল্লেখ করেছেন, কখনও কাশীর ধর্মপরম্পরার ইতিহাস এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিভাধর মানুষদের কাশীবাসের পারম্পরিক ইতিহাসেরও উল্লেখ করেছেন-

> এই কাশী আর্য্য জাতির, আর্য্যধর্মের এক প্রকাণ্ড লীলাভূমি। এই স্থানে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি কত আর্য্যধর্ম্মের একের পতনে অন্যের উত্থান, অন্যের উত্থানের একের পতন হইয়া ধর্ম জগতের কত লীলাখেলা হইয়া গেল। এ স্থানে কপিল, বুদ্ধ, শঙ্কর, পরেশনাথ, ভাস্কর

> প্রভৃতি কত মহামহোপাধ্যায় ভারতী উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন প্রতিভাবলে মর্ত্ত্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। এ স্থানেই আর্য্য মস্তিষ্কের চরম উৎকর্ষ।[৪২]

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্নিত 'ঔপনিবেশিক ঘোর ও বিচ্ছিন্নতার যাতনা' কাটিয়ে বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের প্রকাশের প্রমাণ বরদাকান্ত সেনগুপ্তের বইয়ের একটি অংশে স্পষ্ট ধরা পড়ে- "অন্নপূর্ণামন্দিরে যাইয়া দেখি, তিনি একখানা দর্ব্বি হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। মহাদেব তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া 'অন্নং দেহিমে জগদীশ্বরি' বাক্যে ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। কলিতেও তাঁহার এইরূপ পতিভক্তি দেখিয়া অন্নপূর্ণার প্রতি বড় ভক্তি হইল। অমনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিয়াম 'মাগো এখানে তুমি কেবল স্বামীকেই অন্নদান করিতেছ, কিন্তু সমগ্র ভারত যে অন্নাভাবে মারা যাইতেছে, তাহার কি কোনো প্রতিবিধান নাই?' তিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নন। একজনের কথায় উত্তর না দেওয়া যে সভ্যতা বিরুদ্ধ তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে কথাটীও কহিলেন না। ইহা ভদ্রতা বিরুদ্ধ (out of etiquette) ভাবিয়া আমারা রাগ করিয়া সেখান হইতে আবার বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে চলিলাম।"[৪৩] এই ব্যঙ্গ, এই শ্লেষ উপনিবেশের শাসকবর্গের প্রতি।

কাশীকে অতীতের হিন্দু ভারতের গৌরব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার প্রবণতা দুর্গাচরণ রক্ষিতের *সচিত্র ভারত প্রদক্ষিণ* নামের আর একটি তীর্থভ্রমণ কাহিনিতেও দেখতে পাওয়া যায়। বইটি শুধু কাশী সংক্রান্ত নয়। এখানে 'ওড্র', 'হিমালয়', 'কাশ্মীর', 'পাঞ্জাব' শীর্ষক অধ্যায় রয়েছে। এই রচনাগুলি 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'দাসী', 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর 'বারাণসী' নামক অধ্যায়টি 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে কাশীর সম্পূর্ণ

বিবরণ পাওয়া যায় না। কারণ লেখক প্রথমেই জানিয়েছেন যে তিনি ১২৮৬ বঙ্গাব্দে কাশীর রাজমন্দির ঘাটের যজ্ঞশালায় 'শ্রীযুক্ত বালা শাস্ত্রীর যজ্ঞ' দেখতেই কাশী গিয়েছিলেন।

কাশীতে এসে 'অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে'র ক্রিয়া-পদ্ধতি দেখে দুর্গাচরণের প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়- "ঋত্বিকগণ আহ্বানীয় অগ্নিকুণ্ড সমীপে বসিয়া প্রশান্তভাবে যখন সামগান করিতে লাগিলেন তখন আমার বোধ হইল যেন আমি বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে গিয়া পড়িয়াছি। ... সেই ঋষিগণ আমার সম্মুখে বসিয়া সামগান করিতেছে।"[৪৪] এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে কাশীতে বসে প্রাচীন আর্য পদ্ধতির যজ্ঞ দর্শনে তিনি পুলকিত হচ্ছেন এবং প্রাচীন ভারতের 'আর্য গৌরবে' তিনি শ্লাঘা অনুভব করছেন।

এই ধারার অপর একটি তীর্থভ্রমণ কাহিনি হল মন্মথনাথ চক্রবর্তীর *সচিত্র কাশীধাম*। বইটির প্রকাশের (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ) উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রকাশক জানাচ্ছেন-

> পুরাকাল হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশবাসী বহু মহানুভব ব্যক্তিই কাশী বারাণসী সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা এই পুস্তকেও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর দৃষ্টিতে সুপবিত্র কাশীর ঐতিহাসিক সৌন্দর্য লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই বিস্তৃতভাবে কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই, বিশেষ বাঙ্গালা ভাষায় কাশী সম্বন্ধে আদৌ কোন প্রামাণ্য পুস্তক না থাকায় মদীয় অগ্রজ মহাশয় ১৫/১৬ বৎসর কাল যাবৎ অনেক সময় কাশীতে অবস্থান করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এ পুস্তকে তাহাই সাধ্যমত সন্নিবেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের পুণ্যতীর্থ কাশীর দর্শনার্থী জনসাধারণ ইহা পাঠে কিঞ্চিৎমাত্র উপকার বোধ করিলে আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।[৪৫]

বইটিতে লেখকের বর্ণনার ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, কাশীর প্রাচীনত্ব ও 'পবিত্রতা' সম্পর্কে তাঁর গৌরব ও সম্ভ্রমবোধ কাজ করে গিয়েছে। তিনিও কাশীকে আর্য জাতির প্রাচীন এবং পবিত্র তীর্থ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর গৌরবের কারণ-

> আর্য্যসন্তান এ দুর্দ্দিনেও ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, বিধি নিয়ম সর্ব্ব কর্ম্মে পতিত হইয়াও কাশীর সেই মহামহিমান্বিতা চিরশান্তিপ্রদা সুশীতলবাহিনী গঙ্গা, সেই পবিত্র মহাতীর্থ মণিকর্ণিকা-দশাশ্বমেধ সেই ত্রিভুবন-বিশ্রুত সত্যনিষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশান, বাল্মীকি-ব্যাস বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতির সেই অলৌকিক সাধন সামর্থ্য, যাহা কাশীর প্রতি অণু পরমাণুর সহিত বিজড়িত, যাহা জগতের সকল জাতির ইতিহাসেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তাহার মাহাত্ম্য ও মায়া চিত্ত হইতে এখনও তাঁহারা বিচ্যুত করিতে পারে নাই; তাই এখনও যাঁহার ধমনীতে আর্য্যশোণিত অতি ক্ষীণভাবেও প্রবাহিত আছে, তাঁহার হৃদয় ও জীবনে একবারমাত্র কাশীদর্শন ও অন্তে কাশীতল বাসিনী গঙ্গার পবিত্র সলিলে দেহ বিসর্জন করিতে অভিলাষ করে।"[৪৬]

কাশীর গৌরবের প্রমাণ হিসেবে তিনি বেদ পুরাণ ও বিদেশী পর্যটকের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 'বারাণসী' শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক উইলসনের বই, পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, পুরাণ ইত্যাদি উদ্ধৃত করেছেন। এই ভাবে তিনি সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে কাশীর গৌরবময় ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন।

বরদাকান্ত সেনগুপ্ত, দুর্গাচরণ রক্ষিত এবং মন্মথ চক্রবর্তীর লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনি থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে তীর্থের মাহাত্ম্যের তুলনায় স্থানের প্রাচীনত্বের বা ঐতিহ্যের গৌরব উপস্থাপনযোগ্য বিষয় হিসেবে বেশি

করে গুরুত্ব পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সময়ে যে সকল ভূগোল বই লেখা হচ্ছিল সেখানেও কাশীর বিশেষ উল্লেখ থেকেছে। এই উল্লেখ ভৌগোলিক কারণে নয়, কাশীর প্রাচীনত্বের গৌরবের কারণেই। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় *উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-বৃত্তান্ত* নামক একটি ভূগোলের বই। এর সংকলক ছিলেন কালীপ্রসাদ শাণ্ডিল্য। বইটির 'পূর্ব্বভাষ' অংশে সংকলক লিখছেন- "এই প্রদেশেই আর্য্যদীগের যাবতীয় তীর্থ, এই প্রদেশেই ব্যাস প্রভৃতি মহামতি দিগের জন্মস্থান ... এই প্রদেশেই ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে স্ফূলিঙ্গ প্রমাণ বিদ্রোহানল কালগতিকে ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। অতএব এতাদৃশ বিবিধ ঘটনাযুক্ত স্থানের" বিবরণ দিতে তিনি এই বই লিখছেন।[৪৭] মনে রাখতে হবে 'ভূ-বৃত্তান্ত' লিখলেও লেখক কোনো স্কুলপাঠ্য ভূগোল বই লেখার চেষ্টা করেননি। তিনি উত্তর পশ্চিম ভারতের নানা গুরুত্বপূর্ণ জায়গার পরিচয় দিয়েছেন। আর প্রাচীন গৌরবের কারণেই বর্ণনাযোগ্য স্থানের তালিকায় তিনি কাশীকে রাখছেন। একই ধরনের অপর একটি ভূগোলের বই মহেশচন্দ্র চৌধুরীর লেখা *ভৌগোলিক পদ্যাবলী*।[৪৮] পৃথিবীর ভূগোল বিষয়ে পদ্যে লেখা এই বইটি উলুবেড়িয়া থেকে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে 'এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা', 'উত্তর আমেরিকা' ইত্যাদি নামের আলাদা আলাদা অধ্যায় আছে। সেই অধ্যায়গুলিতে মহাদেশের নদী, পাহাড়, 'বিস্ময়জনক পদার্থ', উৎপন্ন প্রধান ফসল প্রভৃতির তালিকাও দেওয়া আছে। লক্ষণীয় এর মধ্যেও কাশী বিষয়ক একটি অধ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিবেশের স্থাপনের পর থেকেই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের আগ্রহ বাড়ছিল ভারত সম্পর্কে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন বা ভারতীয়দের সমাজ-জীবনের পাশাপাশি এর নানা স্থান বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল ইউরোপীয় লেখকদের। সেই আগ্রহের অন্যতম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় বিদেশীদের লেখা ভ্রমণ কাহিনিগুলিতে। উনিশ শতকের শেষ পর্বে ভারতের নানা

স্থানে বিদেশীদের ভ্রমণ এবং তাকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ কাহিনি লেখার প্রবণতা বাড়তে শুরু করেছিল। আর এই ধরনের ভ্রমণ ও ভ্রমণকাহিনির জনপ্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল কাশী।

আঠারো শতকের শেষ দিকেই ১৭৮৫ খ্রিষ্টবাদে ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি থেকে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল জার্মান ধর্মপ্রচারক জোসেফ টাইফেনন্থালের-এর লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত *Historic Geographic Description of Hindustan*। তাঁর এই রচনাটিতে স্বল্প পরিসরে কাশীর কথা রয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস এর সঙ্গে থাকা চিত্রশিল্পী আর. এ. উইলিয়ম হজেস-এর ভ্রমণকাহিনি *Travels in India during the Years 1780, 1781, 1782 & 1783* লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। এখানেও কাশীর বিবরণ আছে। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত জর্জ ফস্টার-এর *A Journey from Bengal to England through the Northern part of India, Kashmire, Afganistan and Persia into Russia, by the Caspian Sea*- বইটিতে কাশীর বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় *Voyages and Travel to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805 and 1806*- শীর্ষক বই। এখানে স্থান পেয়েছে লর্ড জর্জ ভাইকাউন্ট ভ্যলেন্সিয়া-এর কাশী বিবরণ। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ক্যাপটেন নিকোলাওস কেফালাস-এর গ্রিক ভাষার বই *Description of the City of Benares in India of Indian Polytheism, its Cult and the Customs of those people*। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় এমা রবার্টস এর লেখা *Hindostan- Its Landscapes, Places, Temples, Tombs*- এখানে বারাণসীর উল্লেখ আছে। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকেই প্রকাশিত হয় টমাস বেকনের লেখা *The Oriental Annual*। এখানেও কাশীর কথা আছে। তবে, কেউ কেউ মনে করেন- "এটি সেই শ্রেণিভুক্ত কাজ, যার চালিকাশক্তি হল

যা কিছু ভারতীয় তাকে ঘৃণা বা বিদ্রুপ করার মানসিকতা"। তাছাড়াও "বিকৃত তথ্য পরিবেশন এবং ইউরোপীয়রা যে ভারতীয়দের থেকে সর্বতোভাবে উন্নত"- সেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও এখানে দেখা যায়।[৪৯] ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় রেভারেন্ড উইলিয়াম বায়ার্স এই বই *Recollections of Northern India*। ইনি বারাণসীতে কিছুদিন বসবাস করেন এবং সেই সূত্র কাশী বিষয়ে তিনি প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয় জন বি. আয়ারল্যান্ড এর লেখা বই *Wall Street to Cashmere: A Journal of Five years in Asia, Africa and Europe*। এখানেও বারাণসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় রেভারেন্ড এম. এ. শেরিং লিখিত *The Sacred City of the Hindus: An Account of Benares In Ancient And Modern Times*'।[৫০] উনিশ শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত এটিই কাশী বিষয়ে বিদেশীদের লেখা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বই। "বারাণসী সম্বন্ধে যত বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে সে সবের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ... শহরটিতে তাঁর দীর্ঘ অবস্থান, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, মিশনারি সক্রিয়তা ও আবেগে এবং সর্বোপরি শহরটির প্রতি গভীর ভালোবাসা – এসবই তাঁকে গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।"[৫১] তাছাড়াও লক্ষণীয় যে এই সময় পর্বে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে লেখকদের পাশাপাশি পেশাদার বা অপেশাদার বিদেশী চিত্রশিল্পীরাও ছিলেন। এঁদের মধ্যে আর. এ. উইলিয়ম হজেস, জেমশ ফরবেশ, টমাস ড্যানিয়েল, ফ্যানি পার্কস, টমাস বেকন, ক্যাপ্টেন রবার্ট স্মিথ, প্রমুখরা কাশীকে বিষয় করে একাধিক ছবিও অঙ্কন করেছিলেন।[৫২] বিদেশীদের এই রচনাগুলি থেকে প্রায়শই উপাদান সংগ্রহ করেছেন দেশীয় লেখকরা। যেমন মন্মথ চক্রবর্ত্তীর তাঁর কাশীকেন্দ্রিক বই *সচিত্র কাশীধাম* লিখতে গিয়ে সাহায্য নিচ্ছেন M. A. Sherring- এর *The Sacred City of the Hindus*, W. S. Caine-এর

Picturesque India, John Murray-এর *Handbook of Bengal Presidency* প্রভৃতি বইয়ের।[৫৩]

বিশ শতকের শুরুতে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির সরূপগত বিবর্তনে বিদেশীদের লেখার বিশেষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষ দিকে নবজাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি দিক যেমন ছিল প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যময় অতীতকে গৌরবের সামগ্রী হিসেবে ফিরে দেখা, তেমনি অপর একটি দিক ছিল জাতি হিসেবে আত্মনির্ভরতা অর্জন, আত্মপরিচয় নির্মাণ। দ্বিতীয় এই দিকটি বিশ শতকের শুরুতে আরও প্রসারতা লাভ করেছিল বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বিরোধী নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের নানা সংরূপে এই 'জাতি গঠন' এবং 'আত্মপরিচয় নির্মাণে'র চেতনা প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিও এর বাইরে ছিলনা। এই সময়ের তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে নিজের দেশে ভ্রমণকে 'জাতি গঠনে'র প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। পাশাপাশি বিদেশী লেখকদের সমতুল ভ্রমণ কাহিনি রচনাকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ বা 'আত্মপরিচয়' তৈরির পন্থা হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা *উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ* বইটির 'অবতরণিকা' অংশটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে দেখা যাচ্ছে যে লেখক একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বই রচনা করছেন- দেশভ্রমণের মাধ্যমে জাতিগঠন বা জাতির উন্নতিসাধন। 'অবতরণিকা' অংশে তিনি লিখছেন- "বাঙ্গালা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী অতি বিরল"। তাঁর মতে এর কারণ- "আমরা আজকাল সাহিত্যের দোহাই দিয়া কেবল নাটক, নভেল ও কবিতা লইয়াই ব্যস্ত থাকি"। কিন্তু লেখক সুরেন্দ্রনাথ রায় মনে করছেন-

> ... কেবলমাত্র সাহিত্যের আলোচনাই জাতীয়-উন্নতি-সাধনের সোপান হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ে কৃতবিদ্য তিনি সেই বিষয়েই

> তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। ... যতদিন পর্যন্ত বঙ্গভাষায় কেবলমাত্র সাহিত্যের একচেটিয়া অধিকারের পরিবর্ত্তে নানাবিষয়িণী আলোচনার আবির্ভাব না হইবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির আশা সুদূরপ্রক্ষিপ্ত।[৫৪]

এই ভাবে বাংলা ভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে জাতি গঠনের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। পাশাপাশি এই 'অবতরণিকা' অংশেই উঠে আসছে বিদেশী লেখকদের বিপ্রতীপে ভ্রমণ কাহিনি লেখার মধ্যে দিয়ে 'আত্মপরিচয়' তৈরির আকাঙ্ক্ষা, না লিখতে পারার খেদ-

> ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয় পর্য্যটক রচিত। ইউরোপীয়গণ সাতসমুদ্র তের নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া, এই সুদূর ভারতের তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য যে অধ্যবসায় অবলম্বন করেন, আমাদের দেশীয় ভ্রাতাগণ তাহার শতাংশ অবলম্বন করিলেও কর্তব্যজ্ঞানের সদ্ভাব রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারিতাম।[৫৫]

কাশী পৌঁছে সুরেন্দ্রনাথ রায় যে ধর্মীয়-কৃত্য করছেন— একথা তাঁর লেখার মধ্যে বেশ কয়েকবার উল্লেখিত হয়েছে- "বাসায় আসিয়া আমাকে কিছু পিতৃকৃত্য সমাপন করিতে হইল" ইত্যাদি।[৫৬] কিন্তু তীর্থে পুণ্য অর্জন তাঁর মূল অন্বিষ্ট ছিলনা। কাশী ভ্রমণকে তিনি শুধুমাত্র তীর্থভ্রমণ হিসেবে দেখেননি, জাতীয়তাবাদের অংশ হিসেবেও দেখেছেন।

এই সময়ের তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে প্রায়ই দেখা গিয়েছে- "The Bengali bhadralok authors of travel narratives also attempted to establisha distinction between travel-as-pilgrimage and travel-as-nationalism"[৫৭]। সেই বৈশিষ্ট্য সুরেন্দ্রনাথের মধ্যেও সক্রিয়।

তাই নানা কৃত্যে অংশ নিলেও তিনি নিজেকে কাশীতে আসা পুণ্যার্থীদের থেকে পৃথক করে রাখছেন- "কাশীধামে লোক ধরে না, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া লোক স্নান করিতে আসিয়াছে। আমি আজ কয়েকজন যাত্রিকের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম।"[৫৮] এখানে 'মিশিয়া গেলাম' শব্দ প্রয়োগে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্যান্য পুণ্যার্থীদের থেকে তিনি আলাদা। তাছাড়া গ্রহণ-স্নান উপলক্ষে কাশীতে সমবেত পুণ্যার্থীদের সম্পর্কে তিনি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যও করেছেন- "ধন্য হিন্দু নরনারী! এই কর্দ্দমদ্রবের মধ্যে কে অগ্রে স্নান করিবে তাহা লইয়াই প্রাণপণ করিতেছে। এমন ধর্ম্মপ্রাণ লোক আর কোথায় দেখিয়াছ?"[৫৯] তাঁর রচনাতে কাশীর তীর্থমাহাত্ম্য অপেক্ষা সমকালের কাশী, শহর কাশী বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। তাঁর রচনাভঙ্গিতে প্রায় আধুনিক পর্যটকের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। তিনি কাশীর পথ ও গলির সমালোচনা করছেন। তাছাড়াও কাশীর দর্শনীয় স্থান হিসেবে তিনি হিন্দু কলেজ, গভর্নমেন্ট কলেজ, মানমন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন।

সুরেন্দ্রনাথ রায় ছাড়া ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর *ভারত ভ্রমণ* বইটির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন ধরণীকান্ত। তার মধ্যে কাশী একটি। তবে সে বিষয়ে আলোচনার আগে ধরণীকান্ত কেন বই লিখছেন সেটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বইয়ের ভূমিকাতে লেখক বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করেছেন তিনি-

ক) ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের কীর্তি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র দেখার বিষয়।

খ) বাড়িতে বসে পড়লে দেশ সম্পর্কে কখনো এত জ্ঞান 'জন্মে না'।

গ) পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেমন সুন্দর ছবিওয়ালা ভারত ভ্রমণের বই লিখেছেন তা বাংলায় নেই।

ঘ) তাঁর এই বই পর্যটকদের জন্য।

ঙ) তাঁর বইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ভ্রমণের স্পৃহা বৃদ্ধি ও ধনীদের বৃথা অর্থব্যয় বন্ধ করে দেশ ভ্রমণে উৎসাহী করা।[৬০]

এর থেকে বোঝা যায় তাঁর কাছে কাশী যাওয়া কোনো ধর্মীয় আচারের অংশ নয়। তিনি দেশের অতীত গৌরবকে জানতে এবং বিদেশী পর্যটকদের সমকক্ষ বই রচনা করে বাঙালি পর্যটকদের উৎসাহ দিতেই কাশী যাচ্ছেন। তাই কাশীর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক দ্রষ্টব্য প্রতিটি স্থান সম্পর্কে আলাদা আলাদা নাম-উল্লেখ সম্বলিত অনুচ্ছেদ বরাদ্দ করেছেন। এখানে 'কাশীর পৌরাণিক তত্ত্ব', 'কাশীর নামোৎপত্তি', 'বিশ্বেশ্বর', 'জ্ঞানবাপী', 'অন্নপূর্ণা মন্দির', 'কালভৈরব' প্রভৃতি নাম উল্লেখ করে তীর্থস্থানের বিবরণ আছে, আছে কাশীর ঘাটের নাম-তালিকা। তাছাড়াও কাশীর ধর্ম অসম্পৃক্ত দ্রষ্টব্য স্থান 'হিন্দু কলেজ', 'মান মন্দির', 'কুইন্স কলেজে'র বর্ণনাও এখানে স্থান পেয়েছে।[৬১] এই বিবরণ দিতে গিয়ে ধরণীকান্ত বিদেশী ভ্রমণ কাহিনি লেখক-গবেষকের ভঙ্গিমায় প্রয়োজন অনুসারে পুরাণ, ইতিহাসের 'রেফারেন্স' ব্যবহার করেছেন। প্রায় প্রতিটি দ্রষ্টব্য স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা হাজির করেছেন। শুধু তাই নয় 'নানা কথা' নাম উল্লেখিত অংশে কাশীর বাজার, পণ্যদ্রব্য, নাগরিক সুবিধা, তাঁর সময়ের বাজার-দর উপস্থাপন করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ রায় এবং ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর বই দু'টির আলোচনার মাধ্যমে দেখানো যায় তীর্থস্থানে ভ্রমণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনিগুলি কীভাবে জাতি গঠন এবং বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রকল্পের অংশ হয়ে উঠেছিল। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সংরূপটির অভিমুখের বদল ঘটছিল, বিবর্তিত হচ্ছিল তীর্থভ্রমণ কাহিনি।

বিশ শতকের শুরুতে তৈরি হতে থাকা বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির অপর একটি সংরূপগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই ধরনের রচনাগুলিতে নির্দিষ্ট স্থানের দৃশ্যগত সৌন্দর্য কাব্যমণ্ডিত ভাষাতে প্রকাশ করার একটি প্রবণতা এই সময়ে থেকে তৈরি হয়। তীর্থের পৌরাণিক গরিমা, তীর্থের মাহাত্ম্য, তীর্থের কৃত্যের বিবরণকে প্রতিস্থাপন করে দিয়ে ধীরে ধীরে তীর্থস্থানে চোখে দেখা দৃশ্যের 'রোমান্টিক বর্ণনা' বাড়তি প্রাধান্য পেতে থাকল এই সময়ের তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে। যদিও বাঙালির লেখা ইংরেজি ভাষার ভ্রমণ কাহিনিতে এই বৈশিষ্ট্য বেশ কিছুদিন আগেই থেকেই লক্ষিত হয়-

> As daylight gradually poured itself, thousands of spires, temoles, shrines, minarets, domes, palaces and ghauts, were laid bare to the sight- disclosing a most panaromic view. The city of Shiva, the great stronghold of Hindooism, the holiest shrine for pilgrimage in India, and the nucleus of wealth, grandeur, and fashion of Hindoostan, now clearly stood uot in view,- 'rising with her tiara of proud towers, into airy distance.[৬২]

কাশীকে কেন্দ্র করে লেখা বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতেও দৃশ্যের নান্দনিক সৌন্দর্য্যের ভাষিক প্রকাশ বিশ শতকের শুরুর দিকে দেখতে পাওয়া গেল। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রিয়ম্বদা দেবীর লেখা *বারাণসী*। এই ছোট লেখাটিতেও বারাণসীর বর্ণনাতে এক ধরনের কাব্যময় ভাষাভঙ্গিমা পাওয়া যায়-

> শুক্ল ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না প্রফুল্ল রাত্রি। পথে দীপালোক নাই। ... পথ নির্জন, উভয় পার্শ্বের সঘন পল্লব বৃক্ষশ্রেণির মণ্ডলাকার শীর্ষদেশ চন্দ্রালোকে চিক্কন উজ্জ্বল, ভূমিতল আলো ছায়াঙ্কিত, কোথাও শুভ্র

> জ্যোৎস্নাধারা, কোথাও শ্যাম অন্ধকার। বরুণার বালুকারাশি। ... নদীবক্ষে ক্ষীণ জলস্রোত ঈষৎ বায়ুকম্পিত, ... ধূর্জটির জটাচ্যুত ত্রিধারার ন্যায় নির্মল।"[৬৩]

একই রকমের ভাষাভঙ্গিমা দেখা যায় ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর লেখাতেও-

> বাংলার শ্যামল প্রান্ত ছাড়াইয়া বাষ্পীয় শকট যখন সাঁওতাল পরগণার গিরিবন রঞ্জিত নির্ঝরবিধৌত প্রকৃতিসুন্দরীর উচ্ছৃঙ্খল সৌন্দর্য্যরাজির মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, তখন নবীন পথিকের নিকট এক নবীন সৌন্দর্য্যের দ্বার মুক্ত হয়।[৬৪]

অথবা

> গঙ্গাবক্ষে সৌধকিরীটিনী কাশীর শ্বেত প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল,- চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্- সে সৌন্দর্য্যছবির অতলতলে কোনও প্রগাঢ় রহস্য চিরলুক্কায়িত আছে কিনা, তাহা কে বলিতে পারে?[৬৫]

তবে ভাষারীতির এই বৈশিষ্ট্য কাশী অপেক্ষা হিমালয়কেন্দ্রিক বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে বেশি মাত্রায় লক্ষিত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বিশেষত রেলওয়ে চালু হওয়ার পর থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বাঙালির ভ্রমণের চরিত্র ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। পাশ্চাত্যে এবং এদেশে ভ্রমণের চরিত্র বদল বিষয়ে সীমন্তী সেনের বক্তব্য-

> Generally 'Grand Tours' are considered to be the beginning of travel industry in West. These were undertaken mainly by the aristocrats who monopolized the administrative posts. These tours, it was believed, would add to their ability to better discharge their responsibilities. … From the eighteenth century onwards it was noticed that apart from

> aristocrats, the middle class has started participating in these tours. But it was after the 'take off' of the industrial revolution in the mid eighteenth century and the accompanied revolution in the system of communication that travel industry got the real boost. … To return to Bengal, the basic areas of travel had been introduced by the British rulers. Hill stations, sea side locales, forest etc. acquired a special significance as 'sites for sights' Beyond those mentioned above, from the 1870s onwards, after Bengal and places of Bihar got connected through railways, there began perceptible trend among middle class Bengalis to go to these places and set up temporary habitations.[৬৬]

বাংলা থেকে অদূর পশ্চিমে বা সমুদ্র-সান্নিধ্যে বাঙালির ভ্রমণ ও ক্ষণিকবাস নিশ্চিতভাবেই 'leisure trip' অথবা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ভ্রমণ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই যাত্রার যাওয়া-থাকা, করণীয় বিষয় ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছানির্ধারিত এবং প্রায়শই সুব্যবস্থিত। ধীরে ধীরে এই ধরনের যাত্রাকে কেন্দ্র করে ভ্রমণনির্ভর শিল্প বিকশিত হতে থাকে। এর পাশাপাশি তীর্থস্থানে তীর্থের উদ্দেশ্যে ভ্রমণও যাত্রাপথ বা আশ্রয়ের অনিশ্চয়তা, সেথুয়া (তীর্থ প্রদর্শক) নির্ভরতা, তীর্থগুরু বা পাণ্ডাদের কর্তৃত্ব বা আধিপত্য ইত্যাদি পুরাতন বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে সুব্যবস্থিত এবং ভ্রমণ-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। এই অন্তর্ভুক্তির অন্যতম লক্ষণ তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে 'গাইড বুক' জাতীয় রচনা। কাশীকেন্দ্রিক বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে 'গাইড বুক' জাতীয় রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ গোষ্ঠবিহারী ধরের লেখা *সচিত্র তীর্থভ্রমণ কাহিনী (প্রথম ভাগ)* বইটি। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির উপ-শিরোনাম 'ভারতবর্ষীয় তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশ'। এটিকে জনপ্রিয় করতে এর নামপৃষ্ঠাতেই সহজ ভাষায় তীর্থফলের উল্লেখ করা আছে- "ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর তীর্থপর্য্যটন।/ অন্তিমেতে করে

সবে চির আকিঞ্চন।।/ ধর্ম্মকর্ম্ম তীর্থসেবা করিলে সাধন।/ ইহকালে হয় সুখ, তুষ্ট নারায়ণ"।[৬৭] বইটির বিজ্ঞাপন অংশে লেখক জানিয়েছেন এই বই রচনার উদ্দেশ্য- "যাঁহারা তীর্থভ্রমণার্থ লোকাভাবে মনে মনে চিন্তান্বিত হইয়া ভগ্নোৎসাহে কোন স্থানে যাত্রা করেন এবং তথায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অপরিচিত প্রবঞ্চকদিগের সহিত বাক্যালাপের পর তাহাদিগকে প্রকৃত সেতুয়া (তীর্থের পথপ্রদর্শক) ভাবিয়া উহাদের সঙ্গী হন তাঁহাদিগকে প্রায়ই শেষে মনস্তাপ করিতে হয়।"[৬৮] এ কথা প্রমাণ করতে দু'টি সত্য ঘটনার বিবরণও দিয়েছেন তিনি— কীভাবে অসৎ সেতুয়া হাওড়া থেকে গয়া যাওয়ার টিকেটের বদলে হাওড়া থেকে শ্রীরামপুরের টিকিট কেটে দিয়ে তীর্থযাত্রী বিপদে ফেলেছে কিম্বা অপরিচিত সেতুয়ার ঠিক করে দেওয়া পাণ্ডা তীর্থযাত্রীদের থেকে মাথাপিছু এক টাকার জায়গায় চার টাকা করে নিয়েছে। সাধারণ তীর্থযাত্রীদের অসৎ পথপ্রদর্শকদের হাত থেকে বাঁচাতে, তাদের সচেতন ও তীর্থগুলি সম্পর্কে নানা বিষয়ে আগাম তথ্যসমৃদ্ধ করতে লেখকের এই ধরনের বই লেখার উদ্যোগ। বইটির 'ভূমিকা' অংশেও লেখক তেমনটাই জানাচ্ছেন-

> কালমাহাত্ম্যে আজ আমাদিগের সেই পরম পবিত্র তীর্থসমূহেও নানাপ্রকার প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। ... আমার এই 'তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী' তীর্থপর্য্যটকদিগের প্রিয়সহচর ও পথপ্রদর্শক সম্পূর্ণ সহায়তা করিবে।[৬৯]

লেখক যে সত্যিই 'গাইড বুক' ধরনের বই লিখতে বসেছেন তার প্রমাণ বইয়ের ভূমিকারই শেষাংশ- 'উত্তর পশ্চিম তীর্থযাত্রার আবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিকা'। এখানে কাশীসহ উত্তর পশ্চিম ভারতের নানা তীর্থ স্থানে তীর্থকৃত্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পূজা-উপাচারের নির্দিষ্ট পরিমাণসহ তালিকা দিয়েছেন লেখক- "সিদ্ধি, গাঁজা, নারিকেল ৮টা, সুপারি ৫০টা, হরিতকী

১২টা, যজ্ঞোপবীত ৫০টা" ইত্যাদি।[৭০] লেখক এই বইয়ের 'ভূমিকা' অংশের একেবারে শেষে আরও একটি অংশ সংযোজন করেছেন যার শিরোনাম- "বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পাথেয়গুলি স্মরণ করিয়া যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিবেন"। এখানে তিনি যথার্থ 'গাইডে'র মতো যাত্রাকালে তীর্থযাত্রীদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির তালিকা দিয়েছেন- "মশারি ১টী, বিছানা ২ দফা, হ্যারিকেন ১টী সদাসর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় রাখিবেন ..." ইত্যাদি।[৭১]

এই বইটির কথনকৌশলেও 'গাইড' এর স্বরটি প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে যেমন কাশীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন- "কলিকাতা হইতে কাশী ৮২৯ মাইল দূরে অবস্থিত... কাশী সহরটী গঙ্গার উত্তরতীরে দুই ক্রোশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু ইহার পরিধি পঞ্চক্রোশ, সহরের সম্মুখেই গঙ্গা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি অবস্থায় অবস্থিত।"[৭২] তেমনি কাশী পৌঁছে তীর্থযাত্রীরা কি কি করবেন তারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি –"যাত্রীগণ কাশীর তীর্থতীরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে স্ব স্ব পাণ্ডা মনোনীত করিয়া লইবেন, তৎপরে তাঁহাদের প্রদত্ত বাটীতে আপন দ্রব্য-সামগ্রী স্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর ... বিশ্বেশ্বরজীউর পবিত্র লিঙ্গমূর্ত্তি একবার দর্শন করিবেন।"[৭৩] কাশীবাসের কবে কোন তীর্থে যাওয়া কর্তব্য এবং সেখানে তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করতে কি কি সঙ্গে রাখতে হবে- সে সম্পর্কেও লেখকের নির্দেশ দেওয়া আছে- "প্রথম দিবসেই চক্রতীর্থ বা মণিকর্ণিকাতে স্নান করিবার নিয়ম। কাশীতে এই প্রথম স্নানের সময় পৈতা, সুপারি বা হরিতকী, পঞ্চরত্ন, নারিকেল ও পুষ্পের আবশ্যক হইবে।"[৭৪]

লেখক কাশীর তীর্থকৃত্যে প্রয়োজনীয় 'মহাদেবের প্রণাম' মন্ত্র এবং যাত্রীদের সুবিধার জন্য তার বাংলা অর্থও দিয়ে দিয়েছেন।[৭৫] এর পাশাপাশি কাশীর প্রায় প্রতিটি তীর্থের বিবরণ, তার পৌরাণিক মাহাত্ম্য বা বৃত্তান্ত; কাশীর নানা বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তির উল্লেখ আছে এই লেখাতে।

গোষ্ঠবিহারীর বইটির দু'বছরের মধ্যে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় একই রকমের আরও একটি বই আমরা প্রকাশিত হতে দেখছি। এটির নাম *কাশীর কিঞ্চিৎ*, লেখক শ্রীনন্দী শর্ম্মা। বইটির আখ্যাপত্রেই লেখক এটিকে 'বাঙ্গালীর গাইড' বলে উল্লেখ করেছেন। এই বইটির যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি হল সম্পূর্ণ বইটি পদ্যে রচিত। লেখক 'কাশী রওনা', 'কাশীর চুঙ্গী', 'এক-নজরে কাশীর দৃশ্য', 'রাস্তা ও গলি', 'ঘাটের দৃশ্য' ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে ছোট ছোট অংশে কাশীর দর্শনীয় বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন।[৭৬] ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দেও এই গাইডবুক ধরনের অপর একটি বই আমরা পাচ্ছি যার নাম *বারাণসী বা কাশী*। এর লেখক কালীপদ সরকার 'বি.এ., বি.এল'। বইটি কাশীতেই লেখা হয়েছে। বইয়ের 'আত্ম নিবেদন' অংশে লেখক জানাচ্ছেন যে –

> প্রায় সমস্ত যাত্রী স্থানীয় পাণ্ডাদের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করেন। রীতিমত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া, অযথা নির্যাতন সহ্য করিয়া পাণ্ডাদের মুখে রঞ্জিত অলৌকিক 'ঠাকুরমার গল্প' শ্রবণ করিয়া যাত্রীগণ কোনরূপে তীর্থযাত্রার সুফল ভোগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। তাহাদের এই সহিষ্ণুতার মূলে অন্ধ-বিশ্বাস। ... যাত্রীগণের সুবিধা ও সাহায্যের জন্য এই 'তীর্থ-রেণু সিরিজের' (যার অন্তর্গত এই 'বারাণসী বা কাশী' বই) আয়োজন। পাঠকগণ ইহা হইতে কিছুমাত্র উপকার পাইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।[৭৭]

– এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই বইটিও 'অসৎ পাণ্ডা'দের হাত থেকে তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারকল্পে এটিও কাশীর গাইডবুক ধরনের রচনা। আগের গাইডবুক গুলির মতো এই লেখকও এই বইটিতে কাশীর তীর্থস্থানগুলির পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন।

এই ধারার অপর একটি বই *ভারতের তীর্থযাত্রা*। সম্পূর্ণ গাইড বইয়ের মতো করে বীরেন্দ্রনাথ দাস এটি লিখছেন ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে। এখানে কাশী উল্লেখ আছে। লেখক সেখানে রেলওয়ে স্টেশনের বিবরণ দিয়ে কাশী বর্ণনা শুরু করেছেন। তারপরে অল্প কথাতে কাশীর পরিচয় দেওয়ার পরে কাশীর অর্ক, লিঙ্গদেব, কাশীর নবদুর্গা, কাশীর বিনায়ক, কাশীর নিত্য যাত্রার তালিকা দিয়েছেন।[৭৮]

সিদ্ধান্ত

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের তীর্থের বিবরণমূলক রচনার প্রভাবে আঠারো ও উনিশ শতকে লেখা বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি প্রভাবিত ছিল। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্ষাপটের বদলের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপগত বিবর্তন ঘটেছে। সামগ্রিকভাবে এই বদলের মধ্যে বাঙালি তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখকদের এক ধরনের দোলাচলতা বা অস্থিরতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়টিকে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় দেখেছেন "a certain formal instability in early Bengali travelogues'- হিসেবে।[৭৯] তীর্থ অন্বিত রচনা বলেই সেখানে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক গরিমা প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে থাকবে- এই সহজ সমীকরণ এই সংরূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা-চেতনার জগতে প্রাধান্য পেতে থাকা জাতীয়তাবাদ, প্রাচীন আর্য গরিমা, ইত্যাদি তীর্থভ্রমণ কাহিনির সংরূপটিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার এবং সাহিত্যপাঠেরর ফলে লব্ধ সৌন্দর্য্যচেতনাও এই সংরূপের বিবর্তন ঘটিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং নতুন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি 'গাইড বুক' নামের একটি নতুন সংরূপের সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। Arya Samarendra Narayan, *History of Pilgrimage in Ancient India*, Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2004, p. 75

২। তর্করত্ন পঞ্চানন সম্পাদিত, *মৎস্যপুরাণম্*, কলিকাতা, নটবর চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩১৬, পৃ. ৬৬৩-৬৬৮

৩। ওই, পৃ. ৬৭৩

৪। ওই, পৃ. ৬৭৮

৫। ওই, পৃ. ৬৮৯

৬। মূল পাঠ: "Now I shall tell you the account based on the merits of Varanasi, merely by hearing which a man is absolved of (the sin of) killing a brahmana. …. The city of Varanasi is my most secret holy place. That holy place Avimukta is best among all holy places, is best among all abodes, is thy best knowledge among all (kinds of) knowledge. … My devotees go there and enter me only. Avimukta is great knowledge, Avimukta is a great seat; Avimukta is a great fact; Avimukta is highly auspicious. I give them who having firm decication live at Avimukta that highest knowledge that highest position."— Bhatt G. P. Edited, *Ancient Indian Tradition & Mythology, Volume 42, The Padma Purana, part IV,* Deshpande N. A Translated, Delhi, Motilal Banarasi Dass Publishers Private Limited, 1990, p. 1471

৭। ন্যায়রত্ন অজিতনাথ অনূদিত, *মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত স্কন্দ পুরাণ*, চতুর্থ অংশ, কাশীখণ্ড, কলকাতা, ধীরমৃতলাল মান্না ফ্রেণ্ড এবং কোম্পানি, ১২৮৬, পৃ. ৬৪১

৮। মেধসানন্দ স্বামী, *উনিশ শতকের বারাণসী*, বিশ্বনাথ দাস অনূদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫, পৃ. ২৪২

৯। ওই পৃ. ৩৪

১০। ওই পৃ. ৩৪

১১। ঘোষ বারিদবরণ, *অবগাহন,* সেন বিজয়রাম, *তীর্থমঙ্গল,* কলকাতা, পরশপাথর, ২০০৯

১২। Mukherjee Hena, *The Early History of the East Indian Railway,* Calcutta, Firma KLM Private Limited, 1960, p. 136

১৩। Huddleston G., *History of the East Indian Railway*, Calcutta, Thacker, Spink and Co., 1906, p. 34

১৪। Ibid, p. 133

১৫। ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন সম্পাদিত, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র,* কলকাতা, দে'জ, ২০০৪ পৃ. ২১২

১৬। দাস বৃন্দাবন, *চৈতন্যভাগবত,* কাঞ্চন বসু সম্পাদিত, কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ২০০১, পৃ. ৪৭

১৭। সুকুমার সেন সম্পাদিত, *কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ৪৪

১৮। ঘোষ বারিদবরণ, *অবগাহন,* সেন বিজয়রাম, *তীর্থমঙ্গল,* কলকাতা, পরশপাথর, ২০০৯

১৯। ওই

২০। সেন বিজয়রাম, *তীর্থমঙ্গল,* কলকাতা, পরশপাথর, ২০০৯, পৃ. ৩১

২১। ওই, পৃ. ৮৮

২২। ওই, পৃ. ৮৮

২৩। ওই, পৃ. ৮৯

২৪। ওই,পৃ. ৯৩

২৫। ওই, ৯১

২৬। ওই, পৃ. ৯৯

২৭। বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, *ভূমিকা,* ঘোষাল জয়নারায়ণ, *কাশী-পরিক্রমা,* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ

২৮। ঘোষাল জয়নারায়ণ, *কাশী-পরিক্রমা,* বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

২৯। ওই, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২

৩০। বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, *ভূমিকা,* সর্বাধিকারী যদুনাথ, *তীর্থভ্রমণ,* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২

৩১। সর্বাধিকারী যদুনাথ, *তীর্থভ্রমণ,* বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২, পৃ. ৪৫

৩২। ওই, পৃ. ৪৪০

৩৩। ওই, পৃ. ৪৫৩

৩৪। ওই, পৃ. ৪৬২

৩৫। বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী, *পুনর্ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা* আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার, কলকাতা, গাঙচিল, ২০০৮, পৃ.২৪৩-৪৪

৩৬। সেনগুপ্ত বরদাকান্ত, পূর্বকথা, *ভারত ভ্রমণ,* কলকাতা, কে সি দাঁ এণ্ড কোং, ১৮৮৪

৩৭। ওই

৩৮। ওই, পৃ. ৩১

৩৯। ওই, পৃ. ৩২

৪০। ওই, পৃ. ৩৭

৪১। ওই, পৃ. ৪০

৪২। ওই, পৃ. ৩৩

৪৩। ওই, পৃ. ৪১

৪৪। রক্ষিত দুর্গাচরণ, *বারাণসী, সচিত্র ভারত প্রদক্ষিণ,* দি বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩১০, পৃ. ২১

৪৫। চক্রবর্ত্তী মন্মথনাথ, নিবেদন, *কাশীধাম*, কলিকাতা, শ্যামলাল চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩১৮

৪৬। চক্রবর্ত্তী মন্মথনাথ, *কাশীধাম*, কলিকাতা, শ্যামলাল চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩১৮, পৃ. ১

৪৭। শাণ্ডিল্য কালীপ্রসাদ সংকলিত, *উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-বৃত্তান্ত*, কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭০

৪৮। চৌধুরী মহেশচন্দ্র, *ভৌগোলিক পদ্যাবলী*, উলুবেড়িয়া, শরত চন্দ্র চৌধুরী প্রকাশিত, ১৩০০

৪৯। স্বামী মেধসানন্দ, *উনিশ শতকের বারাণসী*, বিশ্বনাথ দাস অনূদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫, পৃ. ২৭৬

৫০। Rev. M.A. Sherring, *The Sacred City of the Hindus: An Account of Benares In Ancient And Modern Times*, London, 1868

৫১। স্বামী মেধসানন্দ, *উনিশ শতকের বারাণসী*, বিশ্বনাথ দাস অনূদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫, পৃ. ২৮৫

৫২। ওই, পৃ. ২৭৮

৫৩। চক্রবর্ত্তী মন্মথনাথ, *কাশীধাম*, কলিকাতা, শ্যামলাল চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩১৮

৫৪। রায় সুরেন্দ্রনাথ, অবতরণিকা, *উত্তরপশ্চিম ভ্রমণ*, কলিকাতা, পশুপতি প্রেস, ১৩১৪

৫৫। ওই

৫৬। রায় সুরেন্দ্রনাথ, *উত্তরপশ্চিম ভ্রমণ*, কলিকাতা, পশুপতি প্রেস, ১৩১৪, পৃ. ৩১

৫৭। Chatterjee Kumkum, *Discovering India: Travel, History and Identity in Late Nineteenth Century and Early Twentieth CenturyIndia,* Daud Ali Edited, *Invoking the Past: The Uses of History in South Asia*, Oxford University Press, 1999, p. 240

৫৮। রায় সুরেন্দ্রনাথ, *উত্তরপশ্চিম ভ্রমণ*, কলিকাতা, পশুপতি প্রেস, ১৩১৪, পৃ. ২৪

৫৯। ওই, পৃ. ২৫

৬০। লাহিড়ী চৌধুরী ধরণীকান্ত, *ভূমিকা, ভারত ভ্রমণ,* ময়মনসিংহ, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৭

৬১। লাহিড়ী চৌধুরী ধরণীকান্ত, *ভারত ভ্রমণ,* ময়মনসিংহ, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৭ পৃ. ৪-১১, ১৯-২০

৬২। Chunder Bholanauth, *The Travels of a Hindoo to Various Parts of Bengal and Upper India, Vol- I,* London, N. Trubner & Co., 1869, p. 236

৬৩। দেবী প্রিয়ম্বদা, *বারাণসী,* রীত প্রত্যূষকুমার সম্পাদিত, *বারাণসী কথা,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৩, পৃ. ১৭

৬৪। লাহিড়ী চৌধুরী ধরণীকান্ত, *ভারত ভ্রমণ,* ময়মনসিংহ, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৭, পৃ. ১

৬৫। ওই, পৃ. ৪

৬৬। Sen Simonti, *Emergence of Secular Travel in Bengali Cultural Universe: Some Passing Thoughts,* Rupkatha Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Themed Issue 'India and Travel Narratives', Vol. 12 No. 3, 2020

৬৭। ধর গোষ্ঠবিহারী, আখ্যাপত্র, *সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী (প্রথম ভাগ),* কলকাতা, দি বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি, ১৯১৩

৬৮। ধর গোষ্ঠবিহারী, *বিজ্ঞাপন, সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী (প্রথম ভাগ),* কলকাতা, দি বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি, ১৯১৩

৬৯। ওই

৭০। ধর গোষ্ঠবিহারী, *উত্তর পশ্চিম তীর্থযাত্রার আবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিকা, সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী (প্রথম ভাগ),* কলকাতা, দি বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি, ১৯১৩

৭১। ধর গোষ্ঠবিহারী, *সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী (প্রথম ভাগ),* কলকাতা, দি বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি, ১৯১৩, পৃ. ৯৭

৭২। ওই, পৃ. ৯৮

৭৩। ওই, পৃ. ৯৮

৭৪। ওই, পৃ. ৯৯

৭৫। ওই, পৃ. ১০১

৭৬। শর্ম্মা শ্রীনন্দী, *কাশীর কিঞ্চিৎ*, বেনারস সিটি, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩২২

৭৭। সরকার কালীপদ, আত্ম নিবেদন, *বারাণসী বা কাশী*, কাশীধাম, দে, মিত্র এণ্ড কোং, ১৩৩৬

৭৮। দাস বীরেন্দ্রনাথ, *ভারতের তীর্থযাত্রা*, গয়া, মাধপ্রসাদ বর্ম্মণ প্রকাশিত, ১৩৩৬

৭৯। Mukhopadhyay Bhaskar, *Writing Home, Writing Travel: The Poetics and Politics of Dwelling in Bengali Modernity*, Comparative Studies in Socities in Hostory, Vol 44 No. 2, Cambridge University Press, 2002, p. 294

তৃতীয় অধ্যায়

‘বাঙালির হিমালয় দর্শন’: হিমালয়কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ-সন্ধান

বাংলা ভ্রমণ কাহিনির একটা বিরাট অংশ গড়ে উঠেছে হিমালয়- বিশেষত হিমালয়ের তীর্থগুলিতে ভ্রমণকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকেই এই ধারার সূত্রপাত। আর ওই শতকের শেষের দিক থেকেই রামানন্দ ভারতী, কিম্বা তার অব্যবহিত পরে জলধর সেন, প্রবোধ সান্যাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের ভ্রমণমূলক রচনার সূত্রে এই ধারা পরিপুষ্ট হতে থাকে। বিপুল সংখ্যায় লেখা হতে থাকা এই হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে সুপ্রিয়া চৌধুরী লিখছেন- ".... there is also a textual tradition of mountain literature, as written by Bengali pilgrim-adventurers …"[১] – অর্থাৎ বাংলা ভাষায় হিমালয়ভ্রমণ নিয়ে কাহিনি রচনার 'ঐতিহ্য' গড়ে উঠেছিল। এই ধারার ভ্রমণ কাহিনির একটা বড় অংশই হিমালয়ের তীর্থভ্রমণ কাহিনি। কিন্তু রচনাগুলি নিশ্চিতভাবেই শুধুমাত্র হিমালয়ের তীর্থস্থানের ভ্রমণ-কেন্দ্রিক আখ্যায়িকাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এই তীর্থভ্রমণ কাহিনি হয়ে উঠেছিল উনিশ-বিশ শতকে বাঙালি হিমালয়কে কীভাবে দেখতে চেয়েছে, হিমালয়কে কীভাবে গ্রহণ বা আত্মীকরণ করতে চেয়েছে- তার অভিজ্ঞান/'ডিসকোর্স'। রণবীর লাহিড়ী বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এই ভাবে- "উনিশ শতকের শেষ দশকে হিমালয়-কেন্দ্রিক এক শ্রেণির ভ্রমণসাহিত্য বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে দেখা দেয়। প্রায় এক শতক ধরে এই সাহিত্য শুধু জনপ্রিয় নয়; বাঙালির হিমালয় ভ্রমণ ও দর্শনের একটা নকশা এখানে তৈরি হয়ে আছে, যা কেবল হিমালয় ভ্রমণের নির্দেশিকাই নয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির মানসের মানচিত্রও বটে।"[২]

এখন হিমালয়কে কেন্দ্র করে পরম্পরাগতভাবে বাঙালি ভদ্রলোকের লেখা এই বিপুল সাহিত্য- '... vigorous corpus of travel narratives … written by the Bengali

bhadrolok or middle class'[৩]- এর নির্বাচিত কয়েকটি রচনাকে বিশ্লেষণ করে বাঙালির হিমালয়কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্রকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

মহাভারত ও পুরাণে হিমালয়ের তীর্থ প্রসঙ্গ

হিমালয়ের হরিদ্বার, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার, বদরি, অমরনাথ বা মানস প্রভৃতি স্থানগুলি হিন্দু ধর্মের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। হরিদ্বার বা গঙ্গাদ্বার সম্পর্কে জানা যায় যে-

> Gangadwara or Haridwar is one of the most important tirthas for the Hindus of northern India. .... Hiuen Tsang describes the town of Mo-yo-lo or Mayura on the eastern bank of the Ganga. At a short distance from the town there was a great temple called the gate of the Ganga that is Gangadwara ... The earliest to Gangadwara as a tirtha is mentioned in the Vanaparva of the Mahabharata. According to text it is an adobe of Gandharvas, Kinnaras and Kiratas."[৪]

পুরাণেও এই স্থানগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে-

> The Kurmapurana refers to the performance of a yajna by Daksha, father of Gauri at Kankhal, … The Mahabharata eulogises Haridwar as one of the best places for the performance of the Sraddha ritual, … The Varahapurana also eulogises a holy dip in the Ganga at this spot. Gangadwara grew greater significance in early medieval phase. The Naradiyapurana prescribes a full chapter on the glory of Gangadwara."[৫]

সম্ভবত মহাভারতেই প্রথম হিমালয়ের বদরিনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়াও বিভিন্ন পুরাণে কেদার ও বদরি- এই দুই জায়গার তীর্থমাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। কূর্মপুরাণে কেদারনাথকে দেখা হচ্ছে শিবের নিবাস স্থল হিসেবে। লিঙ্গপুরাণে একে 'শ্রাদ্ধ তীর্থ' হিসেবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া কূর্মপুরাণ, মৎসপুরাণ, অগ্নিপুরাণেও এই তীর্থে শ্রাদ্ধকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে- "The Kurmapurana, … the Matsyapurana … and the Agnipurana … recomended the ritual of sraddha to be performed at this holy place for attaining great merit।"[৬] মৎসপুরাণে বদরিকাশ্রম সম্পর্কে বলা হচ্ছে- "... gods like Mitra and Varuna meditated at this tapovana"। তাছাড়াও, ব্রহ্মান্ডপুরাণ, বরাহপুরাণ এবং নারদীয় পুরাণে বদরিকাশ্রমের উপতীর্থের বিবরণ আছে।[৭]

বাঙালি ও হিমালয়যাত্রা

হিমালয়ের হরিদ্বার, কেদার, বদরির প্রভৃতি স্থানের এই পৌরাণিক তীর্থমাহাত্ম্য এবং মহাভারতে তাদের 'পবিত্রস্থান' হিসেবে উল্লেখ নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি তীর্থযাত্রীদের সেখানে যাওয়ার বিষয়ে উৎসাহ-প্রেরণা জুগিয়েছে। গবেষক শ্রী সুমন মুখোপাধ্যায় মতে-

> Bengali Hindus were very fond of Pilgrimage. The Himalaya acquired the central position of their Pilgrimage attraction. … . They are well acquainted with the Kedarnath and Badrinath shrines, Gomukh, Gangotri, Yamunotri, Amarnath, Manas Sarobar of Kailash since the Mahabharata period.[৮]

অথচ, বংলা ভাষার আদি বা মধ্যযুগের কোনো পরিচিত বা জনপ্রিয় রচনাতেই 'তীর্থ করতে' বাঙালির উত্তর পশ্চিমের ওই দূরবর্তী স্থানগুলিতে যাওয়ার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই অঞ্চলে বাঙালির তীর্থযাত্রার লিখিত উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে আঠারো শতকে-

> ... you got ample description of Bengali people's pilgrimage to Himalayas from the mid-eighteenth century. The Journal of 'Asiatic Researches', the Black Wood's 'Edinburgh Journal' and 'Calcutta Review' published almost regularly exciting descriptions about various sacred places of country.[৯]

সামগ্রিকভাবে হিমালয় ভ্রমণ সম্পর্কে সম্ভবত প্রথম বাংলা বিবরণ লেখেন কৃষ্ণকান্ত বসু। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ভুটান গিয়েছিলেন।[১০] সেই সময়ে ইনি বাংলায় একটি ভুটান-বিবরণ লেখেন। সেই বিবরণের কোনো হদিস পাওয়া না গেলেও ডেভিড স্কট কৃত তার ইংরাজি অনুবাদ রয়েছে-

> At the time of Anglo Gurkha war in 1815 David Scott the Collector of Rangpur sent krishnakanta Bose to Bhutan to negotiate disputes between Cooch Behar and Bhutan. Krishnakanta's Report translated by David Scott in English in part confirmed the pattern of Tibet's trade through Bhutan…[১১]

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে এক বাঙালি- রাধানাথ সিকদারের বাবা তিতুরামের কেদার-বদরি যাওয়ার উল্লেখ পাচ্ছি। কিন্তু, তিনি কোনো ভ্রমণবিবরণ লেখেনি।[১২] এর কিছুদিন পরে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তীর্থ যাত্রায় বের হয়ে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে যদুনাথ সর্বাধিকারী হিমালয়ের বেশ কিছু অংশ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এর পর

থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় হিমালয়ের তীর্থগুলিকে কেন্দ্র করে অসংখ্য তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখা হয়েছে। কিন্তু এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে হিমালয়ের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি লেখকের রুচি অনুযায়ী বদলে গিয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির সেই হিমালয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচিত তীর্থভ্রমণ কাহিনির নিরিখে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি ও হিমালয়

যদুনাথ সর্বাধিকারী ১৮৫৪ খিষ্টাব্দে (১২৬০ বঙ্গাব্দের ১১ ফাল্গুন) যাত্রা শুরু করে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ (১২৬৪ বঙ্গাব্দের ৯ অগ্রহায়ণ) পর্যন্ত- প্রায় চার বছর ধরে নিজের গ্রাম রাধানগর থেকে পরেশনাথ পাহাড়, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, অযধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর, আজমীর, মীরাট, হরিদ্বার, কেদার, বদরি, দিল্লি, কুরুক্ষেত্র, লুধিয়ানা, ভাগলপুর হয়ে মুর্শিদাবাদ দেখে আবার নিজের গ্রাম- এই ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ঘুরেছেন। এই ভ্রমণের বিবরণ "নিজের তৃপ্তির জন্য এবং আত্মীয়স্বজনকে শুনাইবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া" তারিখ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। সেই পাণ্ডুলিপি লিখিত হওয়ার প্রায় ৫৮ বছর পরে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২২ বঙ্গাব্দ) নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় *তীর্থভ্রমণ* শিরোনামে বইয়ের আকারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। যদুনাথের তীর্থযাত্রা ছিল দীর্ঘ দিনের এবং বহু স্থানের। তাঁর এই বিস্তৃত তীর্থভ্রমণের বিরাট বিবরণের মধ্যে থেকে আমরা শুধুমাত্র তাঁর হিমালয় ভ্রমণের অংশটি আলোচনা করব।

যদুনাথ কেন হিমালয়ে যাচ্ছেন- এই প্রশ্নের উত্তর তিনি স্পষ্টভাবেই লিখেছেন তাঁর *তীর্থভ্রমণ* বইটির প্রথমে। তাঁর তীর্থযাত্রার আগের বছরে যদুনাথ 'অম্বলের ব্যামোহ হইয়া শূল উপস্থিত' হওয়াতে অসুস্থ হয়েছিলেন। রোগের যন্ত্রণায় তাঁর মনে হতে থাকে 'স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলই

বৃথা', 'সম্বন্ধ জীবনাবধি'। এই পরিস্থিতিতে একদিন তিনি আত্মহত্যা করতেও উদ্যত হন। পরে গৃহদেবতার মন্দিরের দরজায় বসে কিছুটা শারীরিক স্বস্তি ফিরে পেয়ে এই চিন্তা করেন যে- "মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারকূপনরকে ডুবিয়া, কেবল আমার আমার করিয়া, সৃজনকর্তা জগদীশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া এত ক্লেশ পাইতে হইতেছে। হে জগদীশ্বর! আমার শরীরে কিছু বল হইলে আমি স্ত্রী পুত্রের মায়া ছেদ করিয়া তোমার দর্শনাশে দেশভ্রমণ করিব"।[১৩] এর এক বছর পরে শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থ হয়ে, শক্তি অর্জন করে তিনি 'ঈশ্বরের দর্শনাশে' তীর্থে বেরিয়ে পড়েন। সেই সূত্রেই তাঁর বইয়ের তথ্য অনুসারে দেখা যায় ১২৬২ বঙ্গাব্দের ৮ বৈশাখ (এপ্রিল, ১৮৫৫) তারিখে তিনি হরিদ্বার থেকে হিমালয়ের 'বদরীনারায়ণের' দিকে যাত্রা শুরু করেন। এই পথে তিনি লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ পাহাড় হয়ে কর্ণপ্রয়াগ এর রাস্তাতে ১২৬২ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাঁর যাত্রা শেষ করেন। অর্থাৎ, প্রায় একমাস ধরে মূলত তীর্থভ্রমণের পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই যদুনাথ হিমালয়ের কেদার-বদরি ও অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করছেন।

যদুনাথ সর্বাধিকারীর *তীর্থভ্রমণ* বইটি সম্পাদনা করে এর ভূমিকা লিখেছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু। সেখানে তিনি লিখছেন-

> বাঙ্গালার সুসন্তান রাজা রামমোহন রায় যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছেন, সেই রাধানগর গ্রামেই ... রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের প্রায় ত্রিশবর্ষ পরে বাঙ্গালা ১২১২ সনে (১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দ) যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন।[১৪]

এই ভূমিকা অংশ থেকেই যদুনাথ সম্পর্কে আরো কয়েকটি তথ্য জানতে পারা যায়-

> যদুনাথ একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন ... তিনি রাধাকান্তজীকে [উপাস্য দেবতা] নিবেদন না করিয়া কোনো জিনিসই গ্রহণ করিতেন না। প্রাতঃকালে অনেকে শিশুরোগী লইয়া তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত, তিনি রাধাকান্তজীর পূজা করিয়া বাহিরে আসিয়া সেই সকল রোগী দেখিতেন, ইষ্টদেবের চরণামৃত দিয়া ... আরাম করিতেন।[১৫]

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যদুনাথ যথেষ্ট ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়াও নগেন্দ্রনাথ বসু জানাচ্ছেন যে-

> তাঁহার [যদুনাথের] সুযোগ্য বংশধর আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন- 'স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মণিষীগণ যদুনাথের সহিত সদালাপের জন্য রাধানগর" আসতেন।[১৬]

অর্থাৎ নিজের সময়ে যদুনাথ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত মানুষ ছিলেন।

যদুনাথ সর্বাধিকারী যখন হিমালয়ে তীর্থে যাচ্ছেন তখন তাঁর ভ্রমণ কাহিনির ভিতর থেকে সহজেই আবিষ্কার করা যাচ্ছে তাঁর ভক্ত সত্ত্বাটি। তিনি কেদার ও বদরিকে সংশ্লিষ্ট তীর্থদেবতার নামানুসারে শুধু 'কেদারনাথ' বা 'বদরিনারায়ণ' লেখেন না, নামগুলির আগে 'শ্রী' এবং '৺' ব্যবহার করেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে। হৃষিকেশ থেকে পায়ে হেঁটে কেদার-বদরি যাওয়ার রাস্তায় যতগুলি মন্দির তাঁর যাত্রাকালে ছিল তার প্রায় সব ক'টিই দর্শন করেছেন যদুনাথ। বিশ্বাসী মন নিয়ে মন্দির সংক্রান্ত প্রচলিত লোককথাগুলির উল্লেখও করেছেন তিনি। যেমন প্রবল শীতে কেদার মন্দিরের পুজো প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন-

> মন্দিরের নিকটে কোনো মনুষ্য কি জীবজন্তু পশু পক্ষ্যাদি কিছু থাকিবার ক্ষমতা হয় না। ঐ ছয় মাস দেবগণ পূজা করে, একথা পূর্ব্বাবধি সকলে শ্রুত আছেন। এক্ষণে দেবতাগণের পূজা করিবার এই চিহ্ন পাওয়া যায় যে, ঘরের ভিতরে ঐ ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, আর অর্ঘ্যের চাউল ও নীলকমল দিয়া যে পূজা হয় তাহা ঐ মন্দিরে থাকে।[১৭]

অথবা মহাপন্থা-হিমলিঙ্গেশ্বর প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন- "এখান থেকে তিন ক্রোশ উত্তরে গমন করিয়া যাইতে পারিলে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব, যাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র দেহ বজ্রতুল্য হইয়া স্বকায়াতে স্বর্গে গমন করিতে পারে"।[১৮] যদুনাথ দেবতা বা দেবস্থানের অলৌকিকত্বেও যে বিশ্বাসী তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই রচনাতেই। যেমন লছমনঝুলা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য–

> আর এক আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে লছমন-ঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা যায়। যে পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে, 'পন্থি! সাবধান পগ্‌ধ্যান মুখে বল রামনাম, হিঁয়া কহি নাহি হায় আপনা'। এই শব্দ শূন্যপথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইয়াছে, কোন ক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে - দৈববাণী তাহার সন্দেহ নাই।[১৯]

মহাপন্থার পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে বলেন-

> যাহার মহাপন্থা হইয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শ করিবার ইচ্ছা হয় তাহাকে অগ্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ কি অন্য অন্য আশ্রম লইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইয়া- গোগ্রাসে ভোজন, তদনন্তর আপন পদে ঝিক করিয়া চরু রন্ধন করিয়া ভোজন ... করিতে হয়।[২০]

শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে তীর্থযাত্রীর যে যে কৃত্য যেখানে যেখানে করা উচিত, যদুনাথ সেই সকল কৃত্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন দেবপ্রয়াগে- "সঙ্গমে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করিয়া, ব্রাহ্মণ, সধবা ও কুমারী আদি ভোজন করাইয়া তীর্থের কর্ম্মাদি" ইত্যাদি কৃত্যের উল্লেখ আছে।[২১] তাছাড়াও তিনি শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে গঙ্গোত্রীতে স্নান-তর্পণ, রুদ্রপ্রয়াগে স্নান তর্পণ, কিম্বা ত্রিযুগনারায়ণে –"স্নান তর্পণাদি করিয়া তিল, যব, ঘৃত, মধু, চিনি, ফুল, বস্ত্র ও কলা দিয়া ঐ ধুনিতে আহুতি দিয়া, নারায়ণ দর্শন"- এর উল্লেখ করেছেন।[২২] কেদারনাথ-এ "প্রথমে পঞ্চগঙ্গাতে স্নান তর্পণ, পরে হংসতীর্থে শ্রাদ্ধাদি"[২৩], একইরকম ভাবে বদরিনারায়ণের "... সপ্ত স্থানে স্নান তর্পণ ও তীর্থ শ্রাদ্ধাদি করিয়া শ্রীবদরীনারায়ণ দর্শন ভেট, ভোগাদির দ্রব্য সকল দিয়া, শ্রীমন্দির পরিক্রম করিয়া, স্থানে স্থানে দর্শন স্পর্শন সর্ব্বত্র করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া আহারাদি" প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন।[২৪] যদুনাথের তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে এই সকল বিষয়ের সন্নিবেশ স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে হিমালয়ের অস্তিত্ব তাঁর কাছে শুধুমাত্র পুণ্যক্ষেত্র-তীর্থক্ষেত্র হিসেবেই।

তীর্থভ্রমণ কাহিনির লেখক হিসেবে যদুনাথ তাঁর যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের বিবরণ হাজির করেছেন। যেমন তিনি ঝাঁপান, কাণ্ডি বা ডাণ্ডির যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। আবার রয়েছে তাদের 'বুকিং' পদ্ধতির উল্লেখও-

> ঝাঁপান চৌকি আকৃতি, তাহার উপরে ছত্রি বাঁধা ... কাণ্ডি বাঁশের চেরাটীর ঘেরা বুনার ন্যায় ... ইহারা বেতন চুক্তি করিয়া লয়, হৃষীকেশে টেরির রাজার তরফে লোক বৈসে, তাহার নিকট ফুরান হয়। ... কাণ্ডিতে যত দ্রব্য লইবে তাহার প্রতি মন ২০ টাকা ...।[২৫]

যদুনাথ তাঁর তীর্থযাত্রাপথের নানা জায়গার নাম, সেখানে সাধারণত কি কি পাওয়া যায় তার তালিকা, বাজার, স্থানের বৈশিষ্ট্য, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্থানটির অবস্থান জনিত গুরুত্ব বা

ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। যেমন দেবপ্রয়াগ সম্পর্কে তিনি লিখছেন- "এস্থলে অনেক বসতি আছে, এজন্য বাজার ও হালওয়াইয়ের দোকান আছে, দ্রব্যাদি উত্তম পাওয়া যায় না। মোটা পুরি, দধি, চিনি (ও) জিলাপি পাওয়া যায়, তরকারির মধ্যে বিলাতি কুমড়া"।[২৬] অথবা, শ্রীনগর বিষয়ে লেখেন- "এই শ্রীনগর পর্ব্বত মধ্যে সহর। যে কেহ হরিদ্বার হইতে চনার, দাল, নারিকেলের গোলা, বাদাম, কিসমিস লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, কালামরিচ, বস্ত্র, চাউল, চন্দন এবং আর আর গন্ধ দ্রব্যাদি না আনেন, এই সহরে লইতে হয়"।[২৭] শুধু পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানই নয়, লেখক অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গা সম্পর্কেও একই ধরনের তথ্য দিয়ে থাকেন। যেমন, ভীমগড়া সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য- "এখানে আহারের আটা এবং অরহরের দাল, ঘৃত (ও) গুড় পাওয়া যায়, চিড়া মোটা মিলে"।[২৮] তাছাড়াও পরস্পর অন্বিত জায়গাগুলির দূরত্ব, তাদের ভৌগোলিক পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণা হাজির করেছেন লেখক যদুনাথ- "গঙ্গাসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় চারিশত ক্রোশ উচ্চে", কিম্বা "বিজলী হইতে মহাদেবকী চট্টি আট ক্রোশ", অথবা "ব্যাস আশ্রম হইতে দেবপ্রয়াগ ছয় ক্রোশ" ইত্যাদি। কিন্তু এই তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পুণ্যদায়ক তীর্থযাত্রার ব্যবহারিক সুখ-সুবিধার খোঁজ দেওয়ার জন্য।

তবে যদুনাথ সর্বাধিকারীর লেখাতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়- বৃটিশ শাসক সম্পর্কে তাঁর প্রশংসাসূচক মনোভাব। *তীর্থভ্রমণের* সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু বইটির ভূমিকাতে লিখেছেন- "ইংরাজ শাসনের প্রতি ও ইংরাজ জাতির প্রতি স্বভাবতঃই তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি হইয়াছিল। সেই রাজভক্তির পরিচয় তীর্থভ্রমণের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ-শাসনের যে কেহ বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন, তাহারই উপর তিনি ক্রোধ ও বিরক্তি ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তীর্থ শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় তিনি সিপাহী বিদ্রোহের অনেক লীলাস্থল

স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন- তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহীদিগের উপর যথেষ্ট ঘৃণা ও অবজ্ঞা জন্মিয়াছিল। তিনি বারবার মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া আসিয়াছেন, 'দুর্বৃত্তেরা অত্যাচার করিয়া দেশেরই শত্রুতা করিয়াছে ইংরাজের কিছুই করিতে পারিবে না'। ইংরাজের বাহুবল, যুদ্ধ কৌশল ও রাজনীতিতে তিনি প্রকৃতই বিমুগ্ধ ছিলেন।"[২৯] মহাবিদ্রোহকালীন সময়ে বৃটিশ শাসকের প্রতি বাঙালি লেখকের এই আনুগত্য স্বাভাবিক ছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় "শিক্ষিত বাঙালি ও অশিক্ষিত সিপাহিদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। ... শিক্ষিত বাঙালি সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি, বরং বিদ্রোহ দমিত হলে তারা আনন্দ প্রকাশ করেছিল"।[৩০]

যদুনাথের পরে উল্লেখ করা যেতে পারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমালয় ভ্রমণের প্রসঙ্গ। যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভ্রমণ কাহিনি লিখছেন না, কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী এই আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে 'বিরক্ত ও ঔদাস্য' বোধ করাতে ভ্রমণে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'পূজার সময় দেশ ও গৃহত্যাগ' করে 'কাশী পর্য্যন্ত এক শত টাকায় একটি বোট ভাড়া' করে তিনি যাত্রা শুরু করেন। এই যাত্রায় তিনি কাশীর পরে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গাতেই যাচ্ছেন যেগুলি তীর্থস্থান অথবা ঐতিহাসিক কারণে দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। তবে তিনি যে হিন্দু তীর্থযাত্রী হিসেবে যাচ্ছেন না, তা স্পষ্ট হয় তাঁর এলাহাবাদের বিবরণে- "এই প্রয়াগ তীর্থ। আমার নৌকা পহুঁছিতে পহুঁছিতেই কতকগুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। এক জন পাণ্ডা 'এখানে স্নান কর, মাথা মুণ্ডন কর', বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'আমি এ তীর্থে যাইব না, মাথাও মুণ্ডন করব না"।[৩১] এই যাত্রায় ১৮৫৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসর হয়ে সিমলা যাচ্ছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়কে দেখছেন ঈশ্বরের করুণার প্রকাশে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র হিসেবে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায় 'আত্মজীবনী'র নানা অংশে। হিমালয় সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অনুভূতি ছিল এরকম— "যত উচ্চ পর্ব্বতে উঠি, ততই আমার মন উচ্চ হইতে লাগিল।"[৩২] প্রকৃতির বিশালতার সঙ্গে হৃদয়ের বিশালতার এই সাযুজ্যের বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয়। সিমলা ছেড়ে যখন আরও উচ্চতায় যাচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ তখন প্রাকৃতিক সোন্দর্য্য তাঁর চোখে বার বার ধরা পড়ছে। কিন্তু এই প্রকৃতিকে কীভাবে দেখছেন তিনি?-

> শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল।[৩৩]

আবার আত্মজীবনীর অন্য জায়গায় দেখা যায় - "আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম।"[৩৪] অর্থাৎ প্রকৃতি বা তার সৌন্দর্য্য দেবেন্দ্রনাথের কাছে বাহ্যিক-বস্তুগত-বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, তা ঐশ্বরিক প্রকাশের অংশ। হিমালয়ের তীর্থসৌধে ঈশ্বরের অন্বেষণ নয়, বরং তার প্রকৃতিই তাঁর কাছে ঐশ্বরিক বিষয়। শুধু তাই নয়, এই সুন্দর দৃশ্য দেখেই দেবেন্দ্রনাথের মনে পড়ে যাচ্ছে হাফীজ-এর কবিতা।[৩৫] এইভাবে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক বিষয়ের সমাহারে উপভোগ্য মনে করছেন তিনি।

এর পাশাপাশি দেবেন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছেন পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষদের জীবনযাত্রা। এক জায়গায় তিনি জানাচ্ছেন এক পাহাড়ী গ্রামের বিশেষ একজন মানুষের কথা

যার মুখে 'ভালুক থাবা মারিয়াছিল' বলে 'নাক নাই, মুখখানা একেবারে চেপ্‌টা'। তার নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গীতে আনন্দ-নৃত্য দেখে দেবেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে — "সেই ভাঙ্গা মুখ লইয়া তাহার কতই নৃত্য, কতই তাহার আমোদ!! আমি সেই পাহাড়ীদের সরল আকৃতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।"[৩৬] লক্ষণীয় 'সরল' বিশেষণটি। নাগরিক জীবনের নানা জটিলতার বিপরীতে এই 'পাহাড়ীদের সরল' জীবন দেবেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছে। তিনি 'পাহাড়ীদের' সমাজজীবনের সঙ্গেও আগ্রহের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন— "গ্রামের অনেকগুলি লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল 'আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময়ে এক হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্ব্বদাই চলিতে হয়।"[৩৭] তাদের সমাজ কাঠামো জানার বিষয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ- "তাহাদের দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। পাণ্ডবদের মত তাহারা সকল ভাই মিলে একজন স্ত্রীকে বিবাহ করে। সেই স্ত্রীর সন্তানেরা সকল ভাইকেই বাপ বলে।"[৩৮] কিন্তু নাগরিক জীবনের জটিলতার বিপরীতে পাহাড়ের গ্রামের জটিলতামুক্ত জীবন, বস্তুগত আকাঙ্ক্ষার তুলনায় পাহাড়ের মানুষদের সাধারণ নিস্তরঙ্গ জীবন তাঁর কাছে সব থেকে বেশি উপভোগ্য মনে হয়েছে-

> এই উপত্যকা ভূমি অতি রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই; একটি গ্রাম নাই। এখানে স্ত্রী পুত্র লইয়া একটি ঘরে একজন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে, সে পর্ব্বতের গহ্বর; সেখানেই তারা রন্ধন করে, সেখানেই শয়ন করে।... এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তিসুখ দুর্লভ।[৩৯]

এর থেকে বলা যায় যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে হিমালয় 'পবিত্র'। কিন্তু এই পবিত্রতা তীর্থের অবস্থিতির কারণে নয়। হিমালয়ের প্রকৃতি, হিমালয়ের মানুষদের জীবনযাত্রা তাঁর কাছে জাগতিক ক্লেদমুক্ত- তাই 'বিশুদ্ধ' এবং পবিত্র।

উনিশ শতকের শেষ দিকে যে সকল বাঙালি হিমালয়ে ভ্রমণ বা তীর্থ করতে যাচ্ছেন এবং কাহিনি রচনা করছেন তাঁদের প্রায় সকলেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের চিন্তা-চেতনা পাশ্চাত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাই এই যাত্রীদের হিমালয়কে দেখার দৃষ্টিও বদলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সীমন্তী সেনের মত-

> "By the end of nineteenth century travel for colonized Bengali intelligentsia did not merely symbolize personal enterprise; it has emerged as a communitarian imperative. … The ideas of stability and certainty of home were seriously destabilized under the impact of colonial rule. While this was largely the result of existensial compulsions under the new political regime, influence of the western literature also played a very significant role. On one hand it kindled the imagination of the new literati with a notion of Romance and on the other it awakened in them a spirit of nationalism and patriotism. To know one's land and people was the first and primary step for acquiring the knowledge of 'self' and finding a basis for his imagination of a composite nation. … The western educated colonized elite suddenly discovered a route to 'freedom'- it was not only a freedom from the precincts of home; it was a freedom of consciousness from

the trappings of tradition and barriers of custom to seek the fulfilment 'of the modern self.[৪০]

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালির ভ্রমণচেতনাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সীমন্তী সেন এখানে নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর মতও উল্লেখ করেছেন- "According to Chaudhuri, both the appreciations- of nature's beauty and romantic love- were western derivatives. It was through their avid exploration of the world of Byron, Shelly, Keats and their ilk that the new Bengali had learnt to express fascination for nature's 'bewildering beauty"। তবে নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর এই বক্তব্য পেশ করার পরে সীমন্তী আবার বলছেন- "Whether we accept the full import of Chudhuri's analysis or not, it can be said that nationalism and romanticism blended inextricably to promote travel as a cultural as well as a political project"।[৪১]

সীমন্তী সেন এই আলোচনাতে দেখিয়েছেন উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির সৌন্দর্য্যের ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছিল ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে। তাছাড়াও এই সময় থেকেই বাঙালির ভ্রমণের সঙ্গে 'অপরে'র বিপ্রতীপে 'স্ব'কে জানার জাতীয়তাবাদী প্রবণতা যুক্ত হচ্ছিল। এবং ভ্রমণ বিষয়টি গৃহবেষ্টনী বা প্রাগাধুনিক গার্হস্থ্য রীতি-রেওয়াজের থেকে 'মুক্তি'র উপায় হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছিল। তাই সৌন্দর্য্যের সন্ধান এবং জাতীয়তাবাদের মিশ্র প্রণোদনায় ভ্রমণ বাঙালির কাছে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রকল্প হয়ে উঠছিল।

উনিশ শতকের শেষে তীর্থযাত্রী হিসেবে হিমালয়ে যাচ্ছেন এবং তীর্থভ্রমণ কাহিনি লিখছেন অপর এক জন বিখ্যাত বাঙালি রামকুমার ভট্টাচার্য। যদিও সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি স্বামী রামানন্দ ভারতী নাম গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরের ইদিলপুর শহরের সামন্তসার পল্লীতে জন্মেছিলেন রামকুমার ভট্টাচার্য। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি ব্রাহ্মসমাজ

কমিটির সদস্য হন। অবশ্য এর আগেই তিনি আসাম গিয়ে (১৮৭৪ নাগাদ) চা বাগানের কুলিদের দুরবস্থা নিয়ে রচনা করে ফেলেছিলেন *কুলি কাহিনী*। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রী বিয়োগের পর রামকুমার বিধি মেনে সন্ন্যাসী হলেন এবং রামানন্দ ভারতী নাম গ্রহণ করলেন। ইনি মাতামহ। লীলা মজুমদার তাঁর সম্পর্কে লিখছেন-

> তিনি উত্তরাখণ্ডের প্রায় সব তীর্থে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর দুই একজন সঙ্গী থাকতেন; তাঁদের মধ্যে একজন হলেন জলধর সেন। ... নানান পার্বত্য তীর্থস্থানে রামানন্দ ঘুড়ে বেরাতেন, তাছাড়া তিনি পুষ্করেও গিয়েছিলেন। ... কৈলাসযাত্রা করেন ১৮৯৮ সালে। ... এই ভ্রমণের তিন-চার বছর পরে *হিমারণ্য* নাম দিয়ে রামানন্দ নিজে তাঁর ভ্রমণ-কাহিনি লিখেছিলেন। সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। দুঃখের বিষয়, ঐ সময় ১৩০৮ সালের (১৯০১) মাঘ মাসে কাশীতে রামানন্দের মৃত্যু হওয়ায় শেষের চারটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়নি।[৪২]

স্ত্রী বিয়োগের পরে, শিশু কন্যাদের ছেড়ে সন্ন্যাস নিচ্ছেন রামানন্দ এবং তীর্থভ্রমণ করতেই ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যাচ্ছেন কৈলাস-মানস সরোবর। তাই সাধারণভাবে মনে হয় রামানন্দের কাছে হিমালয় হল আধ্যাত্মিক তীর্থক্ষেত্র। লেখক নিজেও তাঁর রচনার মধ্যে অনেক সময় সেই মতই প্রকাশ করেছেন— "আমি দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী; সুতরাং ভগবানের প্রতিষ্ঠিত দেবতাদর্শন, তীর্থস্থান ও মঠ সন্দর্শন করিয়া বিগতপাপ, ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম"।[৪৩] তাছাড়াও হিমালয়ের পবিত্রতা প্রতিপাদনে লেখক দেবীপুরাণ, কেদারখণ্ডের উল্লেখ করেছেন।[৪৪] তবে এককালের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শিক্ষিত রামানন্দের চোখে হিমালয়ের প্রাকৃতিক

দৃশ্যের শোভা বার বার ধরা পড়েছে। তাঁর লেখাতে প্রায়শই উঠে এসেছে সেই সৌন্দর্য্যের বিবরণ-

> হিমালয় তপোভূমি। যেখানে মনের স্থৈর্য, প্রাণের আরাম, জ্ঞানের স্ফূর্তি, ভক্তির বিকাশ, ইন্দ্রিয়ের নিস্তব্ধতা সম্পাদিত হয়, সেই স্থানই তপস্যার উপযুক্ত। ... অদ্য প্রায় দুই মাস কাল অতীত হইল আমি হিমালয়ের শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিয়া কন্দরের অপূর্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে অদ্য মধ্যাহ্নে পুণ্যতীর্থ যশীমঠে উপস্থিত হইলাম।[৪৫]

এই বইয়ের অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন-

> পার্বতীয় পথ আমার পক্ষে কষ্টকর হইলেও স্বভাবের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্তের মত চলিতে লাগিলাম। হিমালয়ের স্নিগ্ধ শীতল বায়ু আমার শ্রান্ত দেহের ক্লান্তি নাশ করিতে লাগিল; এবং সম্মুখস্থ হিমমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ আমার মনকে উচ্চ হইতে উচ্চতর দিকে টানিতে লাগিল।[৪৬]

পরে তিনি এই ধরনের বিবরণ আরও দিয়েছেন—

> ...আকাশে মেঘের রেখামাত্র নাই; চারিদিকে তুষারময় পর্বতগুলি সূর্যের কিরণস্পর্শে সুবর্ণপর্বত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; নির্মল ও নীল আকাশ যেন সুবর্ণবৎ হিমশৃঙ্গগুলিকে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য মেঘাবরণ হইতে বিশাল বক্ষঃস্থল উন্মুখ করিয়া পর্বতাঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আমি এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হিমালয়ের অসীম শোভার মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেলাম।[৪৭]

কৈলাসের সৌন্দর্য্য দর্শন করে তাঁর বক্তব্য— "ভাষাতে শব্দ নাই, ভাবে অনন্তত্ব নাই, বাক্যের অনন্ত স্ফূর্তি নাই, চক্ষুর বর্ণনাশক্তি নাই, বাক্যের দর্শনশক্তি নাই; সুতরাং কৈলাসের বর্ণনা হইল

না।"[৪৮] অর্থাৎ সন্ন্যাসী রামানন্দের কাছে তীর্থভূমি হিমালয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই দর্শনীয় হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য।

তবে সন্ন্যাসী রামানন্দের তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে হিমালয়ে বসবাসীকারী গ্রামীণ মানুষদের সম্পর্কে উৎসুক বিবরণ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনযাপনের রীতি-পদ্ধতি। কখনও সরাসরি সেই কথপোকথন সংলাপের আকারে তুলে দিয়েছেন নিজের কাহিনিতে-

> ... সন্ধ্যার পূর্বেই 'মলহারী' গ্রামে পঁহুছিলাম। ... গ্রামবাসীরা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। ... আমি বলিলাম 'তোমাদের এদেশে বড় শীত। ... এইতো গ্রীষ্মকাল, শীতে তোমরা কি করিয়া থাক? গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ বলিল। 'এখানে শীতকালে টেকা যায় না' ...
>
> আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শীতকালে তোমরা কোথায় থাক?'
>
> গ্রামবাসী। যশীমঠের ১৮ মাইল নীচে লালসাঙ্গা নামক স্থানে।
>
> আমি। তবে তো বড় কষ্ট!
>
> গ্রামবাসী। মহাশয় কষ্টের কথা কি বলিব? ছেলে, পিলে, গরু, বাছুর, ভেড়া বকরি লইয়া প্রতি বৎসর যাওয়া আসা বড়ই কষ্ট ইত্যাদি।[৪৯]

রামানন্দ ভারতী আবার কখনও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে হিমালয়ের গ্রামবাসীদের পর্যবেক্ষণ করেছেন-

> এই দশ দিবসের মধ্যে এখানকার রীতিনীতি চালচলন যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।- এই সীমান্ত প্রদেশের

> লোকেরা নীতির ধার ধারে না। তাহার পর ধর্মে ইহারা বাহ্যিকভাবে দেব উপাসক, কিন্তু তাহা কেবল ভয়ের খাতিরে, ভক্তির সঙ্গে ইহাদের বিশেষ বিবাদ। এই পার্বত্য জাতির মধ্যে অধিকাংশই বিষ্ণুমন্ত্রী। কিন্তু ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী। ... ইহারা অতিশয় লোভী। টাকার খাতিরে স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি কুলস্ত্রীদিগকে শিকারী সাহেবদিগের সঙ্গিনী করিয়া দেয়। ... এজাতির মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। ... স্ত্রীজাতির পরিধান ঘাগরা, অঙ্গাবরণ জ্যাকেটের অনুরূপ, ইহার উপর সর্বাঙ্গ আবরণ করিয়া একখানি কম্বল পরিধান করে এবং মাথায় পাগড়ী অনুরূপ বস্ত্র বাঁধে। ইহারা বৎসরান্তে একবার বস্ত্র পরিবর্তন করে। এই জাতীয় পুরুষদিগের পরিচ্ছদ পাজামা, লম্বা চাপকান, পাগড়ী বা টুপি ...।[৫০]

তীর্থযাত্রায় গিয়ে হিমালয়ের মানুষদের সম্পর্কে রামানন্দের এই আগ্রহ স্পষ্ট করে দেয় যে শুধু তীর্থক্ষেত্র হিমালয় নয়, হিমালয়ের বাসিন্দারাও তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা দরকার যে সন্ন্যাস গ্রহণের আগেই রামানন্দ *উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ* (১৮৭৯) এবং *কুলি কাহিনি* (১৮৮৮) লিখে ফেলেছেন। ওই রচনা দুটি আসামের চা বাগানের কুলিদের দুরবস্থার দলিল হয়ে উঠেছিল-

> It was because of the initiative taken by the members of Brahmo Samaj that the problems of Assam plantation workers became a regular matter of discussion at the meetings of the Indian Association. The Government introduced the Inland Emigration Bill in 1881 (which became an Act in 1882). In 1881, immediately after the introduction of the Bill, the Indian Association submitted a detailed memorandum to the Government of India

> vehemently criticizing certain procvisions … of the Bill. When the memorial was submitted to Lord Ripon, a copy of Ramkumar's book (Udashin Satyasrabar Assam Bhraman) highlighting the inhuman practice of coolie recruits, the role of Arkanthis (recruiters) was also attached … Lord Ripon referred to this book and the memorandum in his speech.[৫১]

তাই রামকুমার সন্ন্যাসী রামানন্দ হয়ে যখন হিমালয়ের কৈলাস-মানসসরোবর তীর্থযাত্রায় গিয়ে তীর্থভ্রমণ কাহিনি লিখছেন তখনও হিমালয়ের গ্রামীণ মানুষদের জীবন তাঁর রচনাতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে।

হিমালয় বিষয়ক বাংলা ভ্রমণকাহিনিগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল জলধর সেনের *হিমালয়*। "১৩০০ বঙ্গাব্দের সূচনা থেকেই (১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) 'ভারতী'তে [জলধর সেনের লেখা] হিমালয় ভ্রমণের ধারাবাহিক রচনা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে"।[৫২] তবে তার আগে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকাতে জলধর সেনের *টপকেশ্বর ও গুচ্ছপাণি*, *সহস্রধারা*, *হৃষিকেশ* প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে *হিমালয়* গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। এর এক বছর আগে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জলধর সেনের হিমালয়ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন *প্রবাস চিত্র* বই আকারে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। *প্রবাস চিত্র*-ও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এটির 'পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত' সংস্করণ অনেক পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্রুত পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল।[৫৩] এই দু'টি বই ছাড়াও জলধর সেন হিমালয় ভ্রমণবিষয়ে *পথিক* (১৯০১) নামের একটি বই রচনা করেন। লেখকের মতে এটিকে *প্রবাসচিত্র* এবং *হিমালয়ের* পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে'।[৫৪] জলধর সেনের *হিমাচল-বক্ষে* নামের অপর একটি বই ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে

প্রকাশিত হয়। এটির সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য- "প্রবাসচিত্র' 'হিমালয়' এবং 'পথিকে; যাহা বলিতে পারি নাই, 'হিমাচল-বক্ষে' তাহার কিছু বলিবার চেষ্টা করিলাম"।[৫৫] তবে এই সকল রচনাগুলির মধ্যে থেকে জলধর সেনের *হিমালয়* সব থেকে বেশি প্রচার ও সম্মান লাভ করেছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত হিমালয়ভ্রমণ বা হিমালয় বিষয়ে ভ্রমণকাহিনি রচনা- দু'টি ক্ষেত্রেই জলধর সেনের এই বই শিক্ষিত বাঙালিকে প্রভাবিত করেছে।

হিমালয় বইটির "খসড়ার সূত্রপাত ঘটেছিল একটি ডায়েরির আকারে রচনার মধ্যে। ... [জলধর সেনের] হিমালয় ভ্রমণের সূচনা হয়েছিল ৫ই মে, ১৮৯০ মঙ্গলবার তারিখে। ... ৫ই মে থেকে ৮ই জুন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে তিনি ডায়েরির আকারে তাঁর যাত্রা-বিবরণের খুঁটিনাটি লিখে রাখেন। এই ডায়েরি রচনা অবশ্যই সচেতনভাবে লিখিত হয়নি। কারণ এই বিবরণ কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে, জলধর তা স্বপ্নেও ভাবেননি। ... দেশে ফিরেও জলধর এটি প্রকাশের কিছুমাত্র তাগিদ অনুভব করেননি। কিন্তু তাগিদ এল শিষ্য দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছ থেকেই"।[৫৬]

দীনেন্দ্রকুমার রায় জলধর সেনের ছাত্র এবং বন্ধু। তিনি *হিমালয়* বইটির ভূমিকাও লিখেছেন। এই ভূমিকায় দীনেন্দ্রকুমার রায় জানিয়েছেন-

> জলধর বাবু স্বভাবভীরু লোক, সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন না। বর্তমান ভূমিকা লেখকের সহিত এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ বিষয়ে কিছু সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহার ডায়েরীখানি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যদি হিমালয় কাহিনী যথানিয়মে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইল তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গ ভাষায় এ রত্ন প্রকাশ করিতেন কিনা এ সম্বন্ধে আমার এবং যাঁহারা জলধর বাবুকে জানেন তাঁহাদের অনেকেরই সন্দেহ আছে।[৫৭]

জলধর সেনের *হিমালয়ের* গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায় বইটির ভূমিকায় লিখছেন- "যাঁহারা কোনো রকমে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া উপার্জনের পন্থায় দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত আফিস করেন এবং অর্থোপার্জন ব্যতীত অন্য চিন্তার অবসর পান না, তাঁহাদের তৃষিত হৃদয়ও অনতিদীর্ঘ অবকাশকালে রথ-চক্র মুখরিত ইষ্টকবদ্ধ রাজপথ এবং অট্টালিকা সঙ্কুল শহরের দূষিত বায়ুপ্রবাহ পরিত্যাগপূর্বক মুক্তপ্রকৃতির বৈচিত্রময় শ্যামল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিশ্ববিধাতার প্রেমধারা পান করিবার জন্য অধীর হইয়া ওঠেন"।[৫৮] নাগরিক জীবনের এই অবরুদ্ধতার বিপ্রতীপে দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে ভ্রমণ- বিশেষত হিমালয় ভ্রমণের কথা বলেছেন। এরপরে তিনি জানিয়েছেন যে, "ইউরোপ হইলে এই এক হিমালয়ের সহস্র সহস্র বিভিন্ন মনোরম দৃশ্য অবলম্বন করিয়া বহু পুস্তক বিরচিত হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের একখানিও নাই"। এই 'না থাকা'র আক্ষেপ তাঁকে এর কারণ অনুসন্ধানে উৎসাহিত করেছে। এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাংলা ভাষায় হিমালয় সংক্রান্ত 'একখানিও' ভ্রমণকাহিনি না থাকার কারণ দু'টি। প্রথমত, "সেখানে রেলপথ নাই, অনেক স্থানে পথ পর্যন্তও নাই, আমাদের ন্যায় শ্রমবিমুখ, বিলাসপ্রিয়, সুখ-লিপ্সু বঙ্গ যুবক শখের খাতিরে সেই সকল বিপদ সঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ ভ্রমণ করিতে যাইবেন ইহা একেবারেই অসম্ভব। শিক্ষিত সৌখিন লোকের সে সকল স্থানে গতিবিধি নাই"। তিনি দ্বিতীয় যে কারণটি নির্দেশ করেছেন সেটি হল, "যে সকল পুণ্যলোভেচ্ছু মুক্তিপথাবলম্বী সন্ন্যাসী এই সকল দুর্লভ দর্শন স্থানে জীবন বিপন্ন করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি একজনেরও এই ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই যে, এই পুণ্যময় পার্বত্যভূমির মধুর কাহিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের পাঠক সমাজের কৌতূহল নিবারণ করে"।[৫৯] অর্থাৎ, দীনেন্দ্রকুমারের কাছে হিমালয় ভ্রমণ হল প্রায় অভিযান বা 'অ্যাডভেঞ্চার'। শিক্ষিত বাঙালির কাছে সেই অভিযানের আকর্ষণ

বা সাহস তখনও পর্যন্ত ছিল না, তাই হিমালয় সংক্রান্ত কোনো ভ্রমণ কাহিনি রচিত হয়নি বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর ধারণা জলধর সেনের *হিমালয়* সেই অভাব পূরণ করেছে।

জলধর সেন অবশ্য হিমালয়কে দেখছেন সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাঁর হিমালয়ে যাওয়ার স্পষ্ট অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

> ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৫ বছর বয়সে জলধরের বিবাহ হয়। স্ত্রীর নাম সুকুমারী। বিয়ের প্রায় আড়াই বছর পর তাঁর স্ত্রী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। জন্মের বারো দিন পরে মেয়েটি মারা যায়। মেয়ের মৃত্যুর বারো দিন পরেই মা সুকুমারী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিতা হন। ... এই ঘটনার প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই [জলধরের] মা কালিকুমারীদেবীর প্রয়াণ ঘটে। এই ভাবে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে মেয়ে স্ত্রী ও মাকে হারিয়ে জলধর দিশেহারা হয়ে পড়েন ও মানসিক শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে হিমালয়ে গমন করেন।[৬০]

অর্থাৎ জলধর সেনের কাছে হিমালয় আশ্রয়স্বরূপ। ব্যক্তিগত শোকে কাতর জলধর হিমালয়ের প্রকৃতির সান্নিধ্যে যেতে চেয়েছেন। তাঁর রচনায় সেই প্রকৃতির বিবরণ বারবার ফিরে এসেছে।

জলধর সেনের *হিমালয়* প্রায় তারিখ উল্লেখ করে ডায়েরির আকারে লেখা। যদিও সেগুলি ‘পদব্রজে’, ‘দেবপ্রয়াগের পথে’, ‘দেবপ্রয়াগ’, ‘শ্রীনগর’, ‘বদরিনাথ’ ইত্যাদি শিরোনামে আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই আঠারো অধ্যায়ে বহুবার পাওয়া যায় হিমালয়ের সুন্দর দৃশ্যের কথা। যেমন তিনি লিখছেন-

> দেবপ্রয়াগের দৃশ্যশোভা বড়ই সুন্দর। পূর্বেই বলেছি এখানে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম হয়েছে। ... অলকানন্দা ঘোর রবে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে; তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, তার তরঙ্গ কল্লোল আর তার উচ্চ

> তটভূমির বিস্তীর্ণ পাথরের উপর শ্যামল শৈবালের স্নিগ্ধ শোভা দেখে তাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি বলে বোধ হয়।[৬১]

আবার অন্য একটি জায়গায় তিনি লিখছেন

> ... সে জায়গাটি বড়ই সুন্দর। নীচেই নদী, ওপারে ছোট বড় অনেক গাছের সার। গাছগুলো বাতাসে দুলছে, আর তাদের চঞ্চল ছায়া নদীর নির্মল জলে সর্বদাই কাঁপচে। কিন্তু গাছের শোভার চেয়ে ময়ূরের শোভাই বেশী। ওপারের গাছগুলিতে ময়ূরের পাল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে বেশ মেঘ আছে। দলে দলে ময়ূর পুচ্ছ খুলে যে কি সুন্দর নৃত্য আরম্ভ করেছে তার আর কি বলব? তাদের ডাকে সেই বনভূমি ও নিস্তব্ধ নদীতীর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।[৬২]

কিন্তু প্রশ্ন, কেন বারবার জলধর সেনের লেখাতে প্রকৃতি ফিরে আসে? এর উত্তরও পাওয়া যায় এই রচনার মধ্যেই। কর্ণপ্রয়াগে আম্বালাবাসী 'লাহোর কলেজে বি.এ পর্যন্ত' পড়া এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথপোকথনের প্রসঙ্গে জলধর লিখছেন-

> ... ইনিই পূর্বকথিত পুলিশ ইন্সপেক্টর। ... তিনি বল্লেন 'I cannot bring myself to believe that a man of culture like you has been taking so much trouble to go to see a shrine.' আমি কি শুধু ভাঙা মন্দিরে কতকগুলি পুরাতন দেবমূর্ত্তি দেখবার জন্যে অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি? এরা কি আমার কঙ্কালসার হৃদয়ের গভীর বেদনা নিবারণ করতে পারে? পার্বত্য-নগ্ন-সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য, খরতোয়া বঙ্কিম গিরিনদীর রজতপ্রবাহ ও সুশীতল সমীরণের অবারিত হিল্লোল, এরাই যে আমার জীবনের উপাস্য দেবতা ইন্সপেক্টর তা বুঝতে পাল্লেন না।[৬৩]

- এ থেকে স্পষ্ট হয় যে জলধরের কাছে হিমালয় হল একাকী, বিরহী, বেদনাহত মানুষের মানসিক শান্তির স্থল।

জলধর সেনের হিমালয় দর্শনের মধ্যে 'সাবলাইমে'র ধারণার অন্তর্ভুক্তি লক্ষ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে রণবীর লাহিড়ী তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন-

> বিগত তিনশো বছরের পশ্চিমি নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত ধারণাটি 'সাবলাইম'। ... ইতালীয় সমালোচনা-সাহিত্যের নামাজাদা অলংকারশাস্ত্রবিদ লনজিনাস খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে এই ধারণার অবতারণা করেন। যদিও তাঁর কাছে সাবলাইম ছিল এক নিছক ভাষিক কৌশল, এক আলঙ্কারিক প্রকরণ যার প্রয়োগে পাঠকের মন উন্নীত হয় এক উচ্চস্তরে। অষ্টাদশ শতকে প্রথম থেকেই সাবলাইমের এই অলঙ্কারকেন্দ্রিক অর্থনির্ভরতা স্থানচ্যুত হয়ে বস্তুবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতি হয়ে ওঠে এই সাবলাইমের আধার। এই যে এত বড়ো অবস্থানগত ও অর্থগত প্রসারণ সেটা ঘটে যায় রোমান্টিকতার মধ্যস্থতায়। ... সাবলাইম হল প্রকৃতির সেই দিকটি যা 'purposeless', যার সাক্ষাতে দ্রষ্টার মনে একই সময়ে সঞ্চারিত হয় উদ্বেগ আর সুখানুভূতি। এই উদ্বেগের দুটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। একটি হল প্রকৃতির প্রকাণ্ড অবয়বহীনতার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও অসহায়ত্ব বোধজনিত উৎকণ্ঠা। অন্যটি হল প্রকৃতির এই অনির্দিষ্ট বিশালতাকে ধারণা ও চিত্রণ করার ব্যাপারে কল্পনার ব্যর্থতা।[৬৪]

এর পরে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে বাংলা হিমালয় নির্ভর সাহিত্যে পাশ্চাত্যের এই সাবলাইমের ধারণাকে কিছুটা বদলে নিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর প্রমাণ দিতে গিয়ে লেখক সর্বপ্রথমে জলধর সেনের *হিমালয়ের* অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন-

> আজ আমার সম্মুখে যে বিরাট দৃশ্য উন্মুক্ত হয়েছে এ অলৌকিক। মানুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব এই বিরাট বিশাল নগ্ন সৌন্দর্যের পাদদেশে এসে স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে নতুন বলে সুরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে তাকালে আমাদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি, সৃষ্টি দেখে আমার স্রষ্টার মহান ভাব কতক পরিমাণে হৃদয়ে ধারণ করার অবসর পাই।[৬৫]

অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাবলাইমের ধারণা বাংলা হিমালয় ভ্রমণকেন্দ্রিক কাহিনিতে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে অধ্যাত্মবাদ জায়গা করে নিচ্ছে। এই ধরনের অভিব্যক্তি জলধর সেন পরবর্তী অনেক হিমালয়-ভ্রমণকাহিনির লেখকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

লক্ষণীয় *হিমালয়*-এ শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, তার পাশাপাশি জলধর তাঁর ভ্রমণ-অঞ্চলের ইতিহাস, সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্য, বাসিন্দাদের পরিচিতিও উপস্থাপিত করেছেন। যেমন- গাড়োয়ালের ইতিহাস জানিয়েছেন তিনি-

> অনেকদিন আগে একবার নেপালের রাজা গাড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করেন। গাড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পর্বতে পলায়ন করেন। এই সময় হতে গাড়োয়াল নেপালেরই অধিকারভুক্ত হয়। ... গাড়োয়ালরাজ উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কল্লেন এবং তাঁদের সাহায্যে গাড়োয়াল স্বাধীন হলো। কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অর্ধেক গাড়োয়ালের পরিবর্তে ক্রীত হয়েছিল।[৬৬]

হিমালয়ের পথের নানা তথ্য দিয়েছেন লেখক-

> বদরিকাশ্রম উত্তর ও দক্ষিনে লম্বা, বোধ হয় ৪০০ ফিটের বেশি নয়, কিন্তু অসমান পাহাড়ের মধ্যে এই স্থানটুকু খুব দীর্ঘ বলে বোধ হয়। দীর্ঘে এতখানি হলেও প্রস্থে বেশী নয়, আরও দেখলুম প্রান্তদেশ

> খানিকটা ঢালু। ... সমস্ত ঘর বাড়ির একটা সঠিক ধারণা না হলেও বোধ হলো পাণ্ডাদের বাসস্থান ও দোকান সবশুদ্ধ ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা ঘরের বেশী হবে না। বাজারে দরকারী জিনিসপত্র সকলি পাওয়া যায়।[৬৭]

যাত্রাপথের বসত-অঞ্চলের বাসিন্দাদের অবস্থাও জানাচ্ছেন তিনি- "পাণ্ডাদের ঘর-দ্বারের অবস্থা এরকম হলেও তারা খুব গরীব নয়। বদরীনায়াণের অনুগ্রহে প্রতি বৎসর এই সময় তারা বেশ দু দশ টাকা রোজকার করে। আর তাতেই তাদের সমস্ত বছরটা চলে যায়। ... এদের চলন মিতাক্ষরা মতে"।[৬৮] হিমালয়ের এই জনজীবন, সংস্কৃতি, ভূ-প্রকৃতিকে তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে জলধর বিশেষভাবে উপস্থাপিত করছেন কারণ এটি তাঁর নিজস্ব পরিচয়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বা 'অপর' একটি বিষয়। এই 'অপর'কে চিহ্নিত করতে গিয়ে নিজের সঙ্গে তার স্পষ্ট পার্থক্যও উল্লেখ করছেন তিনি- "আমার চাকর বাবাজি হয় ত প্রথমে মনে করেছিল আমি তার এই পরিবর্তন দেখে [সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ] তাকে চিনতে পারব না; তাই তার পশ্চিমে বুদ্ধির দ্বারা আমার বাঙ্গালী বুদ্ধির পরিমাণ স্থির করে নিশ্চিন্ত ছিল"।[৬৯]

জলধর সেনের *হিমালয়*-এ আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা পরবর্তী বাঙালি হিমালয় যাত্রীদের ভ্রমণ কাহিনিকে প্রভাবিত করেছিল। এর প্রথমটি হল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করার ভাষা-ভঙ্গিমাটি। প্রায় কাব্যের কাছাকাছি এই ভাষা। "... আমি খানিক বেড়াচ্ছি খানিক বা একখানা পাথরের উপর বসে প্রকৃতির শোভা দেখছি; অস্তমান সূর্যের রশ্মিজাল পর্বতের পাশ দিয়ে শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে বিকীর্ণ হয়ে পড়চে। আমার দৃষ্টি কখনো ধূসর পর্বতের অঙ্গে, কখনো সূর্যোকিরণোদ্ভাসিত জ্যোতির্ময়ী অলকানন্দার উপর"।[৭০] কিম্বা, "সন্ধ্যার খানিক আগে অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণময় কিরণে যখন সঙ্গমস্থল অনুপম শোভা ধারণ কল্লে তখন একবার ইচ্ছে হতে লাগলো যে ছুটে গিয়ে এই মুক্ত প্রকৃতির সুন্দর শোভার মধ্যে ডুবে গিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ মনটাকে ক্ষণিক প্রফুল্ল করে নিয়ে আসি"।[৭১] প্রকৃতিকে এই কাব্যময় ভাষায়

তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে উপস্থাপিত করার ফলে রচনাটির সম্ভাব্য পাঠক-পরিসর বহুগুণ বিস্তৃত হয়ে যায় এবং *হিমালয়* বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

হিমালয়ের দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য সেটি হল রচনাগত দিক থেকে এর 'সেকুলার' মনোভাব। যদিও মৃত্যুশোক থেকে মুক্তি পেতে, মানসিক শান্তির খোঁজে জলধর হিমালয়ের বদরিনাথের দিকে হেঁটে চলেছেন, তবু তিনি মনে করছেন দেবত্বের তুলনায় কবিত্ব বেশি আদরণীয়- "বাজারের পিছনে খানিকটে নীচেই সঙ্গমস্থল, কিন্তু বাজারের পিছনে অল্প একটু নেমেই একেবারে ঠিক সঙ্গমস্থলের মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা খুব নতুন ছোট মন্দির দেখলুম। মন্দিরটি এমন স্থানে নির্মিত যে এখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠা না করে যদি একজন কবিকে প্রতিষ্ঠা করা যেতো, তাহলে ঠিক কাজ করা হতো"।[৭২] আর এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে জলধরের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই রচনাতেই 'বৈদান্তিক' নামক ব্যক্তির সঙ্গে নিজের মানসিকতার পার্থক্য উল্লেখ করতে গিয়ে জলধর তাঁর মনের এই বিশেষ দিকটি প্রকাশ করেছেন- "... হায় মায়াবাদী বৈদান্তিক। তোমার এই মায়াবাদ কি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। তুমি দুঃখ দারিদ্র্য পদদলিত করে তীর্থস্থানে যেতে চাও, দরিদ্র প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে কাশীতে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাও; ভগবানের অজস্র করুণা ও চিরন্তনের মঙ্গলেচ্ছাকে ত্যাগ করে বৈরাগ্যের হৃদয়হীনতাকেই সার পদার্থ বলে মনে কর। সকলে তোমার মতো হলে পৃথিবী এতদিন শ্মশান হতো। অথবা তোমারই বা দোষ কি, আমাদের দেশের অনেক সাধুপুরুষের বৈরাগ্যই তোমার মত। তোমরা পিতামাতার গভীর স্নেহ উপেক্ষা কর, পত্নীর ব্যাকুল প্রেমবন্ধন ছিন্ন কর। সে অতি কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমাদের এই ব্রত সার্থক হতো যদি তোমরা তোমাদের এই ক্ষুদ্র প্রেম প্রসারিত করতে পারতে"।[৭৩] এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আরও একটি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তীর্থভ্রমণ কাহিনির বিশেষ একদিনের ঘটনার বিবরণে-

> হঠাৎ চারিদিকে 'তফাৎ তফাৎ' শব্দ পড়ে গেল। বুঝলাম মহান্ত বাবাজী আসছেন। ... একজন বৃদ্ধা একটি ছোট ছেলের হাত ধরে আরতি দেখতে এসেছিল, মহান্ত বাবাজীর পরিচারকদের ধাক্কায় ছেলেটি দর্শকদের পায়ের তলায় পড়ে গেল। ... তিনি কমলেশ্বরের সেবাইত; তাঁর পথের সম্মুখে দাঁড়ালে এরকম দু-পাঁচটা খুন জখম হওয়া যেন নিতান্তই স্বাভাবিক। মহান্তের এরকম মনোভাব দেখে মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। পুরোহিত রঘুপতির আস্ফালন ও স্পর্ধায় নিরাশ ক্ষুব্ধ গোবিন্দমাণিক্যের মত আমারও মনে হলো- 'এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,/যারা করে বিচরণ তোমার চরণ-/তলে, তারাও শেখেনি কত ক্ষুদ্র তারা।/ তোমার মহিমা হরণ করিয়ে/ আপনার দেহে বহে, এত অহঙ্কার![৭৪]

জলধর সেনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল তিনি *হিমালয়ের* মধ্যে খুব অল্প পরিসরে হলেও তীর্থপথের দুর্গমতাকে তুলে ধরেছেন- "সাঁকো পার হয়ে রাস্তার ভীষণতা বুঝতে পাল্লুম। এ পর্যন্ত অনেক চড়াই উৎরাই দেখেছি, কিন্তু এমন চড়াই উৎরাই আর কোনো দিন নজরে পড়েনি। ... বহু কষ্টে আধ মাইল চড়াই উঠলুম, ওঠা যেই শেষ হলো অমনি আবার উতরাই আরম্ভ। ... আমি কতবার ক্রমাগত সাত আট মাইল চড়াই উঠেছি, কিন্তু কখনও এত কষ্ট হয়নি। ... বুকের হাড় ও পাঁজরাগুলো যেন চড়চড় করে ভেঙ্গে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সর্বনেশে তৃষ্ণা ... গলা শুকনো, যেন কতকাল জল খাওয়া হয়নি; বুকের মধ্যে যেন মরুভূমি সৃষ্টি করে রেখেছে"।[৭৫] *হিমালয়ের* ভূমিকাতে দীনেন্দ্রকুমার রায় বাঙালি লেখকদের কাছ থেকে হিমালয় বিষয়ে যে 'অ্যাডভেঞ্চারে'র আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তা সর্বাংশে পূরণ না হলেও এই রচনায় জলধর তার আভাস দিয়ে গিয়েছেন।

উপরের তিনটি বৈশিষ্ট্য আলাদা করে উল্লেখের কারণ *হিমালয়* প্রকাশের পরে বিশ শতকে যে সকল বাঙালি যাত্রী হিমালয়ে যাচ্ছেন এবং কাহিনি রচনা করছেন তাঁদের রচনায় জলধর সেনের লেখার এই বৈশিষ্ট্যগুলি যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে। এই বইটি প্রায় হিমালয়ের ভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখার একটি সহজ সমীকরণ বা আদর্শ তৈরি করে দিয়েছিল। তাই পরবর্তী সময়ের ভ্রমণকারী লেখকেরা হিমালয়কে যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখে থাকুন, তাঁরা যখন ভ্রমণকাহিনি বা তীর্থভ্রমণ কাহিনি লিখছেন তখন পূর্বপ্রকাশিত *হিমালয়*-এর প্রতিষ্ঠিত প্রকরণকে গ্রহণ করছেন। তাই সেখানে তীর্থ সংক্রান্ত আলোচনা-বিবরণ যেমন থাকছে, তেমনি স্থান করে নিচ্ছে ভ্রমণ অঞ্চলের নানা ধরনের তথ্য কিম্বা হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের বিবরণ।

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ যখন তীর্থভ্রমণে হিমালয়ে যাচ্ছেন এবং কাহিনি রচনা করছেন তখন তিনিও নানা ক্ষেত্রে জলধরের তৈরি করে দেওয়া প্রকরণকেই অনুসরণ করছেন। এছাড়াও ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বীরেশচন্দ্র দাসের *কেদার বদরির পথে*, ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের *চতুর্ধাম ও সপ্তপীর্থ*, ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের রাজেন্দ্রকুমার সেনের *আসাম হইতে বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ*, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের *হিমালয়ের পাঁচ ধাম* প্রভৃতি বইগুলিতেও একই ধরনের রচনারীতির অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদের লেখা *উত্তরাখণ্ড পরিক্রমা* বইটি ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটির সম্পূর্ণ নাম- *উত্তরাখণ্ড পরিক্রমা: অর্থাৎ গঙ্গোত্তরী, কেদার ও বদরীনাথ এবং পশুপতিনাথ প্রভৃতি হিমালয়স্থ সমস্ত তীর্থের বহু চিত্র ও মানচিত্রযুক্ত সম্পূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্ত*।[৭৬] লেখক কাশী থেকে তাঁর হিমালয় যাত্রা শুরু করেছিলেন। বইটির প্রথম অংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে লেখক হিমালয়কে দেখছেন তীর্থক্ষেত্র হিসেবে। কারণ বইয়ের প্রথম দিকে তিনি

‘তীর্থযাত্রা-বিধি’ নামক একটি অংশ রেখেছেন। সেখানে তিনি স্থাবর, জঙ্গম ও মানস— তীর্থের তিন প্রকার ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবং এখানেই তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, ‘দেশভ্রমণ’ ও ‘তীর্থভ্রমণ’ পৃথক দু’টি বিষয়। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তাঁর মতে

> পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাভিমানী নানাজাতির দেশভ্রমণের প্রথা আছে। ... আমাদের তাহা নাই। ... বিশেষত উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ হইলে সে কার্য্যের নামও তদানুসারে ভিন্ন হওয়া উচিত। এ নিমিত্ত আমাদের দেশে তীর্থপর্য্যটনের নাম দেশভ্রমণ নহে।[৭৭]

বইটির এই অংশে লেখক — ‘তীর্থপর্য্যটনের ফল কি?’, ‘তীর্থফললাভের অধিকারী কে?’, ‘কোন সময়ে তীর্থে যাইতে হয়?’ ‘প্রকৃত তীর্থবিধান’ ইত্যাদি প্রসঙ্গও আলোচনা করেছেন।[৭৮] এই সকল প্রসঙ্গের সন্নিবেশ থেকে বোঝা যায় যে, লেখক তাঁর আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে হিমালয়ে তীর্থযাত্রা করছেন এবং সেই যাত্রাকে কেন্দ্র করে তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনা করছেন। বইটির মধ্যেও দেখা যায় কোনো নির্দিষ্ট তীর্থস্থানে কি কি কৃত্য পালন আবশ্যিক লেখক তার নির্দেশ দিয়েছেন-

> বদরীনারায়ণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রপ্রাপ্তি নিমিত্তক একদিন উপবাস করিবে। প্রভাতে গঙ্গাস্নান ও নারদকুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক তপ্তকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। ... পরে যথাশক্তি উপহার লইয়া ভগবানের পাদপদ্ম হইতে কিরীটপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিবে। দর্শনের পরে প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ব্রাহ্মণোদ্দেশে গো, ভূমি, অন্ন, স্বর্ণধাতু ... যাহার যেমন শক্তি দান করিবে”।[৭৯]

এরকমের নির্দেশ বইটি অন্যত্রও পাওয়া যায়- "বদরিকাশ্রমে আগমন করিয়া নিম্নলিখিত পঞ্চতীর্থে স্নান-মার্জনাদি ও পঞ্চশিলা দর্শন পূজনাদি এবং কেদার নামক শিবলিঙ্গের পূজন অবশ্যকর্তব্য"।[৮০]

লক্ষণীয় যে জলধর সেনের *হিমালয়* এর পরবর্তী সময়ে লেখা এই বইটিতে লেখক তীর্থযাত্রা করতে গিয়ে যাত্রাপথের ঘটনা, তীর্থ-অঞ্চলের নানা তথ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে তাঁর লেখাতে তুলে ধরছেন। কাশী থেকে ট্রেনে অযোধ্যা হয়ে হরিদ্বার পৌঁছে সারদাপ্রসাদের হিমালয়ে তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছিল। হরিদ্বার থেকে আবার ট্রেনে করেই তিনি দেরাদুন পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে শুরু তাঁর উত্তরাখণ্ডপরিক্রমা। নিজের রচনার কথন-রীতি হিসেবে সারদাপ্রসাদ 'ডায়েরি' পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন- যেখানে স্থান, তারিখসহ দৈনন্দিন ঘটনা নথিবদ্ধ হচ্ছে- "দেরাদুন, ৩রা বৈশাখ ১৩১৭। প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বেলা ৮টার দেরাদুনের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। এক আনা করিয়া টিকিট হইল। হিমালয়ের প্রান্তদেশ দিয়া আমাদের ট্রেন না-দ্রুত, না-বিলম্বিত মধ্যগতিতে চলিতে লাগিল। গতিপথে অবিলম্বে দুইটী টনেল পাইলাম" ইত্যাদি।[৮১] গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে—

> কেদারনাথ মন্দির পাষাণময়। মন্দিরটী বৃহৎ ও অতি প্রাচীন। মন্দিরের বাহিরে মন্দির সংলগ্ন অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেদারনাথের মোহান্ত রাওলসাহেব ঐ ভগ্ন স্থানগুলির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখভাগে অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি মূর্ত্তি অনেক আছে। মন্দিরের সম্মুখে একটী পাষাণময় বৃহৎ বৃষ আছে।[৮২]

তাছাড়া প্রতিদিনের সাধারণ বা ছোট ঘটনা কিংবা স্থানের বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক— "অদ্য দ্বাদশীর পারণ, সঙ্গে যাহা সংগ্রহ ছিল তদ্দ্বারা পাকের চেষ্টা করা গেল। সঙ্গে দ্রব্যাদি না থাকিলে সেদিনও একাদশী হইত। কেননা দোকান নাই, গ্রামেও কিছু মেলে না। সুখের মধ্যে নিকটে একটি ঝরণা আছে।"[৮৩] রচনাটিতে কখনও কখনও পথের দুর্গমতার বিবরণও উপস্থাপিত হয়েছে—

> কোথাও সঙ্কীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে অতি বিপুল স্থূল স্থূল প্রস্তরময় ভীমকায় পর্ব্বত খাড়া সরলভাবে দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটি-ভীষণ শুম্ভনিশুম্ভদাদি দুর্জয় দানবের ন্যায় ভীমদর্শন হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এমন ভীষণ আকার কোথায় লুকান ছিল? ... কোথাও পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের বিষম বর্দ্ধিতকায় ঐরূপ সঙ্কীর্ণ রাস্তার উপর নিদারুণ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; বোধ হইতেছে এই মুহূর্তে যেন সেই ভীষণ ঘটোৎকচমূর্ত্তি শৃঙ্গসহ সাঙ্ঘাতিক শব্দে আমাদের মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে।[৮৪]

এছাড়াও বইটির শেষের দিকে সারদাপ্রসাদ 'দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা' শিরোনামে একটি অধ্যায় সংযোজিত করেছেন।[৮৫] সেখানে তিনি তাঁর ভ্রমণ-অঞ্চলের নানা বিষয় সম্পর্কে পাঠক এবং ভবিষ্যতের যাত্রীদের অবহিত করেছেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-অঞ্চলের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, পরিধান, সামাজিক ব্যবস্থা, শিল্পবাণিজ্য, রাস্তাঘাটের বিবরণ, বন্যা-দুর্ভিক্ষের সংবাদও দিয়েছেন।

এর পাশাপাশি সারদাপ্রসাদের তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে আছে পথের দৃশ্যের বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিবরণ। যেমন 'ধরাসু ও গঙ্গার দৃশ্য' —

> এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানের নাম ধরাসু। ... এই স্থানে ভাগীরথীর দর্শন কি মনোরম, কি পবিত্র, কি প্রাণারাম। ... তরঙ্গাবলী অব্যবস্থায়, অনপেক্ষায় কি উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যরঙ্গেই অবিরাম ধাবিত হইতেছে! যেন ঐস্থানে শব্দান্তরের অবকাশ নাই! দৃশ্যান্তরের অবসর নাই! এখানে আসিয়া অনিমেষে শুদ্ধ দেখিতে হইবে, দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে।[৮৬]

এমন বিবরণ আমরা এরপরেও পাচ্ছি–

> আর হিমাচলের সৌন্দর্য্য? এর সৌন্দর্য্য অদ্ভুত, অপরিমেয়, অফুরন্ত! এই পর্ব্বতরাজের রাজ্যে প্রবেশ করিলে আর মৃন্ময়ী পৃথিবীর কথা মনে থাকে না। কি অনন্ত বিস্তার বিশাল অবয়ব! আকাশ ইহার উর্দ্ধসীমা, পাতাল ইহার নিম্নপ্রান্ত! পর্ব্বতরাজ নিবিড় বনরাজিরূপে একখানি সুনীলবস্ত্র যেন নিম্ন অঙ্গে পরিধান অরিয়া আছেন। পবন চালিত শ্বেত নীলাদি নানা বর্ণের মেঘখণ্ড এন নানা বর্ণের উত্তরীয় বস্ত্ররূপে ঊর্দ্ধ অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন। আর উত্তমাঙ্গে চিরতুষার ভারের অক্ষয় মুকুট ধারণ করিয়া আছেন।[৮৭]

বইয়ের শুরুতে সারদাপ্রসাদ যদিও তীর্থভ্রমণ এবং দেশভ্রমণকে আলাদা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনাতেই দেখা যাচ্ছে যে এই হিমালয় তাঁর কাছে যতটা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে মান্যতা পেয়েছে ঠিক ততটাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দর্শনীয় স্থান হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রায় একই রকমের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হিমালয়কে দেখেছেন বীরেশচন্দ্র দাস। তাঁর তীর্থভ্রমণ কাহিনি *কেদার-বদরীর পথে* প্রকাশিত হয় ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। এই বইটির 'মুখবন্ধ' অংশে লেখকের বক্তব্য-

> রেল কোম্পানির কৃপায় বাঙ্গালা দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা গয়া কাশীর প্রত্যেক অলিগলির সহিত পরিচিত। কিন্তু কেদারনাথ বা বদরীনাথ এখনও দুর্গম। সুতরাং অনেকেই ইচ্ছা করিলেও সাহস করিয়া এ পথে বাহির হন না। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ৺কেদারনাথ ও ৺বদরীনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলে বন্ধুগণ অনেকেই পথের কথা শুনিতে চাহেন। ... পুজ্যপাদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়... ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ... মহোদয়গণের আগ্রহে তাঁহাদের নিকট এই বিষয় গল্প করি। তাঁহারা গল্প শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া এই বৃত্তান্তটি সাধারণের নিকট প্রচার করিতে বলেন। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ... পুস্তকখানি পড়িয়া যদি কাহারও হৃদয়ে এই পবিত্র তীর্থসকল দর্শনের স্পৃহা বলবতী হয়, অথবা পথের কথা জানিয়া কেহ কোন উপকার প্রাপ্ত হন আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।[৮৮]

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, লেখক নিজে হিমালয়কে তীর্থক্ষেত্র হিসেবেই দেখছেন। অন্যদের মধ্যে হিমালয়ের তীর্থ স্থানগুলির 'দর্শনের স্পৃহা' জাগাতে তিনি এই তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনা করছেন। যদিও বইটিতে দেখা যায় যে তীর্থস্থানের মতো দৃশ্যশোভা দর্শনেও তাঁর সমান আগ্রহ।

এই বইটি অন্যান্য হিমালয়-ভ্রমণ কাহিনির মতো তারিখ অনুযায়ী 'ডায়েরি' আকারে লিখিত হয়নি। এখানে স্থানের নাম ব্যবহার করে অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছে, যেমন— 'কেদার', 'বদরী', 'ফিরিবার পথে' ইত্যাদি। সেই বড় অধ্যায়গুলির মধ্যে ছোট ছোট জায়গার নাম দিয়ে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদ রয়েছে। যেমন 'কেদার' অধ্যায়ের মধ্যে 'হরিদ্বার', 'লছমনঝুলা', 'দেবপ্রয়াগ', 'শ্রীনগর' ইত্যাদি। এই সকল অধ্যায়ে লেখক তীর্থযাত্রা পথের নানা বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সেই বিবরণে যেমন আছে কাণ্ডী, ডাণ্ডি, ঝাঁপান-এর ভাড়ার কথা, তেমনি আছে এই তীর্থযাত্রাতে যাত্রীদের কি কি জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন সে বিষয়ে উপদেশ-

> ... যাহারা পদব্রজে যাইতে চাহেন তাঁহাদের হাতে একগাছি শক্ত লাঠি রাখা আবশ্যক। ... কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই জুতা পরা আবশ্যক। ... শীতোপযোগী গরম বস্ত্র সঙ্গে রাখা উচিত। ... water proof coat ও oil cloth সঙ্গে থাকিলে ভালো হয়"।[৮৯]

শুধু যাত্রার সরঞ্জাম নয়, যাত্রার পদ্ধতি সম্পর্কেও নানা উপদেশ দিয়েছেন লেখক-

> প্রাতে চলিবার পূর্ব্বে সকলেরই কিছু কিছু জলযোগ করিয়া বাহির হওয়া উচিত। ... ক্ষুধা লইয়া চলা উচিত নহে। কেহ কেহ দুধ পান করিয়া বহির্গত হন। দুধ প্রায় সকল চটিতেই পাওয়া যায়। যদি নিজের পক্ষে তৈয়ার করা সম্ভব না হয় চটিওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলে সকালবেলা গরম লুচি পেঁড়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণা পায়, সঙ্গে কিছু মিছরি রাখা বিধেয়, কেবল জলপান করা উচিত নয়।[৯০]

লেখক তাঁর তীর্থপথের নানা স্থান সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জ্ঞাতব্য তথ্য তাঁর লেখাতে উপস্থাপিত করেছেন-

> বদরিনাথ হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ ১৬ মাইল, অলকানন্দা ৫০০০ ফিট নামিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গমস্থল ধবলি গঙ্গা ৩৫ হইতে ৪০ গজ, অলকানন্দা ২৫ হইতে ৩০ গজ। ... সঙ্গমস্থল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৭৪৩ ফিট উচ্চ।[৯১]

এছাড়াও লেখকের নানা মন্তব্য থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়-

> আমরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িলাম। এখানে চোর ডাকাতের কোন ভয় নাই। যেখানকার জিনিস সেখানেই পড়িয়া থাকিবে, কেহই ছুঁইবে না। তবে যাত্রীদের মধ্যে সমতলবাসী যদি কেহ অনুগ্রহ করেন তাহা স্বতন্ত্র।[৯২]

এর বাইরে তিনি যাত্রাপথের দুর্গমতার কথা উল্লেখ করেছেন-

> ভয়ানক চড়াই। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা হইয়াছে। খাড়া পাহাড়ের ঠিক নিম্ন দিয়া গঙ্গা যাইতেছেন, পাহাড়ের গায়ে গাছের লেশমাত্র নাই; একবার পদস্খলন হইলেই সর্ব্বনাশ।[৯৩]

বীরেশচন্দ্র দাসের এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে এর পাশাপাশি আছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বিবরণ। বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে 'কেদার'-এর অন্তর্গত 'হরিদ্বার' অংশে তিনি লিখছেন-

> যে দেবভূমির কথা লোকমুখে শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য কতদিন কতই না ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছি, কালিদাস প্রভৃতি মহা মহা কবিগণের লেখনীপ্রসূত কাব্যসকল যে মনোভূমির মনোহর চিত্র কতবার নয়ন সম্মুখে ধরিয়া হৃদয়ে কতই আনন্দ রস ঢালিয়া দিয়াছে — সেই লোকোত্তর দেবভূমির অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার কত বাসনা মনে জাগাইয়া তুলিয়াছে, আজ পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ পূর্ব্বাপর সাগরাবগাহী দেবতাত্মা সেই নগাধিরাজ বুঝি আমাকে সত্যসত্যই দেখা দিবেন।[৯৪]

অর্থাৎ শুধুমাত্র তীর্থস্থান দর্শন ও পুণ্যলাভের আকঙ্ক্ষা নয়, হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের বাসনা নিয়ে লেখক হিয়ালয়ে যাচ্ছেন। তাঁর লেখাতে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মাঝে মাঝেই উঠে আসতে দেখা যায়-

> ... গঙ্গার জল যেমন স্বচ্ছ, স্রোত তেমনি প্রবল। মধ্যে মধ্যে উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে। উৎক্ষিপ্ত বারিকণা রাশি রাশি ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন মৃদু কুলু কুলু ধ্বনি বজ্র নির্ঘোষে পরিণত হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোমলে কঠোরে, মধুরে-ভীষণে এমন মেশামিশী, এমন কোলাকুলী বুঝি আর কখনো দেখি নাই। উপরে নীলাকাশ, নিম্নে নীল জল, পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে হরিৎ তরুরাজি। মরি মরি কি রঙের খেলা। এই রঙের খেলায় বিভোর হইয়া এই অনন্ত সৌন্দর্য্যে প্রাণমন ভাসাইয়া চলিতেছি।[৯৫]

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা *চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ* বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে। এই বইটি সম্পূর্ণভাবে হিমালয়ের নানা তীর্থে ভ্রমণের কাহিনি নয়। হিমালয় ছাড়াও এখানে দ্বারকা, অযোধ্যা প্রভৃতির বিবরণ আছে। বইটির প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে- 'বদরিকাশ্রমের পথে' এবং 'বদরিকাশ্রম'-এ হিমালয়ে ভ্রমণের কাহিনি পাওয়া যায়।

এই বইটির ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে লেখক দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুজনিত শোক নিবারণের আশাতেই হিমালয়ে তীর্থভ্রমণে যাচ্ছেন—

> সন ১৩২৬ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ আমি বিপত্নীক হইয়া নিরানন্দ গৃহে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম যে দেশভ্রমণ করিলে হৃদয়ের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ উপশমিত হইতে পারে। ...এক্ষণে

> আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব... আমাকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া আমার প্রতি তীর্থভ্রমণের নানা উপদেশ প্রদানপূর্বক পরিশেষে ৺বদরিকাশ্রমে যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। ... ২৯শে বৈশাখ (১৩২৬/১৯১৭) সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীহরি স্মরণপূর্ব্বক বাটী হইতে যাত্রা করিলাম।[৯৬]

আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই বইটি অনেকটাই ডায়েরি ধরনে লেখা। লেখক মাস ও তারিখের উল্লেখ করে দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন-

> ৩১শে বৈশাখ বুধবার- অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা ও বিষ্ণুপদা সংক্রান্তি। পাণ্ডার সহিত তাহার বাসায় উপস্থিত হওয়া গেল। বেলা ৯টার সময় যখন স্নান করিয়া আমার পোর্টম্যাণ্ট খুলিলাম তখন দেখিলাম যে আমার কন্যাদ্বয় উহাতে কিঞ্চিৎ মুগের ডাল, এক বোতল চাটনি ... দিয়েছে। আহারাদি সমাপনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামলাভ করে বেলা প্রায় ২টার সময় পাণ্ডার সহিত এক অশ্বযানে আরোহণ করিয়া হৃষিকেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা হৃষীকেশ পঁহুছিলাম।[৯৭]

নিজের লেখার মধ্যে লেখক ওই অঞ্চলের মানুষদের সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন- "দাণ্ডি বাহকেরা সকলেই পর্ব্বতবাসী। ইহারা অতি বলশালী সরল ও বিশ্বাসী। ইহারা তত চুরি জুয়াচুরি বা শঠতা শিক্ষা করে নাই। সকলে প্রায় গাড়োয়াল রাজ্যের বসতি"।[৯৮] আবার অন্য জায়গায় তিনি লিখছেন- "আমার দাণ্ডী দেখিয়া পাহাড়ী বালক বালিকারা ছুটিয়া আসিল এবং 'শেঠজী পয়সা দিজিয়ে' বলিয়া আমায় সেলাম করিতে লাগিল। তাহাদিগকে এক এক আধলা দান করিতেই তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইল"।[৯৯] লেখক এই অঞ্চলের পাণ্ডাদের আর্থিক অবস্থার সম্পর্কেও তথ্য দিয়েছে- "দেবপ্রয়াগের পাণ্ডারা হিন্দী ও সংস্কৃত বেশ চর্চ্চা করে। তাহাদিগের

মধ্যে ইংরেজী ভাষা কেহই জানে না। পাণ্ডাদের ঘর দ্বারের অবস্থা তেমন ভালো না হইলেও তাহাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে"।[১০০]

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে এই সকল সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঙ্গে তীর্থস্থানের সৌন্দর্য্যের সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে-

> প্রায় ঘণ্টা দুই বারিবর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হইল। আকাশের কোথাও মেঘ নাই। চন্দ্রের আলোকে প্রকৃতি এক অলৌকিক শোভা ধারণ করিল। ছোট ছোট গাছগুলি হইতে মুক্তার ন্যায় বারিবিন্দু ঝরিতেছে, পাহাড়ের গা ব'হে বৃষ্টির জল নীচে পড়িতেছে এবং তাহাতে চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় রজতাভা বাহির হইতেছে। এ দৃশ্য দেখিতে কি চমৎকার![১০১]

এমন ধরনের বিবরণ পরেও পাওয়া যায়-

> এখান হইতে কেদারনাথের পথ স্বর্ণপথ বলিয়া বোধ হয়। পথের কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে গিরিশ্রেণী আপাদমস্তক তুষার বিমণ্ডিত রহিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখি যে প্রত্যক বস্তুই রৌপ্যময় মনোহর শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছে। পথগুলি নিভৃত, উদ্ভিদ ও জীবশূন্য।[১০২]

আসাম থেকে হিমালয় যাত্রা করে সেই ভ্রমণের কাহিনি রচনা করেছিলেন রাজেন্দ্র কুমার সেন। তাঁর সেই রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে *আসাম হইতে বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ* নামে। বইয়ের আখ্যাপত্রে এই লেখকের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য- 'শ্রী রাজেন্দ্র কুমার সেন, বিদ্যাভূষণ, এল.এম.পি, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্কলার (এম.ডি.); ভিষক রত্ন,

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী; মেডিক্যাল অফিসার; বর্দ্ধমান রাজ, কাজলাগড়, মেদিনীপুর'। এই বইটির আগে তিনি যে ইংরাজিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত অপর একটি বইও লিখেছিলেন সেকথাও এই বইয়ের আখ্যাপত্র থেকেই জানা যায় —" 'Recents Advances in the Treatment of Syphilis', 'Tuberculosis — Its Category, Prophycasies and Treatment' and 'Treatise on Influenza' গ্রন্থ প্রণেতা"। সম্ভবত, লেখকের উচ্চতর সামাজিক ও পেশাগত পরিচয়কে এই তীর্থভ্রমণ কাহিনির প্রচারে, জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই বইটিতে মূল তীর্থভ্রমণ কাহিনির আগে একটি 'নিবেদন' অংশ সংযোজিত হয়েছে। সেখানে তিনি রাজেন্দ্রকুমার সেন লিখছেন- " ... শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের (এখন রায় বাহাদুর) 'হিমালয়' পাঠ করিয়া হিমালয় ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে।"[১০৩] কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে লেখক এখানে স্বীকার করেছেন যে তাঁর রচনাতে জলধর সেনের মতো 'ভাষার লালিত্য' নেই। এই না থাকার কারণ হিসেবে তাঁর যুক্তি হল তিনি "সাহিত্য লিখিতে বসেন নাই"।[১০৪] অর্থাৎ তাঁর মতে তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে 'ভাষার লালিত্য' থাকলে তা 'সাহিত্য' হয়ে যায়। বই লেখার ক্ষেত্রে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বইটির 'নিবেদন' অংশেই পাওয়া যায়-

> "... বর্ণশুদ্ধি ভাষাদোষ প্রভৃতি শিশুশিক্ষার কথা না ভাবিয়া যাহাতে ভগবানের চরণে মাথা লুটাইতে পারা যায় তাহার শুধু আভাষ প্রদান" করা। এর পাশাপাশি লেখক এই তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনার উদ্দেশ্য বিষয়ে জানিয়েছেন- "আর চেষ্টা করিয়াছি শাক্ত ও বৈষ্ণব হিন্দুগণ যাহাতে কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণের মাহাত্ম্য প্রচার করেন"।[১০৫]

এই উদ্দেশ্য নিয়ে তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনা করতে গিয়ে লেখক 'নিবেদন' অংশেই 'তীর্থ' শব্দের বুৎপত্তি, হিমালয়ের তীর্থের তালিকা, তীর্থ বিষয়ে মহাভারতের বক্তব্য প্রভৃতি আলোচনা

করেছেন। বইটির সূচিপত্রে 'যাত্রা', 'অযোধ্যা', 'লক্ষ্ণৌ', 'হৃষীকেশ', 'শ্রী শ্রী কেদারনাথ' প্রভৃতি অধ্যায়-নামের উল্লেখ থাকলেও মূল অংশে দেখা যায় অধ্যায়গুলির মধ্যে তারিখ উল্লেখ করে 'ডায়েরি' আকারে লেখা হয়েছে।

লেখক রাজেন্দ্রকুমার সেনের কাছে হিমালয় গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র এবং তিনি মনে করেন এই তীর্থদর্শন প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আচার। তাই নিজের রচনাতে তীর্থভ্রমণের পক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকেন তিনি। তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ)। সেই দিন থেকেই তিনি ডায়েরিতে তারিখ অনুযায়ী নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তবে বইটির 'লক্ষ্ণৌ' অধ্যায়ের আগে তারিখ বিহীন 'তীর্থ পর্য্যটনের উদ্দেশ্য ও লাভ' শিরোনামের একটি অংশ আছে। এখানে তীর্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। তীর্থ বিষয়ে হিন্দুধর্মের নানা শাস্ত্রের মূল ধারণাগুলি উল্লেখ করে তিনি লিখছেন-

> যে পুণ্যক্ষেত্রে পাপমুক্তির জন্য মানবেরা গমন করে তাহাই তীর্থ। ... যেমন স্থানে বর্ত্তমান তীর্থস্থানগুলি বিদ্যমান তথাকার জল হাওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কত সুন্দর তাহা লিখিয়ে শেষ করা যায় না। আধুনিক নব্যশিক্ষার ফলে কি এমন সম্ভবে? কখনই না। তীর্থপর্য্যটন দ্বারা মনের দৃঢ়তা, স্বাবলম্বন শিক্ষা, ভগবানে আত্মসমর্পণ, সাধুসঙ্গ, সদগুরুলাভ, ভগবানে ভক্তি, নানা প্রকার অভিজ্ঞতা, পুণ্য, বৈরাগ্যভাব এবং অবশেষে মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে।[১০৬]

হিমালয়ের তীর্থভ্রমণ বিষয়ে পাঠকদের উৎসাহ দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রকুমার সেনের রচনায় যাত্রাপথের প্রায় প্রতিটি স্থান, চটি সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। লেখক তাঁর রচনাতে নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস, ভৌগোলিক তথ্য, ভ্রমণের কালের নিত্যদিনের নানা

ঘটনা, কত দাম দিয়ে কি কিনছেন, কত টাকা দিয়ে কুলি ভাড়া করছেন সেই সকল তথ্যও দিয়েছেন। আর এর পাশাপাশি আছে 'কয়েকটী আবশ্যকীয় কথা' নামের একটি অধ্যায়। যেখানে লেখক তীর্থযাত্রীদের যাত্রা সম্পর্কে সুবিধাজনক পরামর্শ দিচ্ছেন-

> পাহাড়ের আহার্য দ্রব্যের মধ্যে আটা, চাউল, ডাইল, লবণ, মরিচ, ঘৃত, তৈল, সকল চটিতেই পাওয়া যায়। মশলার গুঁড়ো সঙ্গে থাকা ভাল, তাহাতে বিস্তর সুবিধা হয়। ... বেসন সঙ্গে থাকা দরকার। ... পাহাড়ের রাস্তা চলিতে সূর্য্যের উত্তাপ এত প্রবল বোধ হয় যে ১০টার পর হইতে বিকালে ৩টা কি ৪টা পর্য্যন্ত পথচলা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। ... সঙ্গে পাণ্ডা অথবা তাহার গোমস্তা থাকিলে তাহাদের দিয়া রন্ধন কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। ... কাণ্ডীওয়ালা বাসনপত্র পরিষ্কার করিয়া দেয়, তজ্জন্য তাহাকে অতিরিক্ত পুরষ্কার দিতে হয়। ... নোট প্রধান প্রধান স্থানে ভাঙান যায়।[১০৭]

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের *হিমালয়ের পাঁচ ধাম* এবং ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গঙ্গাগোবিন্দ বসাকের *কেদার বদ্রী ভ্রমণ* বইটিতেও আগের আলোচিত রচনাগুলির মতো একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হিমালয়কে দেখা হচ্ছে। আদতে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে হিমালয়কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনার একটি 'প্যাটার্ন' বা বিন্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখকেরা সেই বিন্যাসের কাছাকছি থাকার চেষ্টা করেছেন। হরিদ্বার থেকে হিমালয়যাত্রা শুরু করে লছমনঝুলা, কাণ্ডি-ডাণ্ডির অনুপুঙ্খ বিবরণ, কেদার বা বদরির রাস্তায় প্রত্যেক ছোট-বড় চটির তালিকা ও সেখানকার সুবিধা-অসুবিধার বিবরণ, মাঝেমাঝে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কাব্যিক বর্ণনা, স্থানের ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক স্বল্প তথ্য প্রদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এই সময়ের হিমালয়ের তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি প্রায়

পরস্পর ভেদশূন্য, গতানুগতিক রকমের হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত একারণেই ১৯৩৩ সালের *মহাপ্রস্থানের পথে* বইটিতে হিমালয়কে অন্যভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। সেখানে হিমালয়ের তীর্থ, প্রকৃতি, ইতিহাস, যাত্রাপথের দুর্গমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি একটি কাহিনির প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে। বহু চরিত্রের সমাবেশ এবং ক্রমপরিণতিতে হিমালয় উপন্যাসের পশ্চাৎপট হিসেবে উঠে এসেছে।

তবে হিমালয়কে কেন্দ্র লেখা বিশ শতকের বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল দ্বিজেন্দ্রলাল বসুর *গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী।* এই বইটি অন্য তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির থেকে কিছুটা আলাদা ধরনের।

বইটির ভূমিকা অংশে দ্বিজেন্দ্রলাল বসু লিখছেন-

> ইংরাজী ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে আমি কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয়ের সহিত গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী বেড়াইয়া আসিয়া ভাবিয়া ছিলাম যেন কোন অদ্ভুৎ কাজ করিয়াছি। ... বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী ভ্রমণের একটি বিবরণ লিখিতে বলিয়াছিলেন। আমারও মনে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর পথে কি দেখিয়াছি তাহার একটি বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা সেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই পথে ভ্রমণকালে আমি দৈনিক ঘটনা একটি ডায়ারীতে লিখিয়াছিলাম। এই ডায়ারী অবলম্বন করিয়া বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই এই বিবরণ লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, উত্তরকাশী প্রভৃতি হিন্দুদিগের কতকগুলি প্রধান তীর্থস্থান। এই সকল স্থানের বিবরণ ও তথায় যাইবার উপায় বাঙ্গালা দেশের অতি অল্প লোকই

> জানেন। এই সকল তীর্থস্থান হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে হওয়ায় তথাকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম ও জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।[১০৮]

অর্থাৎ লেখক মনে করছেন হিমালয়ের হিন্দু ধর্মের তীর্থস্থানগুলি তীর্থ হিসেবে যতটা দর্শনীয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্যও ততটাই আকর্ষণীয়। তাই এই স্থানগুলিতে যাওয়ার সহায়ক হিসেবে তিনি তাঁর তীর্থভ্রমণ কাহিনিকে যাত্রীদের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। আরও একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে লেখক ভূমিকা অংশেই পাহাড়ে 'বিলাসী ভ্রমণ' কে নিন্দা করেছেন এবং হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলিকে সেই বিলাসী ভ্রমণের স্থান নয় বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কথায়-

> পাহাড়ে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্বলন্ত আদর্শ দেখিতে যান অথবা পাশ্চাত্য বিলাসের মদিরায় আকৃষ্ট হন এসকল স্থান তাঁহাদের আকর্ষণ করিবে কি না জানি না; তবে যাঁহারা পাহাড়ের পর পাহাড়ের গম্ভীর ও নগ্ন সৌন্দর্যে মগ্ন হন ... এই সকল স্থান দেখিয়া মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারেন।[১০৯]

অর্থাৎ হিমালয়ের অকৃত্রিম প্রাকৃতিক শোভা লেখকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, হিমালয়স্থিত 'হিন্দুদিগের কতকগুলি প্রধান তীর্থস্থানে' গিয়ে 'পাহাড়ের গম্ভীর ও নগ্ন সৌন্দর্য্যে মগ্ন' হতে লেখক যাত্রার যে জমকালো পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাকে অভিযানের সমগোত্রীয় ভাবা যেতে পারে। আর এখানেই দ্বিজেন্দ্রলাল বসুর হিমালয়কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনি পূর্ববর্তী রচনাগুলির থেকে আলাদা হয়ে যায়। তীর্থভ্রমণের কথা বললেও হিমালয় লেখকের কাছে হয়ে উঠেছে অভিযানের ক্ষেত্র।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে লেখক বেশ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গঙ্গোত্রী যাওয়া স্থির করেন এবং অভিযানে যাওয়ার মতো রীতিমতো 'অনুসন্ধান' করে বেশ কয়েকটি বই এবং ম্যাপ এর সাহায্যে তাঁরা তাঁদের যাত্রাপথ স্থির করেনে। লেখক মুসৌরি হয়ে গঙ্গোত্রী গিয়েছিলেন। এই যাত্রাপথে হাওড়া স্টেশনের ট্রেনের কামরা, সহযাত্রীদের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে শুরু বইটি। এটি সাল-তারিখ উল্লেখ করে ডায়েরি ধরনের রচনা। এখানে লেখক যাত্রীদের জন্য প্রায় সকল স্থানের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে গিয়েছেন-

> ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ - ডেরাডুন হইতে মুসৌরী যাইতে হইলে পর্ব্বতের তলস্থ রাজপুর নামক জায়গা হইয়া যাইতে হয়। ... ডেরাডুন হইতে রাজপুর প্রায় ৭ মাইল। এই ৭ মাইল লম্বা এক অতি প্রশস্ত ও সুন্দর রাস্তা আছে। ... রাজপুরে ৫/৬টি হোটেল আছে। সেই সব হোটেল হইতেই মুসুরী যাইবার কুলী ডাণ্ডি ইত্যাদি সকল জিনিসেরই বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।[১১০]

বইটিতে লেখক তাঁর যাত্রার দৈনন্দিন ঘটনাবলীর অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন। যেমন-

> ১০ অক্টোবর ১৯১৪- আজ সকালে উঠিয়া দেখিয় আকাশ পরিষ্কার হইয়া রৌদ্র উঠিয়াছে। শীঘ্রই আমরা যাইবার আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। সঙ্গে ১৮ জন কুলী লইয়া বাকি কুলী এখানেই রাখিয়া যাওয়া স্থির হইল। ... আমাদের মোটের জন্য ১০ জন কুলী ও সত্যেন ও ফণীর জন্য ৮ জন কুলি চলিল। কিছু দড়ীও সঙ্গে লওয়া হইল। আমরা চা পান করিয়া বেলা ৮টার সময় রওনা হইলাম।[১১১]

এই দৈনন্দিন বিবরণে যাত্রাপথের দুর্গমতার বিবরণও স্থান পেয়েছে-

> ... এই সকল স্থানে খাদের দিকে না চাহিয়া পর্ব্বতগাত্র ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিলাম। ... প্রত্যেক পদটি ফেলিবার আগে দেখিয়া ফেলিতে হইত,

> তাহা না হইলেই প্রস্তরখণ্ডে পা লাগিয়া কিম্বা নিম্নস্থানে পা পড়িয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এবং তথায় পড়িলে খাদে পড়াও বিশেষ আশ্চর্য্য নয়।...।[১১২]

স্থান পেয়েছে কুলিদের নিয়ে লেখক ও তাঁর দলের নানান তর্ক-বিবাদ। অথচ হিমালয়ের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা লেখক বইটির ভূমিকাতে উল্লেখ করেছিলেন বইয়ের মধ্যে তার কোনো বিবরণ নেই। কখনও অল্প কথাতে সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছে মাত্র- "এই পুল দিয়া গঙ্গা পার হইয়া টিহরী সহরে ঢুকিতে হয়। কলকাতা ছাড়িবার পর গঙ্গার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। এখানে কিন্ত গঙ্গার অন্যমূর্ত্তি। কবি হইলে সুবিধামতো গঙ্গার বর্ণনা করিতাম। সে যা হোক এখন ছোট খাট একটা উপমা না দিয়া ছাড়িতেছি না। গঙ্গা যেন এ স্থলে তরুণী, এখনও বালসুলভ চাপল্য রহিয়াছে তাই যেন লঘু পদবেগে দৌড়িয়া যাইতেছে, ..."।[১১৩] বরং দ্বিজেন্দ্রলাল বসুর এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে প্রায় দেখা যায় হিমালয়ে অভিযানের আয়োজন। বইটির প্রথম দিকেই লেখকের দেওয়া ভ্রমণের আয়োজনের বিবরণে তা স্পষ্ট উঠে আসে-

> এই ২৯ জন কুলি ছাড়া শিকারী, টাণ্ডেল, ও 'বয়'কে লইয়া ৩২ জন লোক ও আমরা ৫ জন পর্য্যটক মোট ৩৭ জন। যেন ছোট খাট একটি 'পোলার এক্সপিডিসানে' যাইতেছি বলিয়া বোধ হইল।"[১১৪] লেখক তাঁদের দলের লোকেদের যে বিবরণ হাজির করেছেন সেখানেও অভিযাত্রীর ছবিটি লক্ষ করা যেতে পারে- "পরিধানে গরম 'হাফ প্যাণ্ট', গায়ে ফ্লানেল সার্ট, পায়ে 'ফক্সের পট্টি' ও মোটা শিকারী বুট, তলা প্রায় অর্ধ ইঞ্চি মোটা তার উপর লোহার স্ক্রু লাগানো, মাথায় সোলার হ্যাট, এক কাঁধ হইতে জলের বোতল অপর কাঁধে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, হস্তে পাহাড়ী লাঠি ও ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা।[১১৫]

সিদ্ধান্ত :

বাঙালির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে হিমালয়ের অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ ও বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি এই হিমালয়কে কীভাবে গ্রহণ করেছেন তার অভিজ্ঞান ধরা রয়েছে এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে। ভ্রামণিকেরা তাঁদের অবস্থান অনুযায়ী কখনও তীর্থক্ষেত্র, কখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জগৎ হিসেবে দেখেছেন হিমালয়কে। কখনও নিজের পরিচিতির থেকে ভিন্ন হিমালয়ের জনজীবন তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার হিমালয়কে অভিযানের ক্ষেত্র হিসেবেও দেখতে চেয়েছেন কেউ কেউ। বিশ শতকের শুরুতে দেখা যায় হিমালয়কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সমন্বিত একটি প্রকরণ গড়ে উঠেছে। সেই গতানুগতিকতার ছক ভেঙে হিমালয় তীর্থভ্রমণ কাহিনির ক্ষেত্রের বদলে ভ্রমণ-উপন্যাসের পশ্চাৎপট হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১। Chaudhuri Supriya, *Indian Travel Writing*, Das Nandini and Youngs Tim Edited, *The Cambridge Hisory of Travel Writing*, Cambridge University Press, 2019, p. 178

২। লাহিড়ী রণবীর, *বাঙালি ভদ্রলোকের হিমালয় দর্শন*, ভাষাবন্ধন শারদীয়া, ২০০৭

৩। Banerjee Sandeep, Basu Subho, *Secularizing the sacred, Imagining the Nation-Space: The Himalaya in Bengali travelogues 1856-1901*, Modern Asian Studies, Vol. 49, Part 3, Cambridge University Press, 2015

৪। Arya Samarendra Narayan, *History of Pilgrimage in Ancient India*, New Delhi, Munshiram Mahoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2004, p. 25

৫। Ibid, p. 71

৬। Ibid, p. 79

৭। Ibid, p. 69

৮। Mukherjee Suman, *Tourism, Leisure and Recreation in Nineteenth Century Bengal: A Socio-Cultural Study*, Unpublished Ph.D thesis, BU, 2017, p. 138

৯। Ibid, p. 138

১০। Bray John, *Krishnakanta Basu, Rammohan Roy and Early 19th Century British contacts with Bhutan and Tibet*, The Tibet Journal, Vol.34/35, No.3/2, Autumn 2009-Summer 2010

১১। Deb Arabinda, *Tibet and Bengal: A Study -in Trade Policy and Trade Pattern (1775-1875)*, himalaya.socanth,cam.ac.uk

১২। Pal Rabin, *The Himalayan Travels of the Bengalis*, Somdatta Mondal Edited, *The Indian Travel Narratives*, Jaipur, Rawat Publications, 2010, p. 156

১৩। সর্বাধিকারী যদুনাথ, *তীর্থভ্রমণ,* বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২, পৃ. ৪

১৪। বসু নগেন্দ্রনাথ, *মুখবন্ধ,* সর্বাধিকারী যদুনাথ, *তীর্থভ্রমণ,* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২

১৫। ওই

১৬। ওই

১৭। সর্বাধিকারী যদুনাথ,*তীর্থভ্রমণ,* বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২ পৃ. ২৩৯

১৮। ওই, পৃ. ২৪০

১৯। ওই, পৃ. ২২২

২০। ওই, পৃ. ২৪৯

২১। ওই, পৃ. ২২৫

২২। ওই, পৃ. ২৩২

২৩। ওই, পৃ. ২৩৬

২৪। ওই, পৃ. ২২৭

২৫। ওই, পৃ. ২১৯

২৬। ওই, পৃ. ২২৬

২৭। ওই, পৃ. ২২৯

২৮। ওই, পৃ. ২৩৬

২৯। বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, *ভূমিকা,* সর্বাধিকারী যদুনাথ, *তীর্থভ্রমণ,* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২

৩০। মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ৯৩

৩১। চক্রবর্তী সতীশচন্দ্র সম্পাদিত, *শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯২৭, পৃ. ২২৮

৩২। ওই, পৃ.২৪০

৩৩। ওই, পৃ.২৫৮

৩৪। ওই, পৃ.২৫৯

৩৫। ওই, পৃ.২৫৯

৩৬। ওই, পৃ.২৫৬

৩৭। ওই, পৃ.২৫৬

৩৮। ওই, পৃ.২৫৬

৩৯। ওই, পৃ. ২৬৩

৪০। Sen Simonti, *Emergence of Secular Travel in Bengali Cultural Universe: Some Passing Thoughts*, Rupkatha Journal of Interdiciplinary Studies in Humanities, Themed Issue 'India and Travel Narratives', Vol. 12 No 3, 2020

৪১। Ibid.

৪২। মজুমদার লীলা, *স্বামী রামানন্দ ভারতী*, স্বামী রামানন্দ ভারতী, *হিমারণ্য*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৭

৪৩। স্বামী রামানন্দ ভারতী, *হিমারণ্য*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৭, পৃ. ১৮

৪৪। ওই, পৃ. ১৯-২০

৪৫। ওই, পৃ. ১৭

৪৬। ওই, পৃ. ২০

৪৭। ওই, পৃ. ৩৮

৪৮। ওই, পৃ. ৭৬

৪৯। ওই, পৃ. ২৩

৫০। ওই, পৃ. ৩০

৫১। Banerjee Dipankar, *Brahmo Samaj and North-East India*, New Delhi, Anamika Publishers and Distributors (P) Ltd., 2006, p. 115

৫২। ঘোষ বারিদবরণ, *সম্পাদকীয় নেপথ্যলোক*, সেন জলধর, *হিমালয়*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৩

৫৩। ওই

৫৪। ওই

৫৫। ওই

৫৬। ওই

৫৭। রায় দীনেন্দ্রকুমার, *ভূমিকা*, সেন জলধর, *হিমালয়*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৩

৫৮। ওই

৫৯। ওই

৬০। মিশ্র সুবিমল, *ভূমিকা*, সেন জলধর, *হিমালয় সমগ্র*, কলকাতা, দে' বুক স্টোর, ২০১৩

৬১। সেন জলধর, *হিমালয়*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২০, পৃ. ২১

৬২। ওই, পৃ. ১৫

৬৩। ওই, পৃ. ৫৩

৬৪। লাহিড়ী রণবীর, *বাঙালি ভদ্রলোকের হিমালয় দর্শন*, শারদীয়া ভাষাবন্ধন, ২০০৭

৬৫। ওই

৬৬। জলধর সেন, *হিমালয়*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ২৮

৬৭। ওই, পৃ. ১০৭

৬৮। ওই, পৃ. ২৩

৬৯। ওই, পৃ. ৫

৭০। ওই, পৃ. ২৩

৭১। ওই, পৃ. ৩৯-৪০

৭২। ওই, পৃ. ৮১

৭৩। ওই, পৃ. ৪৬

৭৪। ওই, পৃ. ৩৩

৭৫। ওই, পৃ. ৮৮

৭৬। বিদ্যাবিনোদ সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ, *উত্তরাখণ্ড পরিক্রমা*, কলিকাতা, সুধাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রকাশিত, ১৩১৯

৭৭। ওই, পৃ. ৩

৭৮। ওই, পৃ.৭

৭৯। ওই, পৃ.২২১

৮০। ওই, পৃ.২২২

৮১। ওই, পৃ. ২১

৮২। ওই, পৃ. ১৬৮

৮৩। ওই, পৃ. ৩৮

৮৪। ওই, পৃ. ৪১

৮৫। ওই, পৃ. ৩০৮

৮৬। ওই, পৃ. ৬৮

৮৭। ওই, পৃ.২৯৬

৮৮। দাস বীরেশচন্দ্র, *মুখবন্ধ, কেদার-বদরীর* পথে, কলিকাতা, এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৩২৮

৮৯। ওই, পৃ. ১৯

৯০। ওই, পৃ. ২৯

৯১। ওই, পৃ. ৩৭

৯২। ওই, পৃ. ৩৮

৯৩। ওই, পৃ. ৩০

৯৪। ওই, পৃ. ১

৯৫। ওই, পৃ. ২১

৯৬। মুখোপাধ্যায় দুর্গাচরণ, *চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ,* কলিকাতা, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩৩১, পৃ. ২

৯৭। ওই, পৃ. ৪

৯৮। ওই, পৃ. ৬

৯৯। ওই, পৃ. ১২

১০০। ওই, পৃ. ১৫

১০১। ওই, পৃ. ১৬

১০২। ওই, পৃ. ৪৭

১০৩। সেন রাজেন্দ্রকুমার, *নিবেদন, আসাম হইতে বদ্রিকাশ্রম পরিভ্রমণ*, কলিকাতা, এস.কে. লাহিড়ী এন্ড কোং, ১৩৩২

১০৪। ওই

১০৫। ওই

১০৬। ওই, পৃ. ১১

১০৭। ওই, পৃ. ৭৬

১০৮। বসু দ্বিজেন্দ্রলাল, *ভূমিকা, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী*, কলিকাতা, এস. বি চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩৩০

১০৯। ওই

১১০। ওই, পৃ. ১৪

১১১। ওই, পৃ. ১৫২

১১২। ওই, পৃ. ১৫৫

১১৩। ওই, পৃ. ৬৫

১১৪। ওই, পৃ. ২৮

১১৫। ওই, পৃ. ২৯

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ বিশ্লেষণ

বাংলার বাইরে তীর্থ করতে যাওয়া এবং সেই তীর্থভ্রমণকে কেন্দ্র করে কাহিনি লেখার উৎসাহ বা প্রবণতা উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। অথচ সেই তুলনায় বাংলার ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত তীর্থগুলির ভ্রমণকে কেন্দ্র করে তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনার দৃষ্টান্ত সংখ্যায় অনেক কম। এর পিছনে নির্দিষ্ট কতকগুলি কারণ কাজ করে গিয়েছে।

বাংলা তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনির স্বল্পতার কারণ

প্রথমত মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে কোনো তীর্থে যে কোনো যাত্রীর ভ্রমণ থেকেই তীর্থভ্রমণ কাহিনি গড়ে ওঠে না। সংশ্লিষ্ট তীর্থটি 'সাধারণ' না হয়ে পৌরাণিক ঐতিহ্য বা মহিমায় 'বিশেষ' হলে— অর্থাৎ পুণ্য অর্জন বা তীর্থফলের পরিপ্রেক্ষিতে সেই তীর্থটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে— তবেই তীর্থযাত্রী তাঁর যাত্রাকে শ্লাঘার বিষয় বা গৌরবের বিষয় বলে মনে করেন এবং তাকে উপজীব্য করে কাহিনি রচনা ও প্রচারে আগ্রহী হয়ে থাকেন। এর উদাহরণ হিসেবে কাশীকেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়ত কোনো তীর্থের যাত্রাপথে যদি কৃচ্ছ্রসাধন, অনিশ্চয়তা, দুর্গমতা বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে সেই তীর্থযাত্রার গৌরবকে কাহিনি আকারে লিখে প্রকাশ করার বাড়তি উৎসাহ তৈরি হয়। কারণ এক্ষেত্রে যাত্রীর মনে একধরনের দুঃসাধ্য সাধনের গরিমা সক্রিয়া থাকে। যেমন, কেদার বা বদরি-কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি। তৃতীয়ত যে তীর্থগুলির ভৌগোলিক অবস্থান প্রাকৃতিক শোভা বা বৈচিত্র্যের কারণে বিশেষ উপভোগ্য, সেই তীর্থে ভ্রমণের আকর্ষণ এবং তাকে কেন্দ্র করে বেশি সংখ্যায় কাহিনি লেখা হয়। চতুর্থত কোনো তীর্থস্থানের সামাজিক কাঠামো বা জীবনযাত্রা পরিচিত জগতের বাইরের হলে লেখক সেই 'অপর' জগৎটিকে তুলে ধরতে তীর্থভ্রমণ কাহিনি লিখে থাকেন। দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থ বা হিমালয়ের অধিকাংশ তীর্থস্থান কেন্দ্র করে এই ধরনের ভ্রমণ

কাহিনি গড়ে উঠেছে। তবে শুধু তীর্থস্থান নয়, তীর্থযাত্রীর শ্রেণিগত অবস্থানও তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু ভ্রমণ কাহিনি রচনা 'বই পড়া-বই লেখা' সংস্কৃতির অন্তর্গত, তাই অধিকাংশ সময়ে অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে অগ্রবর্তী তীর্থযাত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত তীর্থস্থানগুলির ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি তৈরি হতে দেখা যায়।

বাংলার ভৌগোলিক সীমার ভিতরে যে তীর্থস্থানগুলি আছে সেগুলির অধিকাংশই উপরের আলোচিত শর্তের বাইরের। কারণ বহির্বাংলার তুলনায় বাংলার তীর্থগুলির পৌরাণিক মহিমা কম। তাছাড়াও কয়েকটি মাত্র বাদ দিলে বাংলার অধিকাংশ তীর্থস্থান তীর্থযাত্রীদের বাসভূমি থেকে খুব দূরবর্তী নয়। যাত্রাপথের দিক থেকেও সেগুলি বাংলার বাইরের তীর্থগুলির তুলনায় যথেষ্ট সুগম। এই তীর্থগুলি প্রতিবেশ, সমাজনীতি বা জীবনযাত্রার দিক থেকেও নতুন বা কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এছাড়াও অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রবর্তী তীর্থযাত্রীদের নির্বাচিত তীর্থের তালিকায় অধিকাংশ সময় বাংলার তীর্থগুলি 'সাধারণ' বলে কম গুরুত্ব পেয়েছে। এই সকল কারণে বাংলার তীর্থগুলি সাধারণ বাঙালি তীর্থযাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হলেও, এগুলির ভ্রমণকে কেন্দ্র করে ভ্রমণকাহিনি বেশি সংখ্যায় তৈরি হয়নি।

স্বল্প সংখ্যায় রচিত বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়- ক) বিশ শতকের প্রথম দশকে রচিত হতে থাকা বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলিতে বাংলার ভৌগোলিক ক্ষেত্রকে নানা তীর্থের স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্যমণ্ডিত ও গৌরবমণ্ডিত করে দেখানোর প্রচেষ্টা হয়েছে। খ) বিস্মৃতপ্রায় বা কম প্রচারিত তীর্থকে প্রচারের আলোকে আনতে অথবা জনপ্রিয় তীর্থগুলি সম্পর্কে যাত্রীদের যথাযথ ধারণা তৈরি করতে বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলিকে উপায় হিসেবে ব্যবহার

করা হয়েছে। গ) বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক রচনায় পুরুষ লেখক এবং মহিলা লেখকদের রচনার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রকাশ

তীর্থস্থান ব্যতিরেকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও সেই সংক্রান্ত ভ্রমণ কাহিনি রচনার উদাহরণ উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই লক্ষ করা যায়। ১২৬১ বঙ্গাব্দের (১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) অগ্রহায়ণ মাস থেকে দীর্ঘ দিন পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণ করেন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। তিনি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনি থেকে বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলের নানা বিষয় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়-

> ... সম্প্রতি আমি কলিকাতা নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৌকাযোগে জলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজসাহী উপস্থিত হইয়াছি। ... এবারকার অতি বৃষ্টিতে পদ্মা অত্যন্ত প্রবলা হওয়াতে অনেকের ঘর, বাটী, পথ, ঘাট ও স্থল সকল জলে প্লাবিত হইয়া ছিল, স্থানে স্থানে অদ্যাপি সে জলের শেষ হয় নাই।...।[১]

এই সময়ে তিনি ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বরিশাল ইত্যাদি অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লেখাতে ওই সকল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বন্দর, কলেজ, স্কুল, বাণিজ্য, শিল্প, উৎসব, জলবায়ু, নদ-নদী, বাসিন্দাদের পরিচিতি প্রভৃতি উঠে এসেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথা লিখতে গিয়ে লেখক সেখানকার তীর্থের উল্লেখও করেছেন- "তীর্থ- চন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ, আদিনাথ, পাতাল, দ্বাদশশিলা, জটাশঙ্কর ... সূর্য্যকুণ্ড, কুমারীকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড প্রভৃতি অনেক তীর্থ এই জিলার মধ্যে আছে"।[২]

উনিশ শতকের শেষদিকেও বাংলার ভৌগোলিক সীমার অন্তর্বর্তী বা নিকটবর্তী কি 'তীর্থস্থান' নয়- এমন জায়গাকে কেন্দ্র করে ভ্রমণকাহিনি রচনার উদাহরণ পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় 'প্র. না. ব.' ছদ্মনামে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *পালামৌ*।[৩] ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'সুরভি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রাজনারায়ণ বসুর ভ্রমণ কাহিনি *চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশ ও গৌড় ভ্রমণ*। এটি পরে তাঁর আত্মজীবনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে বাংলার নানা অঞ্চলের কথা উঠে এসেছে-

> ১৮৪৬ সালের পূজার সময় দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমি উলুবেড়িয়ার নদী ও দামোদর দিয়া নৌকাযোগে বর্দ্ধমানে যাই। ... ১৮৪৭ সালের পূজার সময় আমরা পুনর্ব্বার ভ্রমণে বাহির হই। ... ইংরাজী ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্র বাবু ও আমি আসাম প্রদেশ দেখিবার জন্য Captain Hickley সাহাবের নেতৃত্বের অধীন যমুনা নামক ষ্টীমারে আরোহণ করি। ... আমরা গঙ্গাসাগর তৎপর বড় সুন্দর বন দিয়া আসামাভিমুখে গমন করি। ... আমরা ষ্টীমারের উপরিভাগ হইতে দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিতাম ওপারে হরিণ চরিতেছে, ব্যাঘ্রের ডাক এক রাত্রে শুনা গিয়াছিল।...।[৪]

আবার, ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের (১২৯৫ বঙ্গাব্দ) বৈশাখ থেকে 'ভারতী' পত্রিকাতে স্বর্ণকুমারী দেবীর *দারজিলিং পত্র* ভ্রমণকাহিনিটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে।[৫] ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে (১২৯৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয় রসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। এই রচনায় উড়িষ্যার পাশাপাশি মেদিনীপুর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়-

> কলিকাতা হইতে বজবজ হইয়া উলুবেড়ে ও মহিশরেখা অতিক্রম পূর্ব্বক রূপনারায়ণ নদের তীরে উপস্থিত হইলাম। রূপনারায়ণের উত্তর পার হুগলী জেলার অন্তর্গত, দক্ষিণ পার মেদিনীপুর জেলার যে স্থানে পার

> হইলাম ইহাকে কোলার ঘাট কহে। ... পারঘাট বলিয়া এ স্থানটী উল্লেখের যোগ্য, নচেৎ এস্থলের বর্ণনার বিষয় কিছুই নাই।[৬]

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে, "ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতসভার সহসম্পাদক" তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় একমাসের জন্য দার্জিলিং গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বন্ধু হরিনাথ চক্রবর্তীকে চিঠিতে লিখে পাঠান। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সেটি কলকাতা থেকে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এখানে দার্জিলিং বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন তিনি দার্জিলিং এর বাজার সম্পর্কে জানাচ্ছেন-

> ১৬ই জুন রবিবার। - এখানে রবিবারে হাট হয়। সাহেব, মেম, নগরবাসী ভদ্রাভদ্র, সকল শ্রেণীর লোকই হাটে গিয়া এক সপ্তাহের উপযোগী আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। আমিও মহাজন- প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলাম। বেলা ৭টার সময়ে হাটে গমন করিলাম। হাটটী মিউনিসিপ্যালিটীর। একটী বড় ঘর আছে, তথায় নানা রকমের মাংস ও শাক-সবজী বিক্রয় হয়।[৭]

লক্ষণীয় কালীঘাট, গঙ্গাসাগর বা তারকেশ্বরের মতো জনপ্রিয় তীর্থস্থানগুলিতে যাত্রীদের প্রবল উৎসাহে যাতায়াত থাকলেও সরাসরি তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে স্থানগুলির উল্লেখ পেতে অপেক্ষা করতে হয় উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। অবশ্য, এই জায়গাগুলি তীর্থের মাহাত্ম্যের কারণে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বাঙালির চর্চায় থেকেছে। যেমন- গঙ্গাসাগর তীর্থটি সন্তান-বিসর্জন প্রথা, তার বিরোধিতায় উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগ এবং সেই উদ্যোগের অনুসরণে বৃটিশ সরকারের পদক্ষেপ- ইতাদি কারণে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। এ বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় উইলিয়ম কেরীর জীবনীতে-

> On the return of Marquis Wellesley to Calcutta from the Tipoo war, and his appointment to the college of Fort William, Carey felt that his time had come to prevent the murder of the innocents all over India in the three forms of female infanticide, voluntary drowning and widow-burning or burning alive. … he (Carey) prepared three memorials to the Government on each of these crimes. … At the tiger-haunted spot shivering in the cold of winter solstice, every year multitude of Hindoos, chiefly wives with children and widows with heavy hearts, assembled to wash away their sins- to sacrifice the fruit of their body for the sin of their soul. … The result of Carey's memorial was the publication of the Regulation for preventing the sacrifice of children at Sagar and other places on the Ganges.[৮]

একইরকম ভাবে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ জনপ্রিয় তীর্থ তারকেশ্বর বাড়তি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এলোকেশী হত্যা মামলার কারণে।

বাংলার তীর্থের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি বিষয়ে আলোচনায় প্রাক্‌কথন হিসেবে বাংলার তীর্থের বিভাগগুলি দেখে নেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য E. Alan. Morinis এর *Pilgrimage in Hindu Tradition: A case study of West Bengal* বইটির কথা। এখানে লেখক বাংলার তীর্থগুলিকে নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। তবে সেই বিভাগ উল্লেখ করার আগে তিনি জানিয়েছেন যে-

> Travelling to the many sacred places within and beyond Bnegal is a common performance and an aspect of the main stream of the popular Hinduism for all but the lowest castes of Bengali Hindus .... The Pilgrimage tradition in West Bengal is an expression of Bengali Hinduism. ... Pilgrimage practice is West Bengal typically involves journeys to sacred places within the state. ... Bengalis however do visit sacred places of pan Hindu significance located in the other state. ... But the location of these centres at distance of up to 1500 miles from West Bengal restricts the number of people who can afford the time and the expenses to undertake such journeys. Pilgrimage within West Bengal are much more accessible to the Bengal population and it is these which are commonly and frequently undertaken. ...[৯]

অর্থাৎ, হিন্দু ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ তীর্থগুলি বাংলা থেকে ভৌগোলিকভাবে দূরবর্তী। একারণে অনেক সময়ই তীর্থযাত্রীদের আর্থিক অসামর্থ্যের জন্য সেই সব তীর্থক্ষেত্রে যাওয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে বাংলার নিজস্ব তীর্থগুলি বাঙালি তীর্থযাত্রীদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

E. Alan. Morinis বাংলায় প্রায় পঁয়তাল্লিশটি তীর্থ চিহ্নিত করে সেগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে পৌরাণিক তীর্থগৌরব আছে বাংলার কয়েকটি মাত্র তীর্থের—

> The Sangama of Ganges river and the Bay of Bengal … is celebrated as 'tirthasthana' in several classical sources: the Mahabharata, the Garuda Purana, the Kurma and Matsya Puranas and Vishnu Samhita. … Beside Gangasagara, only Trebeni, located within Bansberia town in Hooghly district has claim to antiquity[১০]

বাংলার শাক্তপীঠগুলি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

> The sakta pithas are the sacred seats of Goddess. … A myth links most of sakta pithas within a scheme of unity. … It appears in its most developed form in the Mahabharata and Brahma Purana.[১১]

এরপরে তিনি সতীর দেহত্যাগের পৌরাণিক বৃত্তান্তটি উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন বাংলার একাধিক শক্তিপীঠের অনেকগুলিই বর্তমানে তীর্থ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্য একটি প্রবন্ধে বলা হচ্ছে-

> ভারতীয় উপমহাদেশে প্রসারিত একান্নটি শক্তিপীঠের মধ্যে বারোটি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ... বিভিন্ন পীঠের প্রতিষ্ঠা সময় নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। সকলেই পুরাণের বিখ্যাত কাহিনীকে যুক্ত করে প্রাচীনতা প্রতিপাদন করতে তৎপর।[১২]

বাংলার তীর্থগুলির মধ্যে এই শক্তিপীঠ বা উপপীঠের সংখ্যাই সব থেকে বেশি।

বাংলা শৈবতীর্থ সম্পর্কে E. Alan. Morinis তাঁর বইয়ে জানিয়েছেন-

> In Bengal however, there are far fewer Saivite than Vaishanava and sakta centres. … Unlike sakta pithas, the holy centres for the worship of siva in India do not include within their numbers a site within West Bengal.[১৩]

এখানে লেখক পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে জনপ্রিয় তীর্থ হিসেবে তারকেশ্বরের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এও জানিয়েছেন যে ভারতের শৈবতীর্থ হিসেবে বিখ্যাত তীর্থগুলির মধ্যে তারকেশ্বরকে গণ্য করা হয় না। বাংলার দ্বিতীয় জনপ্রিয় তীর্থ হিসেবে তিনি বক্রেশ্বরের উল্লেখ করেছেন।[১৪]

বাংলার বৈষ্ণবতীর্থ সম্পর্কে E. Alan. Morinis লিখছেন-

> The sancitity of the presence that endows a place with holiness can be of two types in Vaisnava tradition … it is either God resident among men; or man risen to divinity.[১৫]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে তীর্থের ভূমিকা নিয়ে লেখক জানাচ্ছেন-

> Rupa Gosvami of the six Gosvamins of Vrndavana and the first to systematize the practices expounded by Chaitanya summarized the 64 pious acts which are the practices of the Vaisnava devotee in his sadhana of vaidhi bhakti, devotion by life actions. This encluded 'dwelling in sacred places of pilgrimage. … Jiva Gosvamin … considered pilgrimage to and residence in holy places and bathing in holy water as one of the eleven external acts of devotion.[১৬]

বাংলার বৈষ্ণবতীর্থগুলিকে E. Alan. Morinis দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগের স্থানগুলি চৈতন্যের আবাস বা অবস্থানের কারণে তীর্থ বলে পরিগণিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের স্থানগুলি চৈতন্যের পরিকরদের কারণে তীর্থ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছে।[১৭] এই বিভাজন অনুযায়ী চৈতন্য-সম্পৃক্ত বাংলার বৈষ্ণবতীর্থগুলি হল নবদ্বীপ, কাটোয়া, মায়াপুর। চৈতন্য-পার্ষদদের স্থান হিসেবে খ্যাতি পাওয়া বাংলার বৈষ্ণবতীর্থগুলি হল প্রধানত শান্তিপুরে অদ্বৈত মহাপ্রভুর পাট, খড়দহতে নিত্যানন্দের পাট, বিক্রমপুরে (ঢাকা) গদাধরের পাট এবং নবদ্বীপে শ্রীবাসের পাট। যদিও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই চারটি প্রধান পাট ছাড়াও বাংলায় অসংখ্য বৈষ্ণবপাট ছড়িয়ে রয়েছে, যার অনেকগুলিই বৈষ্ণবসমাজে 'পবিত্র স্থান' বা 'তীর্থ' হিসেবে গণ্য

হয়ে থাকে। এগুলি ছাড়াও E. Alan. Morinis জানিয়েছেন যে, বাংলার যে স্থানগুলি 'বৈষ্ণব মহাজনের স্থান' হিসেবে বিবেচিত হয় সেগুলিও বৈষ্ণবতীর্থ হিসেবে সমাদৃত, যেমনি কেন্দুলী।

বাংলার হিন্দু তীর্থগুলির সম্পর্কে এই সাধারণ ধারণার পরে এই তীর্থগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলা দেশের তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণকাহিনির বিভিন্ন প্রবণতা

ক) বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনি রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। লক্ষণীয় যে এই ধারার অনেকগুলি রচনাতেই বাংলার গৌরব প্রকাশের একটি প্রবণতা সক্রিয় ছিল। এই গৌরবের কারণ হিসেবে বৃহত্তর বাংলার ভৌগোলিক ক্ষেত্রে নানা তীর্থের স্থিতিকে তুলে ধরা হয়েছিল। তবে এই প্রবণতা কোনো বিচ্ছিন্ন মানসিকতার ক্ষণিক প্রকাশমাত্র নয়। বরং উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে নানা ধরনের বাংলা রচনার মধ্যে দিয়ে বাঙালির গৌরব বা ঐতিহ্যকে তুলে ধরার বা প্রতিষ্ঠা করার একটি সার্বিক উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। অনেকের মিলিত এবং একটি আদর্শ পরিচালিত এই উদ্যোগকে 'প্রকল্প' হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই প্রকল্পের পিছনে সক্রিয় ছিল সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি।

উনিশ শতকের শেষপর্বে বাংলায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটছিল। তার প্রথম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং ঠাকুর পরিবারের সহায়তায় ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আয়োজিত হতে থাকা 'হিন্দুমেলা'কে। হিন্দু মেলা 'জাতি' অর্থে ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক সত্ত্বার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল-

> Redefinitions of 'Jati' during the latter period were pivoted around the axis of cultural unity, articulated through the organizational network of the Hindu Mela, which sought to promote love and affection among the 'swajati' and the progress of the 'swadesh'.[১৮]

জাতীয়তাবাদের পরবর্তী উদ্যোগ বলে মনে করা যেতে পারে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের 'ভারত সভা'র কথা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু সেই সময়ে ছাত্রদলের মধ্যে যে উৎসাহ সঞ্চারিত করেছিলেন সে সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন-

> হাজার হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল; যুবকদল যেন ব্রাহ্ম সমাজের দিকে পিঠ ফিরাইল এবং রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরাইল। ... সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের জন্য রাজনীতি শিক্ষা ও আন্দোলনের উপযোগী কোনও সভা নাই। ... অবশেষে একটা রাজনৈতিক সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সংকল্পের ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে 'ভারত সভা' স্থাপিত হইল।[১৯]

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা জাতীয়তাবাদের আবেগকে ত্বরান্বিত করেছিল। তবে এর কিছু আগে বাংলায় হিন্দুত্বের পুনরুত্থান জাতীয়তাবাদে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মত- "... ১৮৮০ দশকে দেখা দিল হিন্দু পুনরুত্থান। শশধর তর্কচুড়ামণি সম্পর্কে কিছু সংশয় থাকলেও বঙ্কিমও তার সঙ্গে যোগ দিলেন"।[২০] এই সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে জাতীয় ভাবধারার চর্চা গতিলাভ করেছিল। এই প্রেক্ষাপটেই প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-

> ১৮৯৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩ শে তারিখে কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে শীযুক্ত মহারাজ কুমার কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ২/২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের এবং অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। ... একাডেমি অব্ লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ ইংরেজি-বহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেনে এবং জাতীয় সাহিত্য অনুরাগী কোন কোন ব্যক্তি আপত্তিও করিয়া থাকেন। ... একাডেমি অব্ লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। ... ইংরাজি বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নতুন ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন।[২১]

এই ভাবে বাংলা সাহিত্য রচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে যখন জাতীয়তাবাদী প্রবণতা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মত প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে শুরু করেছিল, তখন বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব এবং তার বিরোধিতা তাতে এক নতুন উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। "সাধারণের কাছে কার্জনের যে ব্যবস্থাটি সবচেয়ে অপ্রিয় হয়েছিল সেটি হলো- বঙ্গভঙ্গ"।[২২] বঙ্গভঙ্গের এই প্রস্তাব বা পরিকল্পনা অবশ্য ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই নানা সময়ে নানা প্রশাসকদের দ্বারা উত্থাপিত হচ্ছিল। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রস্তাবটি আবার উত্থাপন করেন বাঙলার নতুন ছোটলাট অ্যাণ্ডরু ফ্রেজার। "কার্জন সেটি মেনে নেন আর সর্ব প্রথম ঘোষণা করা হয় ৩ ডিসেম্বর ১৯০৩-এ, স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলির একটি চিঠিতে। ... [তবে] প্রকাশ্যে

এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অস্বীকার করা হয়েছিল"।[২৩] বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনার বিরোধিতায় জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। স্বদেশী ও বয়কটের মতো রাজনৈতিক আন্দোলন বা কর্মসূচির পাশাপাশি সাহিত্যক্ষেত্রেও বাংলার ঐতিহ্য, ঐক্য প্রদর্শনের চেতনা গড়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখাতে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এভাবে-

> ... ভারতের বড়লাট কার্জন ঘোষণা করলেন: লিখিত বাঙলাকে গুটিকয়েক আঞ্চলিক ভাষায় ভাগ করা হবে, আর দু-টুকরো করা হবে বাঙলা প্রদেশকে; পূর্ব বাঙলা আর আসাম মিলে তৈরি হবে এক নতুন প্রদেশ। ... বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙলা ভাষা হয়ে উঠল গণরাজনীতির ভাষা।[২৪]

সাহিত্য বা অন্য ধারার গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা আলোচ্য সময়ে দেখা গিয়েছিল বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিও তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জয়নারায়ণ ঘোষালের *কাশী-পরিক্রমা* গ্রন্থের নগেন্দ্রনাথ বসুর লেখা 'মুখবন্ধ' অংশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে লেখা *কাশী-পরিক্রমা* সম্পাদনা করে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নগেন্দ্রনাথ বসু অনুভব করছেন বঙ্গ-ভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে। 'মুখবন্ধ' অংশে এই 'প্রয়োজনীয়তা'র ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখছেন- "কাশী পরিক্রমা বাঙ্গালীর গৌরব ও আদরের সামগ্রী"।[২৫] যদিও তিনি এর পরেই লিখছেন-

> ইহাতে কাব্যসৌন্দর্য্য, রচনাপারিপাট্য অথবা ভাষার তেমন ওজস্বিতা নাই বটে; বলিতে কি, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকেই গ্রন্থরচয়িতাকে শ্রেষ্ঠকবি বা শ্রেষ্ঠ লেখকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন কি না সন্দেহ![২৬]

তবু, এই রচনা সম্পাদনা করে প্রকাশের কারণ আঠারো শতকের বাঙালি কবি বা লেখকের কোনো স্থানের আদর্শ 'সরল-চিত্র' নির্মাণ করার দক্ষতার গৌরবকে তুলে ধরা। নগেন্দ্রনাথ বসু ভ্রমণ সংক্রান্ত এই একটি বই সম্পাদনা করেই ক্ষান্ত থাকলেন না। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক কাহিনি যদুনাথ সর্বাধিকারীর *তীর্থ-ভ্রমণ* নামের রচনাটিও তিনি *কাশী-পরিক্রমা* প্রকাশের নয় বছরের মধ্যেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন। এই বইটি 'মুখবন্ধ' অংশে তিনি লিখলেন-

> তীর্থ-ভ্রমণ বঙ্গভাষার একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এ প্রকার গ্রন্থ তৎপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় আর লিখিত হইয়াছিল কিনা জানি না। ... বাস্তবিক বলিতে কি, এরূপ দৈনিক বিবরণ বা রোজ-নামচা লিখিবার পদ্ধতি আমরা মনে করিতাম যে, ইংরাজী প্রভাবের ফল- এখনকার জিনিস। কিন্তু এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমাদের সে ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। তাই এই তীর্থভ্রমণ-কাহিনী এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হইতেছি।[২৭]

লক্ষণীয় এই বইটির ক্ষেত্রে নগেন্দ্রনাথ বসু শুধুমাত্র বিষয়বস্তু বা লেখকের প্রকাশ-দক্ষতার উৎকর্ষের উল্লেখ করে একে 'গৌরবে'র বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করছেন না, রচনারীতির দিক থেকেও তিনি বইটিকে 'গৌরবের বিষয়' বলে মনে করছেন। কারণ এই বইটি 'রোজনামচা' জাতীয় রচনাকে 'ইংরাজী প্রভাবের ফল' হিসেবে দেখার তত্ত্বটি খারিজ করে, দেশীয় অর্থাৎ বাংলার একটি সাহিত্য সংরূপের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৩২২ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু আরও একটি তীর্থভ্রমণ কাহিনি সম্পাদনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন। সেটি হল ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়রাম সেনের পদ্যে লেখা *তীর্থমঙ্গল*। এই বইটির 'ভূমিকা' অংশেও নগেন্দ্রনাথ প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন-

> এখনকার ইংরাজি শিক্ষিত জন-সাধারণের বিশ্বাস যে ইংরাজী ভ্রমণ কাহিনী (Travels) পাঠ করিয়া তাহারই আদর্শে বাঙ্গালায় ভ্রমণ-কাহিনী লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে তাঁহাদের এই বিশ্বাস অমূলক।[২৮]

অর্থাৎ এই বইটির ক্ষেত্রেও নগেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ একটি সংরূপ বা প্রকরণের প্রাচীনতা ও স্বকীয়তা এবং সেই সূত্রে গৌরবের কথা উল্লেখ করছেন। অপ্রকাশিত, পুরোনো দিনের লেখা এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি সম্পাদনা করে বিশ শতকের প্রথম দশকে প্রকাশের উদ্যোগটি নিশ্চিতভাবেই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গৌরব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

এই সময়ে লেখা বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে আরও একটি বিষয় লক্ষ করা যায়- বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে তীর্থের অবস্থানের কারণে গৌরব প্রকাশ। বাংলার নদী-গিরি-গ্রাম আর বিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তরের প্রাকৃতিক শোভার কারণে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার সংস্কৃতি অনেক আগে থেকেই চালু ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের সেই মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হল তীর্থস্থানের অবস্থিতি।

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় হরকিশোর চৌধুরীর লেখা *চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য*। এটি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছিল। বইটির ভূমিকা রচনা করেছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। সেখানে তিনি লিখছেন-

> ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া যিনি একবার চন্দ্রশেখরের অভ্রভেদী সানুদেশে চন্দ্রনাথ মন্দিরের ছায়াতে বসিয়া সমুখস্থ অনন্ত বারিধির নীল চঞ্চল শোভা, উভয় পার্শ্বস্থ অনন্ত গিরিমালার শ্যাম স্থির তরঙ্গায়িত

> শোভা, এবং পশ্চাতে অনন্ত বিস্তৃত শস্যশ্যামলা নদ-নদী ... অসংখ্য গ্রামাবলীর শোভা সন্দর্শন করিবেন, ... সর্ব্বশেষে নির্জ্জন উপত্যকায় গিরিপার্শ্ববাহী সহস্রধারার জলপ্রপাত ও কুমারীকুণ্ড দেখিবেন, তাহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে শ্রী ভগবানের বিচিত্র লীলা ও মহিমাব্যঞ্জক এমন তীর্থ আর নাই।[২৯]

অর্থাৎ এখানে বাংলার বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তীর্থের অবস্থানকে যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে এবং বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব প্রচার করা হচ্ছে।

বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার ভূগোল বিশেষভাবে চর্চায় এসেছিল। এর প্রধান কারণ বাংলার ভূগোলকে নতুন রূপ দিতে চেয়ে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব। ভৌগোলিক এই ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে রাজনৈতিক বিরোধিতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তৈরি হয়েছিল। সাহিত্য-সংস্কৃতির সেই প্রকল্পে বাংলার ভূগোল বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে বাংলার প্রাকৃতিক শোভার শ্রেষ্ঠত্ব, নিসর্গশোভার উৎকর্ষ বাংলা দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে আন্দোলনকে বাড়তি মাত্রা দান করেছিল। বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতেও এই ধরনের মানসিকতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের লেখা *বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ ও সাধু জীবনী*। এই বইটির ভূমিকা রচনা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ রায়। এই ভূমিকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ভূমিকা অংশের লেখক বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নানা তীর্থের অবস্থানকে গৌরবের বিষয় হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। অন্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলার

শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হিসেবে এখানে সুরেন্দ্রনাথ তীর্থকে তুলে ধরছেন। তিনি লিখছেন-

> আজকাল বাঙ্গালায় ভ্রমণকাহিনীর নিতান্ত অভাব নাই। ... কিন্তু বঙ্গদেশের তীর্থভ্রমণ কাহিনী এই নতুন। অনেকের বিশ্বাস তীর্থ যাহা কিছু তাহা প্রায় সকলই বঙ্গ দেশের বাহিরে। বলিতে লজ্জা নাই ভূমিকা লেখকেরও প্রায় এমনই ধারণা ছিল। এটা যে কত বড় একটা ভ্রম তাহা যাহারা অনুগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্রের পুস্তকখানি পাঠ করিবেন তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। ... যে দেশে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া এমন একটা মহা সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; ... যে দেশ চৈতন্যের লীলাভূমি, রামমোহনের জন্মস্থান, রামকৃষ্ণের সাধনাক্ষেত্র সে দেশ কী তীর্থসম্পদে কাঙ্গাল? সতীর পবিত্র দেহকলা বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ৫১টা মহাপীঠের সৃষ্টি হয়। তাহার মধ্যে ২২টাই এই বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশ কী তীর্থ গৌরবে কোন দেশ অপেক্ষা হীন?[৩০]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিতে ‘বঙ্গদেশ’ যে কোনো দেশের থেকে ‘হীন’ নয়, শ্রেষ্ঠ — তা প্রমাণের প্রচেষ্টা থাকছে তীর্থের নিরিখে। এই ধরনের বই যে সেই সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ বইটির ‘দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন’ শীর্ষক অংশটি- “পাঠকগণের অনুকম্পায় প্রথমবারের সহস্র গ্রন্থ অল্প সময়েই নিঃশেষিত হইয়াছিল”।[৩১] লেখক মহেন্দ্রচন্দ্র রায় নিশ্চিতভাবেই তীর্থসংক্রান্ত বই রচনা করছেন। এটি স্পষ্ট হয় বইটির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে। তিনি এখানে ‘তীর্থযাত্রাবিধি’র উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে তীর্থযাত্রার কাল সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে- “শুদ্ধকালে তীর্থদর্শন করিবার নির্দেশ শাস্ত্রে লিখিত আছে। অশুদ্ধকালে বিশ্বেশ্বর, পুরুষোত্তম, বৈদ্যনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃত অনাদি দেবতা

দর্শন ও গঙ্গাস্নানাদি নিষিদ্ধ বটে"।[৩২] তাছাড়া তীর্থযাত্রার আরম্ভে কি কি পালনীয় সে সকল বিষয়ক নির্দেশও এখানে দেওয়া আছে-

> তীর্থযাত্রা করিতে হইলে যাত্রার পূর্ব্ব তৃতীয় দিবসে হবিষ্যাহারী হইয়া সংযম করিবে, যাত্রার পূর্ব্ব দিনে মস্তকের কেশাদি মুণ্ডন করিয়া উপবাস করিবে এবং যাত্রার দিন গণপতিদেবের পূজা, আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা, ইষ্টদেবের পূজা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি করিয়া ব্রাহ্মণাদি ভোজনের পর আহার করিয়া শুভলগ্নে যাত্রা করিবে।[৩৩]

তীর্থযাত্রাবিধি বিষয়ে জানাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রের অংশও উদ্ধৃত করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। বইটির মূল অংশে অবশ্য তিনি শাক্তপীঠগুলিকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর দেওয়া তীর্থ বিবরণের তালিকায় 'ত্রিপুরাসুন্দরী', 'চন্দ্রশেখর বা চন্দ্রনাথ তীর্থ', 'জয়ন্তীদেবী', 'শ্রীশৈলে মহালক্ষ্মী', 'কামাখ্যা বা কামগিরি'র উল্লেখ আছে। এর পাশাপাশি লেখক তীর্থগুলিতে যাওয়ার রাস্তা, যাবতীয় সম্ভাব্য খরচ, তীর্থগুলির পৌরাণিক পরিচয়, আশপাশের দর্শনীয় স্থান, তীর্থগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্ত্র সম্মত কৃত্যের তালিকা দিয়েছেন। যেমন- "কামাখ্যা তীর্থে যাইবার জন্য দুইটি প্রশস্ত লাইন বিদ্যমান আছে। ১) কলিকাতা হইতে ই. বি. রেল ও ষ্টীমার যোগে চাঁদপুর আসিয়া এ. বি. রেলে লামডিং জংসনে গাড়ী বদলাইয়া গৌহাটী। ২) নারায়ণগঞ্জ হইতে রেলে জগন্নাথগঞ্জ ও তথা হইতে ষ্টীমার যোগে গৌহাটী। কলিকাতা হইতে চাঁদপুর ২২৯ মাইল এবং তথা হইতে গৌহাটী ৪৫০ মাইল, ভাড়া ১৫/৬ আনা" ইত্যাদি।[৩৪] অর্থাৎ তীর্থভ্রমণ কাহিনির গতানুগতিক পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন তিনি।

তবে বইটির প্রথম অধ্যায়ে লেখক বাংলা সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ' লিখতে গিয়ে তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড মেলানো এক বৃহৎ-বঙ্গের পরিচয় দিচ্ছেন-

> ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা যে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ, যাহার উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমগিরি, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের প্রান্ত হইতে ভোটানের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত নানাবিধ মনোহর বৃক্ষরাজিপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী হিমাদ্রীর সঙ্গে মিশিয়া এক প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার সৃষ্টি করিয়াছে, দক্ষিণ বঙ্গ উপসাগরে সুনীল ফেনিল অম্বুরাশি ... বেলাভূমিতে প্রতিহত হইয়া দুর্লঙ্ঘ্য পরিখাকারে ইহাকে রক্ষা করিতেছে।– যাহার পশ্চিমে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পর্ব্বতসঙ্কুল অনুর্ব্বরা উচ্চভূমি সরলভাবে অবস্থিত- তাহারই নাম বঙ্গদেশ"।[৩৫]

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে লেখক সচেতনভাবে বাংলার ভৌগোলিক সীমানাকে সমকালের বাংলার প্রশাসনিক মানচিত্রের থেকে অনেকটা ব্যাপ্ত করে দেখাচ্ছেন। এই 'বড় করে দেখানো'র মধ্যে প্রাচীন 'বৃহৎ-বঙ্গে'র গৌরবময় অনুভূতি কাজ করেছে। লক্ষণীয় লেখক বাংলা ভূখণ্ডের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করতে তার ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসেরও উল্লেখ করেছেন-

> পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান আকার ছিল না। ঢাকা, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জিলার অধিকাংশ স্থানই বঙ্গ উপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। ... রংপুর হইতে ত্রিপুরার পশ্চিমবর্ত্তী ভূভাগ ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ক্রমে বালু কণার সম্মিলনে চড় পড়ায় পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলার অনেকানেক পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাকালে রংপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণেই বঙ্গ উপসাগরের মোহনা ছিল।[৩৬]

বিশ শতকের প্রথম দশকে লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে বাংলার ভূগোল বিষয়ে এই বিস্তৃত উল্লেখকে বাংলার ঐতিহ্য ও গৌরব-প্রতিষ্ঠার প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

খ) বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলিতে দ্বিতীয় যে প্রবণতাটি চিহ্নিত করা যায় সেটি হল- কোন একটি বিস্মৃত-বিলুপ্তপ্রায় বা কম জনপ্রিয় তীর্থকে প্রচারের আলোকে আনার উপায় হিসেবে অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় তীর্থ সম্পর্কে যাত্রীদের বিশদে নানা বিষয় জানানোর পদ্ধতি হিসেবে তীর্থভ্রমণ কাহিনিকে ব্যবহার করার প্রবণতা। এই ধারার বইগুলিতে তীর্থযাত্রায় লেখকের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির প্রকাশ কম রয়েছে। বরং সেখানে তীর্থ সম্পর্কে লেখকের সংগৃহীত তথ্য বেশি করে জায়গা করে নিয়েছে। কারণ বইগুলি লেখার ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে- তীর্থস্থানের প্রতিষ্ঠা-প্রচার বা বিশদ বিবরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই বইগুলির লেখকেরা অনেক সময় তীর্থস্থানের স্থানীয় বাসিন্দা, আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তীর্থভ্রমণকারী।

বাংলার একটি কম পরিচিত তীর্থ হল চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থ। এই তীর্থকে কেন্দ্র করে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় হরিকিশোর চৌধুরীর লেখা *চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য*। বইটির চতুর্থ সংস্করণের 'নিবেদন' অংশ থেকেই স্পষ্ট হয় এর রচনার কারণ-

> দ্বাবিংশ বৎসর মধ্যে চন্দ্রনাথের কৃপায় 'চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যে'র চতুর্থ সংস্করণ হইল। ... ১৩০৬ বঙ্গাব্দে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের উপদেশে আমার বিশেষ আত্মীয় ... শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর ভট্টচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া 'চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য' প্রকাশ করি। ... যে ক্ষীণ আশায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, চন্দ্রনাথের কৃপায় সেই আশা অনেকাংশ সফল হইয়াছে – বঙ্গের সীমান্ত দেশে অতি প্রাচীন ধ্বংসপ্রায়

> তীর্থক্ষেত্রের প্রতি বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুগ্রহদৃষ্টি পতিত হইয়াছে- তাহার ফলে তীর্থ মাহাত্ম্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গত বিংশতি বৎসর মধ্যে দরিদ্র গ্রন্থকারের চেষ্টায় বঙ্গের ধনী সম্প্রদায়ের অর্থ সাহায্যে তীর্থের অনেক অনেক অসুবিধা মোচন হইয়াছে।[৩৭]

অর্থাৎ লেখকের মতে বাংলার একেবারে সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় চন্দ্রনাথ তীর্থটি সাধারণ বাঙালি তীর্থযাত্রীদের কাছে অপরিচিতি, অবহেলিত ছিল। এই বইটির মাধ্যমে লেখক সেই কম জনপ্রিয় তীর্থকে পরিচিত করার চেষ্টা করেছেন। বইটির ভূমিকা-লেখক অবশ্য বইটির উদ্দেশ্য হিসেবে চন্দ্রনাথ তীর্থকে তার মোহান্তের হাত থেকে উদ্ধার করার কথা, সাধারণের কাছে এই তীর্থের শোচনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরার চেষ্টার উল্লেখ করেছেন-

> সাতটি ব্রাহ্মণ পরিবার এই তীর্থের সেবায়েত অধিকারী পাণ্ডা বলিয়া পরিচিত এবং পুরুষানুক্রমে এ সকল দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই ব্রাহ্মণের স্বত্বাপহরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মোহন্ত কিশোরীধন দেববিত্ত অপব্যয়ে প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল মোকর্দ্দমা করিয়া নিষ্ফলকাম হইয়াছেন। ... তীর্থধ্বংস হইলে মোহন্তদের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নাই। তাহারা যে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করিয়াছে তাহাতে তাহাদের স্বেচ্ছাচার ব্রত উদযাপন করিতে পারিবে। কিন্তু তীর্থ রক্ষার উপায় কি? হিন্দুর পবিত্র তীর্থ সকল কি কর্তব্যজ্ঞানহীন লীলা স্থল হইবে? অতএব যাহাতে চন্দ্রনাথ তীর্থাদির মাহাত্ম্যেরও শোচনীয় অবস্থার প্রতি হিন্দুদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় সেই উদ্দেশ্যে এই ‘চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য’ প্রকাশিত হইল।[৩৮]

চন্দ্রনাথ তীর্থের প্রচার করতে গিয়ে লেখক কখনো সংস্কৃত 'দেবীপুরাণ' উদ্ধৃত করেছেন, আবার কখনো 'চন্দ্রনাথের ইতিহাস' আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মহাকাব্য, মিথ-এর উল্লেখ করে তীর্থটির প্রাচীনত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন-

> ভারত বিখ্যাত চন্দ্রনাথ নব প্রতিষ্ঠিত কোন তীর্থ নয়। যুগ যুগান্ত হইতে এই তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। রামচন্দ্র বনভ্রমণ কালে এই তীর্থে আসিয়াছিলেন শাস্ত্রগ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। ... তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থে চন্দ্রনাথ তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[৩৯]

চন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাত্রীদের জানাতে লেখক এর অবস্থান, দর্শনীয় স্থানেরও উল্লেখ করেছে-

> ... এই ভারতবিখ্যাত পবিত্র তীর্থ চট্টগ্রাম হইতে ১২ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে পর্ব্বতদেশে অবস্থিত। স্থানটি সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। সেই সর্ব্বপ্রধান শৃঙ্গে চন্দ্রনাথ অবস্থিত তাহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৮০০ হাত উচ্চে।[৪০]

এই তীর্থের দর্শনীয় স্থানগুলির কথা বলতে গিয়ে তিনি গুরুধুনী, ব্রহ্মকুণ্ড, সহস্রধারা, বাড়বানল, কুমারীকুণ্ড ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন-

> দক্ষিণে প্রকৃতির মনোহর রাজ্যে পর্ব্বতদেশে অত্যাশ্চর্য্য বাড়বানল হুহুঙ্কারে জ্বলিতেছে। দিন নাই রাত নাই, শান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, সপ্তজিহ্বাত্মক বহ্নি সলিলোপরি প্রচণ্ডবেগে সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় রহিয়াছে। যে অনলে সামান্য জলবিন্দুপাত হইলে আগ্নির অসীম ক্ষমতা তৎক্ষনাৎ লুপ্ত হয়, সেই জলে অনলদেব সর্ব্বদা খেলা করিতেছে। এমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্ময়ের ক্ষেত্র ভারতে বিরল।[৪১]

বাংলার প্রান্তে থাকা চন্দ্রনাথ তীর্থতে যাত্রীদের তীর্থকৃত্যের সুবিধা করে দেওয়ারও চেষ্টাতে 'তীর্থকৃত্যের সংক্ষিপ্ত প্রণালী'র বিবরণও দেওয়া আছে এখানে-

ব্যাসকুণ্ড তীর্থ- ক) ব্যাসকুণ্ডে স্নান তর্পণ খ) কুণ্ডপারস্থিত মন্দির মধ্যে ব্যাস, ভৈরব, চণ্ডী, দর্শন স্পর্শ যথাশক্তি পূজা ও নমস্কার গ) বটুক মূলে পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান, জলসেচন, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ ঘ) ষোড়শ দান ঙ) ব্যাসকুণ্ডের পূর্ব্বপাড়ে তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, অসমর্থপক্ষে ভোজ্য অথবা কেবল পিণ্ডদান।[৪২]

এছাড়াও 'শিবপূজাদি প্রকরণ', তর্পণ, 'দান' প্রভৃতির উল্লেখ এখানে আছে। এই ভাবে লেখক চন্দ্রনাথ তীর্থের পুরাণ, ইতিহাস, মাহাত্ম্য, কৃত্য- সব কিছু মিলিয়ে তীর্থটি সম্পর্কে একটি কোষগ্রন্থ রচনা করে তীর্থটির প্রচারের চেষ্টা করেছেন।

বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় তীর্থ হল কালীঘাট। এই তীর্থ সম্পর্কে তীর্থযাত্রীদের বিশদে জানাতে লেখা হয় *কালীক্ষেত্র দীপিকা বা কালীঘাটের পুরাতত্ত্ব* বইটি। লেখক সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় এর একটি ইংরেজি শিরোনামও দিয়েছেন 'The Antiquities of Kalighat'। বইটির 'উপক্রমণিকা' অংশে লেখক কালীঘাটের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন-

কালীঘাট ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতার রাজপ্রাসাদ হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ দক্ষিণে আদি গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা কালীঘাট রোড ও বলরাম বসুর ঘাট রোড, পূর্ব্ব সীমা রসা রোড, দক্ষিণ সীমা নেপাল ভট্টাচার্য্যের লেন ও পশ্চিম সীমা আদি গঙ্গা।[৪৩]

বই রচনার কারণ হিসেবে লেখকের বক্তব্য-

কালীঘাট একটী পীঠস্থান। ইহা শাক্তদিগের মহাতীর্থস্থান হইলেও স্বয়ম্ভু নকুলেশ্বর ও শ্যামরায় বিগ্রহ বিরাজমান থাকায় সকল সাম্প্রদায়িক লোক এখানে আগমন করিয়া থাকেন। এই কালীঘাটের উৎপত্তি, প্রাচীন অবস্থা, প্রভৃতি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে অনেকের কৌতূহল

> জন্মিয়াছে। ... তিন চার পুরুষ ক্রমান্বয়ে কালীঘাটে বাসবিধায় বহুদিন হইতে এই স্থানের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি। ... আমার কয়েকজন বন্ধু ও প্রতিবেশী পূর্ব্ব সংগৃহীত কালীঘাটের ঐতিহাসিক বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন ... ইহাদের ও অন্যান্য প্রতিবেশী আগ্রহে ও উৎসাহে এরূপ বার্দ্ধক্যাবস্থায় অশক্ত শরীরে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি পুস্তকাকারে পাঠক সমাজে উপস্থিত করিতে বাধ্য হইলাম।[৪৪]

অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠিত তীর্থ- কালীঘাট বিষয়ে যাত্রীদের জানাতে লেখক এই বই রচনা করছেন। বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে লেখক কখনো 'কালীঘাট' নামটির উৎপত্তির সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ করেছেন-

> এই কালীক্ষেত্র বা কালীপীঠ ভাগীরথীর তীরস্থ থাকায় সমুদ্র গমন কালীন বৈশ্য বণিকগণ অরণ্য গর্ভস্থ এই কালীক্ষেত্রের তীরে উঠিয়া মহামায়ার পূজা দিয়া যাইতেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয়না। ... মাঝি মাল্লারা কালীক্ষেত্রের তীরে উঠিবার জন্য যে স্থানে নৌকা লাগাইত তাহার নিদর্শনের জন্য তাহারা সেই তীরস্থভূমিকে কালীদেবীর ঘাট বা কালীঘাট বলিত। ক্রমে তাহার কালীঘাট আখ্যা হইল।[৪৫]

কখনও লেখক তীর্থ কালীঘাটের ইতিহাস বর্ণনার সূত্রে 'কলিকাতা' নামটির উৎপত্তির ব্যাখ্যা–

> আইন আকবরির প্রণেতা আবুল ফাজল সুতানুটির দক্ষিণে বর্ত্তমান কলিকাতা কালীঘাট ভবানীপুর প্রভৃতি সমুদায় স্থান কে এক 'কালীকোটা' শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। ... কালীঘাট শব্দকে পার্সী অক্ষরে লিখিতে গিয়া ঘ স্থলে পার্সীর গায়েন না লিখিয়া ক্বাফ্ লিখিয়া

> কালীকোটা এই রূপ অপভ্রংশ পদ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ... ইউরোপীয়দের মুখে আবুল ফাজলের 'কালীকোটা' শব্দের ঈকার লোপ হইয়া কালকোটা ও ক্রমে কালকট্টা হইয়াছে এবং এদেশীয় ব্যবসায়ীগণ ইংরাজ বণিকগণের সংশ্লিষ্ট বশতঃ কালীকোটা স্থলে কালীকাতা বা কলিকাতা করিয়াছেন।[৪৬]

লেখক কালীঘাট সম্পর্কে প্রচলিত লোককথা- অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কালীমূর্ত্তি উদ্ধার-এর যেমন উল্লেখ করছেন, তেমনি আঠারো শতকের কালীঘাটের অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে মিসেস কিণ্ডারলি-এর ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দের চিঠিও উদ্ধৃত করেছেন-

> বালিয়াঘাটা হইতে কলিকাতার চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান নিম্ন জলাভূমিতে পরিব্যাপ্ত ছিল। স্থানে স্থানে দু চারটী বাঙ্গালা ঘরে ইংরাজ ও শেঠ উপাধিধারী এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীগণ বাস করিতেন, যাতায়াতের জন্য তখন কেবল পাল্কীমাত্র ব্যবহৃত হইত। ডাকাইত ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর উপদ্রবে কেহ রাত্রে একাকী গমনাগমন করিতে পারিত না।[৪৭]

এছাড়াও লেখক 'ইংরাজ কুটীর অধ্যক্ষ হলওয়েল'-এর ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দের রিপোর্ট, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী' প্রভৃতির সমন্বয়ে কালীঘাটের একটি সার্বিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। বইটির শেষ অংশে কালীঘাটের পাণ্ডা বা সেবায়েতদের ইতিহাস, মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত 'বড়িষার সাবর্ণি চৌধুরী জমীদারে'র ইতিহাস, কালীর দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচয়, পূজার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য এবং লেখকের সমকালের কালীঘাটের জাতিভিত্তিক জনবিন্যাস, রাস্তা প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। এইভাবে

সম্পূর্ণ বইটি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, লেখক ইতিহাস, পুরাণ, প্রচলিত লোককথা-সকল কিছুর সমবায়ে কালীঘাট তীর্থ বিষয়ে একটি আকরগ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছেন।

বাংলার আর এক পরিচিত তীর্থ বক্রেশ্বরকে কেন্দ্র করেও এই ধরনের বই লেখা হয়েছে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কন্দর্পনারায়ণ ধর সংস্কৃত থেকে বাংলায় পদ্যে 'শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত গুপ্তকাশী'র শ্লোকের অনুবাদ করে *শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর মাহাত্ম্য* নামে প্রকাশ করেন। বইটির 'মুখবন্ধ' লেখক জটিলবিহারী চক্রবর্তী এর প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> ... এই পুস্তক মুদ্রিত করা হইল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মুদ্রাযন্ত্রের এই প্রাদুর্ভাব কালে প্রচার যোগ্য কোন বিষয়ই অপ্রচারিত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। ... যে মহাতীর্থের মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল, গ্রন্থ-প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাস, সেই তীর্থকে 'গুপ্ত কাশী' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্ত সেই মহাতীর্থের বিষয় গুপ্ত অবস্থাতেই আছে। ... এখন যাহাতে এই গুহ্যতীর্থ 'গুপ্ত কাশীর' মাহাত্ম্য বাংলার সকল হিন্দু সন্তান সন্ততির পরিজ্ঞাত হয়, এবং সকল হিন্দু নরনারী এই পুণ্যক্ষেত্র পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেহ, মন ও নয়ন পবিত্র করিতে পারেন, কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক মুদ্রণে অভিলাষী হইয়াছি।[৪৮]

যাত্রীদের সুবিধার জন্য বক্রেশ্বর তীর্থে যাওয়ার পথনির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে এখানে-

> তীর্থ যাত্রীদিগের জন্য এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, অণ্ডাল ও সিন্থিয়া রেলওয়ে লাইনের সীউড়ি ষ্টেশন হইতে ৮/৯ মাইল পশ্চিমে এবং উক্ত লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশন হইতে ৩/৪ মাইল উত্তরে এই পবিত্র ক্ষেত্র অবস্থিত। উভয় ষ্টেশন হইতেই প্রশস্ত পাক্কা রাস্তা আছে এবং কেরাচী ও গোগাড়ি সর্ব্বদাই সহজ প্রাপ্য।[৪৯]

এইভাবে এখানেও বক্রেশ্বর তীর্থের একটি সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

একইরকম ভাবে শুধুমাত্র দক্ষিণেশ্বর তীর্থকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে 'ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত ও সম্পাদিত' একটি বই *দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা*। বইটির অধ্যায় বিন্যাস এবং তাদের নামকরণ সাধারণ বইয়ের তুলনায় অন্য ধরনের। এখানে বিষয় অনুসারে অধ্যায়গুলির নামকরণ করা হয়নি, বরং লেখক 'আচমন', 'আবাহন', 'আসন শুদ্ধি', 'ভূতশুদ্ধি' – এই ভাবে পূজা-পদ্ধতির ক্রম অনুসারে নাম দিয়েছেন অধ্যায়গুলির। লেখক 'সঙ্কল্প' শিরোনামের অংশটিতে বই প্রকাশের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন-

> ... প্রকাশক মহাশয়ের দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে সাময়িক বসবাসে এবং কর্ম্ম ও প্রবৃত্তিসূত্রে ঠাকুর বাটীর ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার মনে দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত একখানি পুস্তিকার অভাব দূরদেশাগত যাত্রীগণের পক্ষ হইতে অনুভূত হয়। ... তাহার অনতিকাল পরেই প্রকাশক মহাশয় আপনার অনুভূত অভাব পূরণের মালমশলা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া সেগুলি যথাস্থানে সংযোজন ও সম্পাদনের ভার লেখকের উপর ন্যস্ত করিলেন"- এই ভাবে তৈরি হল 'দক্ষিণেশ্বর- তীর্থযাত্রা'।[৫০]

এই অংশেই লেখক জানাচ্ছেন যে "এখন সকৃতজ্ঞচিত্তে আমরা স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তিকা প্রণয়ন ব্যাপারে আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষদর্শন ব্যতীত পঠিত বিদ্যার উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে" (সঙ্কল্প)। অর্থাৎ, দক্ষিণেশ্বরে ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও তীর্থটি সম্পর্কে নানা তথ্য অন্যান্য সূত্র থেকে এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। লক্ষণীয় বইটির প্রথম অধ্যায় 'আচমনে' বলা হচ্ছে-

> দক্ষিণেশ্বর বাংলার তীর্থ- বাংলা ভারতবর্ষের তীর্থ, ভারত পৃথিবীর তীর্থস্থান। এই সিদ্ধান্ত একটি নির্ভিক সত্য; অন্তঃসার শুন্য অহমিকা

> নহে। ... উপনিষদের যে বাণী, ... বাইবেল কোরাণের যে বাণী, এক কথায় পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মমতের যে সত্যবাণী তাহাই একদিন দক্ষিণেশ্বরে উদ্গীত হইয়াছিল। সমন্বয় এই শব্দটি উক্ত বাণীর প্রতীক। সমন্বয় পৃথিবীর লক্ষ্য, সমন্বয় ভারতের মূলাধার, সমন্বয় বাংলার বীজ, সমন্বয় দক্ষিণেশ্বরের দান"।[৫১]

এখানে তীর্থ হিসেবে দক্ষিণেশ্বরের এই শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করে নিয়ে সেই 'শ্রেষ্ঠ' তীর্থের অতীত ইতিহাস, ভৌগোলিক ও অবস্থানগত পরিচয়, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, তার প্রতিষ্ঠা, দক্ষিণেশ্বরের বৈষয়িক ব্যবস্থা, রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে আসা প্রভৃতির অনুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়াও দক্ষিনেশ্বর তীর্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাসমণি এবং তাঁর পরিবারের ইতিহাস ও ভূমিকা, রামকৃষ্ণের জীবনকথাও গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। এ বই অনেকটাই দক্ষিণেশ্বর সম্পর্কে 'সাধারণ জ্ঞানে'র বইয়ের মতো।

বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে কুলিয়ার পাটবাড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় তীর্থ। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে শুধুমাত্র কুলিয়ার বৈষ্ণব পাটিবাড়িকে কেন্দ্র করে পঞ্চানন ঘোষের লেখা একটি বই প্রকাশিত হয় *কুলিয়ার পাট*। বইটির 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন কুলিয়ার পাটবাড়ি থেকে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা' নামের পত্রিকাতে তিনি 'কুলিয়া বা দেবানন্দ পাটের মাহাত্ম্য' নামে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেগুলিই গ্রন্থাকারে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। এর 'ভূমিকা' অংশের লেখক রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ বইটি রচনার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন-

> শ্রীমান পঞ্চানন ঘোষ বাবাজীবন ... নিষ্ঠাবান ভক্ত। ইহার শ্রমে চিন্তায় ও প্রযত্নে কুলিয়ার পাটের বহুপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। অধুনা ইনি বর্ত্তমান কুলিয়ার পাট সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন

করিয়া তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে এবং জনসাধারণের পক্ষে সবিশেষ উপকার করিলেন।[৫২]

সম্পূর্ণ পদ্যে লেখা 'কুলিয়ার পাট' বইটিতে 'কুলিয়া বা দেবানন্দ পাটের মাহাত্ম্য', 'দেবানন্দের সাধনা', 'শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট চাপাল-গোপালের আরোগ্য প্রার্থনা', 'নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন', 'চাপালগোপালের অপরাধ ভঞ্জন ও দেবানন্দের প্রতি মুক্তিদান' প্রভৃতি অংশের মাধ্যমে কুলিয়ার বৈষ্ণব পাটবাড়ির ইতিহাস ও গৌরব বর্ণনা করেছেন।

বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণকাহিনি প্রসঙ্গে আরও দু'টি বইয়ের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। অনেকটা 'গাইড বুক' এর ধরনে লেখা বই দু'টিতে সমগ্র ভারতের তীর্থস্থান কথা প্রসঙ্গে বাংলার দেশের তীর্থস্থানগুলিরও উল্লেখ আছে। এর প্রথমটি হল গোষ্ঠবিহারী ধরের লেখা *সচিত্র তীর্থভ্রমণ কাহিনী*। চার খণ্ডের এই বইয়ে গোষ্ঠবিহারী ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলের তীর্থের বিবরণ দিয়েছেন। প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে বাংলা দেশের তীর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। এখানে লেখক বলছেন-

বাঙ্গালী নানা বিষয়ে অধঃপতিত হইলেও তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের পবিত্র মধুর ভাব এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় ধর্ম্মের নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নরনারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরম পবিত্র তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ... হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া দেবদেবী দর্শনে মুক্তিলাভ হয়। ... পূর্ব্বে নৌকাযোগে বা পদব্রজে যাঁহারা তীর্থে গমন করিতেন তাঁহারা কত সময় কত ক্লেশ কত অর্থ ব্যয় করিয়া পাষণ্ড দস্যুদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত বিড়ম্বনা করিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই দুর্লভ পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করিতেন তাহা

> একবার চিন্তা করিলেও হৃদকম্প হয়। এক্ষণে রেলগাড়ীর সাহায্যে এবং ইংরাজের সুশাসনের গুণে যাত্রীদিগের গমনাগমন যতদূর সম্ভব সুখসাধ্য হইয়াছে। ... এ দীন আবাল্যকাল হইতে তীর্থভ্রমণ প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা সাধ্যমত এই 'তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী' নামক পুস্তকে জনসাধারণে প্রকাশ করিয়াছি। ... আমার এই 'তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী' তীর্থ পর্য্যটকদিগের প্রিয় সহচর ও পথপ্রদর্শকের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবে।[৫৩]

অর্থাৎ বই লেখার ক্ষেত্রে গোষ্ঠবিহারীর মূল উদ্দেশ্য শুধু তীর্থস্থানের বিশদ তথ্য হাজির করা নয়, সংশ্লিষ্ট তীর্থযাত্রায় সাহায্য করাও। লক্ষণীয় ভারতের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানের বিবরণ দিতে গিয়ে এই লেখক বাংলার শুধুমাত্র তিনটি তীর্থের উল্লেখ করছেন- কালীঘাট, তারকেশ্বর ও ত্রিবেণী। এই নির্বাচনের মানদণ্ড নিশ্চিতভাবেই তীর্থগুলির জনপ্রিয়তা। লেখকের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু তীর্থযাত্রীদের সহায়তা করা, তাই তিনি শুধুমাত্র কালীঘাটের পুরাণ, ইতিহাস, প্রচলিত লোককথা কিম্বা তারকেশ্বরের মোহান্তের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তীর্থগুলিতে যাওয়ার স্পষ্ট উপায়ও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন-

> হাওড়া হইতে তারকেশ্বর ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ই আই রেলযোগে, সেওড়াফুলী, তথা হইতে তারকেশ্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল কাঁচা রাস্তা পদব্রজে গমন করিলে পর শ্রীমন্দিরের পাদদেশে পৌঁছানো যায়। তারকেশ্বর হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ও বিখ্যাত পূজনীয় স্থান।[৫৪]

গোষ্ঠবিহারীর ধাঁচে লেখা বীরেন্দ্রনাথ দাসের *ভারতের তীর্থযাত্রা বা ভারতের সমস্ত তীর্থস্থানের বর্ণনা* বইটির কথা উল্লেখ করতে হয়। এখানে তিনি কাশী, গয়া, রাজগিরি

পাটনা থেকে পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা, আজমীর, জয়পুর, অমৃতসর- প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত তীর্থস্থানের বিবরণ দিয়েছেন। আর সেই তালিকায় বাংলা দেশের তারকেশ্বর, কলিকাতা কালীঘাট, নবদ্বীপ, শ্রীরামপুর, ঢাকা, গঙ্গাসাগর ইত্যাদি তীর্থ স্থান করে নিয়েছে। এই বইটিতে লেখক একইভাবে প্রথমে তীর্থগুলির অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছেন, সেখানে তীর্থযাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার উল্লেখ করেছেন। যেমন গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গে লেখা হচ্ছে-

> কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল ডায়মণ্ড হার্ব্বার পর্য্যন্ত রেল আছে। কিন্তু ইহার পর নৌকা বা ষ্টীমার ভিন্ন যাওয়া যায় না। সেই জন্য যাত্রীরা কলিকাতা হইতে ষ্টীমারযোগে গঙ্গাসাগর যায়।[৫৫]

তারপরে গঙ্গাসাগরের মেলা ও কপিল মুনির আশ্রমের কথাও উল্লেখ করছেন তিনি-

> গঙ্গাসাগরে একটি খাড়ী উত্তর হইতে আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। মকর সংক্রান্তির দিন পশ্চিম ধারে প্রায় এক মাইল কাটিয়া মেলা বসান হয়। ... কলিকাতা হইতে নানা রকমের বিস্তর দোকান এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে বিক্রীর জন্য অনেক মাদুর আসে। মেলা স্থান হইতে কিছু পশ্চিমে ঘোর জঙ্গল। এই জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। ... গঙ্গাসাগরে মহামুনি কপিলের আশ্রম গুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই গুপ্ত আশ্রমটীকে বৈষ্ণব প্রধান রামানন্দ জিউ উদ্ধার করিয়াছেন। ... যাত্রীরা সমুদ্রে স্নান ক্রিয়া সমুদ্রকে নারিকেল ফল, ফুল, পঞ্চরত্ন দেয় এবং কপিলের দর্শন ও পূজা করিয়া থাকে।[৫৬]

গ) বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলির তৃতীয় একটি প্রবণতা এইভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে- তীর্থভ্রমণ কাহিনির পুরুষ এবং মহিলা লেখকদের রচনার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম আলোচ্য বই আনন্দময়ী দেবীর লেখা *গুরুর কৃপায় তীর্থদর্শন*।

এই বইটির ‘অবতরণিকা’ অংশ লিখেছেন লেখিকার পরিচিত ‘সোদর প্রতিম’ সুরেশ চন্দ্র ঘোষ। সেখান থেকে জানতে পারা যায় যে লেখিকা প্রথাগতভাবে শিক্ষিতা নন- “লেখিকা কোন প্রকার বিদ্যালয় বা কোন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষিতা নহেন। স্বীয় পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের যত্নে ও উৎসাহে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন”।[৫৭] তাছাড়াও তাঁর বইয়ের ‘সৎ গুরু লাভ’ শীর্ষক অংশ থেকে লেখিকার তাঁর গুরুভক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আনন্দময়ী দেবী ভুবনেশ্বর, পুরী, এলাহাবাদ, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, কেদারনাথ, কাশী, কামাখ্যা প্রায় সকল হিন্দু তীর্থে যাওয়ার কথা তাঁর এই বইয়ে তুলে ধরেছেন। সেই তীর্থগুলির মধ্যে বাংলা দেশের কালীঘাট, গঙ্গাসাগর, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর, নবদ্বীপ, জয়দেব এবং চন্দ্রনাথ তীর্থ স্থান পেয়েছে।

পুরুষ তীর্থযাত্রীর স্বাধীনভ্রমণ ভ্রমণকাহিনি লেখার উপাদান সংগ্রহে সকল সময় সুবিধা করে দিয়েছে। অথচ তীর্থযাত্রায় পুরুষের অভিভাবকত্বে থাকা নারীদের সেই সুযোগ কম। বিষয়টি এই লেখিকার কথাতেও স্পষ্ট হয়-

> আজমীর, জয়পুর, কুরুক্ষেত্রে এ কয়েকটি স্থানের লেখা খুব কম হইয়াছে। কারণ আমি যাহাদের সঙ্গে তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম তাঁহারা এসকল স্থানে একবেলা কিংবা এক দিন থাকিয়া যেটুকু দেখা আবশ্যক সেইটুকু মাত্র দর্শনাদি করিয়াছিলাম, আমিও তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া আর কুত্রাপীও যাইতে ও দেখিতে পারি নাই। সেই জন্য পুস্তকে সেই অল্পটুকুমাত্র লেখা হইয়াছে।

অন্যের অধীনে দলের সঙ্গে ভ্রমণে যে দৃষ্টির সংকীর্ণতা তা এখানে প্রকাশিত হয়েছে- "প্রসিদ্ধ স্থানের চারিদিকে ভ্রমণ না করিলে সেই স্থানের বর্ণনা করা যায় না। সেই জন্য পুস্তকের কোন দোষ হইয়া থাকে পাঠক পাঠিকাগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন"।[৫৮]

সম্ভবত সেই অল্প সময়ের মধ্যে তীর্থস্থান ভ্রমণের কারণে লেখিকার বিবরণগুলিও পুরুষ লেখকদের রচনার দৈর্ঘ্যের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। যেমন কালীঘাট বিষয়ে তিনি লিখছেন-

> কালীঘাট যাইতে কোন কষ্ট নাই। হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে। হাওড়া হইতে কালীঘাট যাইতে ট্রাম, বাস, ঘোড়ার গাড়ী সমস্তই পাওয়া যায় ... মন্দিরের বাহিরে ও মন্দিরের প্রাঙ্গনের মধ্যে অনেক ফুলমালা ও ডালার দোকান আছে। মায়ের পূজা যাঁহার যেমন ইচ্ছা সে সেই রকম পূজা দিয়া থাকে।[৫৯]

একইরকম ভাবে ছোট পরিসরে নবদ্বীপের ভ্রমণের কথা বলেছেন লেখিকা- "হাওড়া হইতে ই আই আর বারহারোয়া ব্যাণ্ডেল লুপ লাইন দিয়া ৬৬ মাইল দূরে নবদ্বীপ। শিয়ালদহ হইতে ই বি আর দিয়াও যাওয়া যায়"।[৬০] নবদ্বীপের সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে সামান্যই- "নবদ্বীপে অনেক মন্দির আছে, গঙ্গা আছেন, অনেক দেখিবার জিনিষ আছে"।[৬১] লেখিকার দেওয়া তারকেশ্বর, ত্রিবেণী, বক্রেশ্বর অথবা চন্দ্রশেখর তীর্থের বিবরণও একইরকম ভাবে সংক্ষিপ্ত।

তাছাড়াও আনন্দময়ীর দেবীর লেখাতে ভক্তির অনুভূতির সরাসরি ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন কালীঘাট অংশে তিনি লিখেছেন-

> মা, যেমন কালী মুর্ত্তিতে ভুবন আলো করিয়াছ, এমনি আমার হৃদয়ের সব অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত কর মা!

> ... তোমার বলির বিধান দেখিয়া বলিতেছি মা তুমি দয়া করিয়া আমার ষড়রিপুগুলিকে বলিরূপে রহণ কর মা![৬২]

পুরুষের লেখকদের লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে এই ধরনের ব্যক্তিগত আবেগের আপ্লুত প্রকাশ বিরল।

এই ধারার দ্বিতীয় বইটি রাজলক্ষ্মী দেব্যার লেখা *তীর্থচিত্র*। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কিন্তু এই বইয়ের অন্তর্গত তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির উৎস আরও পূর্ববর্তী সময়ের তীর্থভ্রমণ। মহিলাদের লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই বইটি।

প্রথমে রাজলক্ষ্মী দেবীর (বাগচী) সামাজিক অবস্থানটি বুঝে নেওয়া দরকার-

> রাজলক্ষ্মী দেব্যা সেকালের অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গনারীর তুলনায় কিছুটা অন্য প্রকৃতির ছিলেন। শান্তিপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের পরামর্শপ্রদান এবং তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শন করার অদম্য স্পৃহা তাঁকে সে যুগে হয়ত ব্যতিক্রমী নারী করে তুলেছিল।[৬৩]

রাজলক্ষ্মী দেবীর এই পরিচয় বুঝিয়ে দেয় তিনি 'আলোকপ্রাপ্তা' নারী। তাঁর লেখার মধ্যেও সেই শিক্ষা বা জ্ঞানের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ১৩১২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে রাজলক্ষ্মী দেবী তীর্থ করতে নবদ্বীপে যাচ্ছেন। সেই তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে নবদ্বীপের ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি লক্ষণসেন, বখ্‌তিয়ার খিলজি, রঘুনাথ তর্কচুড়ামণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের পারম্পরিকতা উল্লেখ করেছেন। আবার গঙ্গাসাগর তীর্থের ভ্রমণ কাহিনিতে দেখা যায় তাঁর সাহসী পদক্ষেপ- "বাংলা ১৩২৬ সালে সাগরে যাইবার বাসনায় পৌষ মাসে তিনজন সঙ্গিনীসহ বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া পদব্রজে গুপ্তিপাড়া গিয়া ট্রেনে উঠিলাম..."।[৬৪] ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে চন্দ্রনাথ তীর্থে গিয়ে তিনি সেখানকার পাণ্ডাদের পরীক্ষা করতে চান-

> ... সূর্য্যকুণ্ডেও দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। আমি পাণ্ডাদের চাতুরী ভাবিয়া ঘটি ঘটি জল দিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলাম। পাণ্ডাজী একটী দিয়াশলাইয়ের কাটী দ্বারা তৎক্ষনাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন।[৬৫]

অথচ এই রাজলক্ষ্মী দেবীকেই দেখি একলা বাড়ির বাইরে যেতে কুণ্ঠিত থাকতে-

> আন্দাজ বাংলা ১৩১২ সালে মাঘ মাসে পবিত্র নবদ্বীপধামে গৌরাঙ্গ প্রভুর মহোৎসব দর্শনে যাইবার বাসনায় তিনটী টাকা অঞ্চলে বাঁধিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। এই প্রথম বাড়ি হইতে তীর্থদর্শনে বাহির হওয়া। বাড়িতে আবদ্ধ থাকার জন্য পথে ও তীর্থ দর্শনে বাহির হওয়ার অভ্যস্থ হই নাই, সেই জন্য পাড়ার লোকে জানিতে পারিবে ভাবিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিছুই সঙ্গে লইলাম না। পরিধানে একখানি বস্ত্র, গায়ে একখানি এণ্ডী ও হরিনামের মালা এই সম্বলে বাহির হইলাম।[৬৬]

শিক্ষিতা, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিতা হয়েও রাজলক্ষী দেব্যাকে স্বাধীনভাবে তীর্থে যেতে পুরুষশাসিত সমাজের অনুশাসনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পুরুষদের লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে এই ধরণের কথন নজিরবিহীন। তাই তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে পুরুষ লেখক এবং মহিলা লেখকদের রচনার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বুঝতে বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনিগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

সিদ্ধান্ত

উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে একটি বিশেষ রাজৈনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে বাংলার তীর্থকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ কাহিনি লেখার সূত্রপাত ঘটে। সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাবে এই রচনাগুলি তীর্থভ্রমণমূলক আখ্যায়িকাতে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলার ঐতিহ্য ও গৌরব প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের অংশ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি এই রচনাগুলি তীর্থভ্রমণে মহিলাদের অবস্থানকেও স্পষ্ট করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১। দাশগুপ্ত শান্তিকুমার, *ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*, মুখুটি হরিবন্ধু সম্পাদিত, কলিকাতা দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স, ১৩৬১, পৃ. ২১১

২। ওই, পৃ. ২৫১

৩। চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্র, *পালামৌ*, বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫১

৪। *রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত*, কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেস, ১৩১৫, পৃ. ৫৬, ৬৮

৫। দাশগুপ্ত দময়ন্তী সংকলিত, *আমাদের বেড়ানো আমাদের লেখা, আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত ৩য় পর্ব*, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৯, পৃ. ২৬

৬। বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ, *ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত*, কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪, পৃ. ১

৭। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাপদ, *দার্জিলিঙ্গ-প্রবাসীর পত্র*, সরকার অভিষেক সম্পাদিত, কলকাতা, পার্চমেন্ট, ২০১৮, পৃ. ৪৩

৮। Smith George, *The Life of William Carey Shoe-maker and Missionary*, London, J.M. Dent & Sons, 1909, Pp. 206-207

৯। Morinis E. Alan., *Pilgrimage in Hindu Tradition: A case study of West Bengal*, Delhi, OUP, 1984, p. 12

১০। Ibid, p. 13-14

১১। Ibid, p. 16

১২। বন্দ্যোপাধ্যায় তাপস, *শক্তিপীঠের উৎসের খোঁজে*, সপ্তডিঙা, কালীপুজো সংখ্যা, ১৪২৫

১৩। Morinis E. Alan, *Pilgrimage in Hindu Tradition: A case study of West Bengal*, Delhi, OUP, 1984, p. 27

১৪। Ibid, p. 30

১৫। Ibid, p. 32

১৬। Ibid, p. 34

১৭। Ibid, p. 35

১৮। Gupta Swarupa, *Notion of Nationhood in Bengal, Perspective on Samaj, C. 1867-1905*, Leiden Boston, BRILL, 2009, p. 95

১৯। শাস্ত্রী শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ঘোষ বারিদবরণ সম্পাদিত, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০০৭, পৃ. ২০৫

২০। ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ, *বঙ্গভঙ্গ: স্বদেশী: বিপ্লববাদ*, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৬, পৃ. ১৭

২১। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, *পরিষৎ-পরিচয়*, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ১

২২। সরকার সুমিত, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৩, পৃ. ১০৬

২৩। ওই, পৃ. ১০৬

২৪। ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ, *বঙ্গভঙ্গ: স্বদেশী: বিপ্লববাদ*, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৬, পৃ. ১৮

২৫। বসু নগেন্দ্রনাথ, *মুখবন্ধ*, জয়নারায়ণ ঘোষাল, *কাশীপরিক্রমা*, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৩

২৬। ওই

২৭।, বসু নগেন্দ্রনাথ, *ভূমিকা*, সর্বাধিকারী যদুনাথ, *তীর্থভ্রমণ*, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২

২৮। বসু নগেন্দ্রনাথ, *ভূমিকা,* সেন বিজয়রাম, *তীর্থ-মঙ্গল,* কলকাতা, পরশ পাথর, ২০০৯

২৯। অধিকারী হরকিশোর, *ভূমিকা, চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য,* চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৬

৩০। রায় সুরেন্দ্রনাথ, *ভূমিকা,* রায় মহেন্দ্রচন্দ্র, *বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ ও সাধু জীবনী,* কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০

৩১। রায় মহেন্দ্রচন্দ্র, *দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন, বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ ও সাধু জীবনী,* কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০

৩২। রায় মহেন্দ্রচন্দ্র, *বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ ও সাধু জীবনী,* কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০, পৃ. ৪

৩৩। ওই, পৃ. ৪

৩৪। ওই, পৃ. ৪৩

৩৫। ওই, পৃ. ১

৩৬। ওই, পৃ. ৩

৩৭। অধিকারী হরকিশোর, *নিবেদন, চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য,* চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৬

৩৮। সেন নবীনচন্দ্র, *ভূমিকা,* অধিকারী হরকিশোর, *চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য,* চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৬

৩৯। ওই, পৃ. ১৩৪

৪০। ওই, পৃ. ১৪৩

৪১। ওই, পৃ. ১৪৫

৪২। ওই, পৃ. ২২২

৪৩। চট্টোপাধ্যায় সূর্য্যকুমার, *উপক্রমণিকা, কালীক্ষেত্র দীপিকা,* কলকাতা, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ প্রকাশিত, ১৮৯১

৪৪। ওই

৪৫। ওই, পৃ. ৪২

৪৬। ওই, পৃ. ৪৯

৪৭। ওই, পৃ. ৫০

৪৮। চক্রবর্তী জটিলবিহারী, *মুখবন্ধ,* ধর কন্দর্পনারায়ণ অনূদিত, *শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর মাহাত্ম্য,* কলকাতা, জটিলবিহারী চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩১৫

৪৯। ওই

৫০। মুখোপাধ্যায় ত্রিষ্টুপ প্রণীত ও সম্পাদিত, *সংকল্প, দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা,* কলকাতা, বি এন সরকার এণ্ড কোং, ১৩৩৪

৫১। ওই, পৃ. ৩-৪

৫২। ঘোষ পঞ্চানন, *ভূমিকা, কুলিয়ার পাট,* কুলিয়া, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৫

৫৩। ধর গোষ্ঠবিহারী, *ভূমিকা, সচিত্র তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী, প্রথম ভাগ,* কলকাতা, দি বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ১৯১৩

৫৪। ওই, পৃ. ২

৫৫। দাস বীরেন্দ্রনাথের, *ভারতের তীর্থযাত্রা বা ভারতের সমস্ত তীর্থস্থানের বর্ণনা,* গয়া, মাধপ্রসাদ বর্ম্মণ প্রকাশিত, ১৩৩৬ পৃ. ২৬

৫৬। ওই, পৃ. ২৬

৫৭। দেবী আনন্দময়ী, *অবতরণিকা, গুরুর কৃপায় তীর্থদর্শন,* সুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত, ১৯১০

৫৮। ওই, ভূমিকা

৫৯। দেবী আনন্দময়ী, *অবতরণিকা, গুরুর কৃপায় তীর্থদর্শন,* সুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত, ১৯১০, পৃ. ২

৬০। ওই, পৃ. ১৩

৬১। ওই, পৃ. ১৩

৬২। ওই, পৃ. ১

৬৩। গুপ্ত জয়তী, *মুখবন্ধ*, রাজলক্ষ্মী দেব্যা, *কেদার বদ্‌রী ভ্রমণ-কাহিনী ও অন্যান্য তীর্থচিত্র*, , কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫

৬৪। রাজলক্ষ্মী দেব্যা, *কেদার বদ্‌রী ভ্রমণ-কাহিনী ও অন্যান্য তীর্থচিত্র*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ৭৮

৬৫। ওই, পৃ. ৮১

৬৬। ওই, পৃ. ৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমান বাঙালির তীর্থভ্রমণ কাহিনির জগৎ: কর্তব্য ও গৌরবের কথা

বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনির একটি বিশেষ অংশ হল ইসলামি তীর্থ- প্রধানত হজ-কেন্দ্রিক তীর্থভ্রমণ কাহিনি। মূলত বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে এই ধারার তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি বেশি করে লেখা হতে শুরু করে। বাঙালি মুসলমানের লেখা এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি সংখ্যায় কম হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে নতুন গড়ে উঠতে থাকা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের চিন্তা-চেতনার স্পষ্ট ছাপ এই সকল তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে বর্তমান।

বাংলার মুসলমান সমাজ

বাংলার মুসলমান সমাজের উদ্ভব ও বিস্তারের প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত ঘটেছিল মধ্যযুগে।

> মুসলমানদের ভারত বিজয় থেকে ইংরাজদের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালকে ভারতের মধ্যযুগ ধরা হয়। কম বেশী এই সময়ের ব্যবধানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলা দেশে মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।[১]

রাজনৈতিক কারণে মধ্যযুগের নানা সময়ে মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ দিল্লি থেকে এসে বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং মিশে গিয়েছিলেন স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে। অনেক ঐতিহাসিক বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসেবে শুধুমাত্র হিন্দু নিম্নবর্ণ সমাজের মানুষের ধর্মান্তরকেই চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু এটিই একমাত্র কারণ ছিল না। বরং ওয়াকিল আহমদের মত উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে যে-

> শাসক সৈনিক বণিক ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিকসূত্রে জাত মিশ্র রক্তধারার মানুষ- এই

> ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন গঠন ও বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল।[২]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাঙালার মুসলমান সমাজের ধর্মীয় রীতি-আচারগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নবাবি সময়ে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের ধারাটি যথেষ্ট পুষ্ট হয়েছিল। নবাবের পরিবারে এবং অভিজাত মুসলমান পরিবারে বেশ কয়েকটি লৌকিক হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান গৃহীত হয়েছিল। মতিঝিল প্রাসাদে শাহমত জঙ্গ ও সউলত জঙ্গ এবং মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজ হোলি উৎসব পালন করতেন। তাছাড়া "মীরজাফরও হোলিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তে দেবী কীর্তীশ্বরীর পাদোদক পান করতে সংকোচ বোধ করেননি"।[৩] এছাড়া নবাব পরিবারের অনেকেই সাড়ম্বরে ভেলা ভাসান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তাছাড়াও বাংলার মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যবাদের প্রবেশ ঘটেছিল।

> ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিত্তিক চতুর্বর্ণের ভেদরীতি কেবল নাম পালটিয়ে আশরাফ, আতরাফ, আজরাফ, আরজল প্রভৃতি নাম গ্রহণ করেছে। সমাজের মানুষের মধ্যে এই শ্রেণী ভেদ প্রধানতঃ 'খানদান' বা রক্তধারা দিয়ে নির্ণীত হয়েছে।[৪]

উচ্চবিত্ত সমাজের পাশাপাশি গ্রামীণ মুসলমান সমাজেও অনেক ধরনের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। মাণিক পীর, বদর পীর, পাঁচ পীরের উপাসনা, দরগা তৈরি, কবরপূজা, মানত করা সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রচুর সংখ্যক হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিক্রিয়াতে বাঙালার মুসলমান সমাজে তাদের প্রতিরূপ গড়ে উঠেছিল।

> যেমন হিন্দু বনদুর্গার প্রতিপক্ষ মুসলমানের বনবিবি ফাতেমা, বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের রূপান্তর গাজীপীর ও কালি শাহ, মৎস্যেন্দ্রনাথের মুসলমান সংস্করণ পীর মসন্দলি, সত্যনারায়ণের প্রতিরূপ সত্যপীর।

> শীতলা, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবদেবী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পূজ্য ছিল।[৫]

বাংলায় প্রাথমিকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল মূলত সুফী ভাবধারার সাধক-দরবেশদের মাধ্যমে। এঁরা ইসলামের

> আনুষ্ঠানিক দিকটা উপেক্ষা করেছিলেন। যে বিস্তৃত জনসমষ্টিকে এঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন তাঁরাও ইসলাম সম্মত সকল আচার অনুষ্ঠানকে জীবনে গ্রহণ করেননি।[৬]

পরবর্তী সময়ে ইরানে সাফাভি বংশের পতনের পরে (১৭৩৬) অনেক সুফী মতাবলম্বী সাধক ভারতে চলে আসেন। তাঁদের কেউ কেউ বাংলাতে বসবাস শুরু করেন। ফলে বাংলার মুসলমান সমাজে সুফী মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে। সুফী পীরদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মনে করে হত। তাঁদের অসাধারণ চরিত্র, সরলতা, অনাড়ম্বর জীবনযাপন সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করত। এই সুফী পীরদের সাধনাস্থল- 'খানকা'গুলি দরিদ্র, সন্ন্যাসী, ভ্রমণকারীদের আশ্রয় দিত। জীবদ্দশায় তাঁরা জনহিতকর কাজের জন্য সকলের ভক্তিভাজন হয়ে উঠতেন। তাই মৃত্যুর পরে তাঁদের দরগাগুলি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তীর্থে পরিণত হয়ে যায়। তাঁদের কবরে সৌধ নির্মাণ, শিরনি মানত করা, আতর গোলাপ জল দেওয়ার প্রথা তৈরি হয়।

জগদীশনারায়ণ সরকার তাঁর *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)* বইটিতে মুসলমান সমাজে প্রচলিত অনেকগুলি আচারের উল্লেখ করেছেন যেগুলি হিন্দু-মুসলমান সমাজের সমন্বয়ের ফল। তিনি অনেকগুলি জায়গাকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন-

> চব্বিশ পরগণায় হাড়োয়া গ্রামে ধর্মান্তরিত হিন্দু বৈষ্ণব গোরাচাঁদের নামে যে মসজিদ বা আস্তানা আছে তাহা হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের তীর্থস্থান। ঘুটিয়ারী শরীফে পীরগাজী মুবারক আলির দরগা ও মসজিদও হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তীর্থস্থান। ... গোবরডাঙ্গায় 'ওলাবিবির স্থানও এক বিখ্যাত পীঠস্থান। ওলা দেবী মারাত্মক বিসূচিকা রোগের দেবী বলিয়া ভীত মুসলমানগণ তাঁহাকে 'ওলাবিবি' রূপে পূজা করিয়া থাকে। 'ওলা' শব্দও বিশুদ্ধ হিন্দু শব্দ।[৭]

এছাড়াও জগদীশনারায়ণ বাংলা ও বিহারের নানা জায়গায় জাঁকজমকপূর্ণ মহরমের তাজিয়ার উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ তাজিয়ার শোভাযাত্রা হিন্দু সমাজের প্রভাব বলেই মনে করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও মুয়াজ্জমপুরের শাহ লঙ্গরের দরগাতে পয়গম্বর মহম্মদের 'কদম রসুল' (পদচিহ্ন) দেখতে তীর্থ যাত্রীদের সমাগম, হিন্দু তীর্থস্থানের মতো কোন ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে দরগাতে অনুষ্ঠিত মেলাতে বহু মানুষের আগমন ইত্যাদি প্রথাকে তিনি 'লোকপ্রিয় ইসলামের বৈশিষ্ট্য' হিসেবে দেখিয়েছেন।[৮] এই ভাবে উনিশ শতক পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ নিজস্ব মিশ্রসত্ত্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। এই ধারণার সমর্থন মেলে রফিউদ্দীন আহমেদের লেখাতে। তিনি মনে করেছেন উনিশ শতকে ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে বাঙালি মুসলমান সমাজ ছিল খানিকটা 'মিশ্রসত্ত্ব' প্রকৃতির।[৯] এই প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের নেতৃত্বে নানা ধরনের সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

উনিশ শতকের বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। বৃটিশ শাসনে প্রথম সেন্সাস হয়েছিল ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে। "১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট

অনুযায়ী ... শতকরা হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৮.৮%"।[১০] জনসংখ্যার হার একই রকম থাকলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তখনও গড়ে ওঠেনি। এর নির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল।

১৭৫৭-এর পরবর্তী সময়ে মুসলমান বাঙালি অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মধ্যযুগে অভিজাত বাঙালি মুসলমান নির্দিষ্ট কয়েকটি পেশার সঙ্গেই যুক্ত থাকতেন। সেগুলি ছিল নবাবের সেনাবাহিনীতে সামরিক পদ, বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত উচ্চপদ, রাজস্বব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত পদ এবং প্রশাসনিক স্তরে নানা ধরনের নিয়োগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে পেশার এই ক্ষেত্রগুলি বাঙালি মুসলমানদের কাছে সংকুচিত হয়ে যায়। প্রথমত ১৭৫৭ সালের পরে বাংলার নবাবের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং এক সময়ে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে "নবাবের আশ্রিত কর্মচারী, সভাসদ, জায়গীরদার ও অনুগৃহীতেরা সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন"।[১১] দ্বিতীয়ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালেই সামরিক বাহিনীকে নতুন করে গঠন করা হয়। সেখানে মুসলমান বাঙালির পেশাগত সুযোগ কমে যায়। তৃতীয়ত কোম্পানি প্রবর্তিত নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় জমিদার বাঙালি মুসলমান। নবাবী আমলের প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করেন লর্ড হেস্টিংস এবং লর্ড কর্নওয়ালিস। এক্ষেত্রে তাঁরা "একটা সুষ্ঠু ও সমন্বিত পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেন। একশালা, পাঁচশালা, দশশালা এবং পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ভূমি ও ভূমিস্থ প্রজার মালিক হন। ... এর সাথে 'সূর্যাস্ত আইন' নামে একটি আইন যুক্ত হয়"।[১২] এই আইনের ফলে বাংলার পুরোনো হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছোট-বড় জমিদারেরা বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে সেই জমিদারি নিলাম হয়ে যেত। অধিকাংশ সময় এগুলি

কিনে নিতেন কলকাতার নতুন বিত্তবান হিন্দু শ্রেণি। কারণ কোম্পানির সঙ্গে নানা ধরনের ব্যবসার সূত্রে যুক্ত থাকার কারণে নগর কলকাতায় সে সময়ে একটি অর্থবান হিন্দু সমাজ গড়ে উঠেছিল। তাছাড়াও এই নতুন ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্তরে বৃটিশদের নিয়োগে বাঙালি মুসলমানের কাজের সুযোগ কমতে থাকে। চতুর্থত ১৮২৮ খ্রিষ্টব্দে প্রচলিত হয় 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন'-এর ফলে নবাবি আমলে 'লাখেরাজ' বা নিষ্কর সম্পত্তি ভোগের বিশেষ সুবিধা বিলুপ্ত হতে থাকে। এতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু আয়ের অন্য উৎসগুলি প্রায় বন্ধ হতে থাকায় বাঙালি মুসলমান সমাজে এর প্রভাব ছিল গভীর। পঞ্চমত,

> শরীফ মুসলমানদের শেষ অবলম্বন ছিল রাজভাষা ফারসী। আদালতে ফারসী ভাষা চালু থাকায় বিচার বিভাগে অনেকে চাকুরীতে নিযুক্ত হতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক (১৮৩৩-১৮৩৮) ফারসীকে রহিত করে ইংরাজীকে রাজভাষা করেন (১৮৩৭)। মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তী কালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও মুসলমান ছাত্ররা ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহ দেখায়নি। ফলত বিচার বিভাগে তাদের চাকুরীর ভিত ভেঙে পড়ে।[১৩]

বাঙালি মুসলমান সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ইংরাজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহের জন্য। ইংরেজি ভাষা বা জাতির প্রতি বিদ্বেষ নয়, এর কারণ ছিল অর্থনৈতিক। উনিশ শতকে বাঙালির আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে। নবাবি আমল থেকেই ব্যবসা ও মহাজনি কারবারে বাঙালি হিন্দু শ্রেণি এগিয়ে ছিল। এই শ্রেণির অনেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত নানা লেনদেনের জন্য দোভাষী, দালাল, ঠিকাদার, মহাজন, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, সরকার, দেওয়ান মুনশী ও কেরানীর কাজ করতেন এবং কলকাতা ও তার

সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করতেন। তাই এঁরা অন্য বাঙালিদের তুলনায় আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও ইংরেজি শিক্ষার সুবিধা আগাম পেয়েছিলেন। তাছাড়াও

> কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান হেতু হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী পায়ে হেঁটে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে। এসব জেলা হিন্দু প্রধান অঞ্চল ছিল, ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকে অধিক পরিমাণে কলিকাতায় সমবেত হয়েছে। দূরবর্তী জেলাগুলিতে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশী। শহরে যাতায়াত ও অবস্থান করার মতো আর্থিক অবস্থা যাদের ছিল সাধারণতঃ তারাই শহরমুখী হয়েছে। মুসলমানের অধিকাংশ সংখ্যা ছিল কৃষিজীবী, চাকুরীজীবী খুব কম ছিল। ... ভূমির স্থায়ী আর্থিক নির্ভরতা ত্যাগ করে মুসলমানগণ শহরের অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেনি।[১৪]

অথচ কলকাতা ছিল ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্র। ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর প্রধান উদ্দেশ্য

> "… to promote the study of Arabic and Persian Languages and of Muhammadan Law, with a view more especially to the production of qualified officers for the Courts of Justice.[১৫]

কিন্তু দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে ইংরাজি শেখানোর ব্যবস্থা ছিল না। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি হিন্দুরা হিন্দু কলেজে ইংরেজি শেখার সুযোগ পেলেও অনেক দিন পর্যন্ত মুসলমান ছাত্রেরা তা থেকে বঞ্চিত থাকত। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলীতে কলেজ স্থাপিত হয়। সেখানেও ইংরেজি বিভাগে মুসলমানের ছাত্রের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সম্ভবত ইংরেজি শিক্ষার ব্যয়ভার এই

পরিস্থিতি তৈরি করেছিল- "আর্থিক সঙ্গতির অভাবই বাঙালী মুসলমানের ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল"।[১৬] সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে কলকাতা ও বেশ কয়েকটি জায়গায় মিশনারিদের উদ্যোগে তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ধর্মান্তরের ভয়ে এখানে মুসলমান ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল কম।

এই প্রেক্ষাপটে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোপানি দেশীয়দের মধ্যে শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষিতদেরই সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করার প্রথা চালু করে। ফলত নানা প্রকারের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষায় এগিয়ে থাকা হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান বাঙালি পিছিয়ে যায়। এ কারণে উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের উন্মেষ দেরিতে শুরু হয়েছিল।

বাংলার মুসলমান সমাজের পতনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ওয়াকিল আহমেদ লিখছেন-

> ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত ন্যূনাধিক এই পঁচিশ বছর মুসলমান সমাজের পতনের চূড়ান্ত কাল ছিল। এ সময় পর্যন্ত সমাজ ছিল কাণ্ডারী শূন্য। ... এ দিকে হিন্দু সমাজের গতি প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রামমোহন রায়ের মতো শক্তিধর নেতা আবির্ভূত হয়ে শতাব্দীর গোড়ার দিকেই সমাজের মানুষকে আধুনিক জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ ও সচকিত করে দিয়েছিলেন। ... হিন্দু কলেজের ইংরাজী শিক্ষা সমাজের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। ... কলিকাতায় হিন্দুগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন; কলিকাতার নগর জীবনের সুযোগ সুবিধা তাঁরাই বেশী পরিমাণে লাভ করেন। ইংরাজদের সংসর্গে ও সহযোগিতায় চাকুরী ও ব্যবসা করে তাঁরা অর্থের মালিক হন, তাঁরাই জমিদারী কিনে প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। ... এঁদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী

> গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন ... আবার নবীনপন্থী প্রগতিশীল মানুষও ছিলেন। ... এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে সমাজ এগিয়ে যায়। ... সুতরাং হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও ভিন্নধর্মী ছিল।[১৭]

উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালি সমাজে সংস্কার আন্দোলন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলমান বাঙালির নতুন যাত্রা শুরু হয়। এর সূচক হিসেবে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল লতিফের 'মেহোমেডান লিটারীর সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাকে চিহ্নিত করতে পারা যায়। তবে এই ঘটনা আলোচনার আগে কয়েকটি আন্দোলনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যেগুলি বাংলার মুসলমান সমাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বাঙালি মুসলমান সমাজে ইসলামকেন্দ্রিক এই সংস্কার আন্দোলনগুলির মাধ্যমে 'বাঙালি মুসলমানি সত্তা'র বিকাশের কাজটি শুরু হয়েছিল।

> গ্রামীণ মুসলমান কৃষকদের মধ্যে অ-ইসলামীয় ধ্যানধারণাকে বাতিল করে শরিয়তিকরণের প্রচেষ্টার ফলে তাদের সামাজিক সংগঠন দৃঢ় হয়। এই আন্দোলনগুলি এক ধরনের সমষ্টিগত ঐক্যের বোধও সঞ্চারিত করতে পেরেছিল। যার ফলে বাংলার আজলাফ বা কৃষক সমাজও শরিফ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র কল্পনা করতে পারত।[১৮]

সৈয়দ আহমদ বেরিলভী ভারতের মুসলমান সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রায়বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীতে শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে তিনি টংকের নবাবের চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবার দিল্লি ফিরে আসেন মুসলমান সমাজের সংস্কার আন্দোলনের জন্য। তাঁর লক্ষ ছিল "ভারতীয় মুসলমানদের সকল প্রকার কুসংস্কার ও অনৈসলামিক ভাবধারা থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায়

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত করে তিনি বহু সংখ্যক লোককে নিজের মতবাদে দীক্ষিত করেন"।[১৯] ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় এসে তিন মাস অবস্থান করেন। তাঁর প্রধান চার শিষ্যের মধ্যে তিন জনের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলা।

সাধারণত সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর আন্দোলন ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। আরবে মুহম্মদ আব্দুল ওয়াহাব প্রবর্তিত আন্দোলনের সঙ্গে বেরিলভীর সংস্কার আন্দোলনের কিছু মিল ছিল বলে এই নামকরণ করা হয়েছিল। মূল ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক মুহম্মদ আব্দুল ওয়াহাব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে আরবে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আগত যে সব প্রভাব ইসলামকে তার আদি রূপ থেকে বিচ্যুত করে তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনি"।[২০] বেরিলভীও প্রাথমিকভাবে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রধানত ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল বাংলা থেকে।

অপর একটি সংস্কার আন্দোলনের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পশ্চিম বাংলায় এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন মৌলভী নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তিনি হজ করতে যান এবং ফিরে এসে মুসলমান সমাজের সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেন। "পীর মানা, মাজার তৈরি করা, মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা এবং মুহররম উৎসবে যোগদান করা মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলে তিতুমীর ঘোষণা করেন"।[২১] যদিও ১৮৩০ পরবর্তী সময়ে তিতুমীরের সামাজিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে বিদ্রোহের প্রকৃতি দেখে বোঝা যায় যে তাঁর মূল আগ্রহ ছিল প্রচলিত ইসলাম ধর্মের সংস্কারসাধন।

বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে তিতুমীরের আন্দোলনের কাছাকাছি সময়ে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে অপর একটি সংস্কার আন্দোলন দেখা দেয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন সাধারণ ভাবে ফারায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিত। হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তাঁর পুত্র মুসিনুদ্দিন আহমেদ বা দুদু মিয়া ছিলেন এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা। কৃষক ও কারিগর শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে এই আন্দোলন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সংস্কার আন্দোলনের মূল কথা ছিল "একনিষ্ঠভাবে কুরআন শরীফের নির্দেশ পালন এবং কুরআন বহির্ভূত সকল আচার অনুষ্ঠান বর্জন করা"।[২২]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগের এই সংস্কার আন্দোলনগুলি ইসলাম পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উনিশ শতকেরই দ্বিতীয়ভাগে বাঙালি মুসলমান সমাজে মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)। মহাবিদ্রোহের পরে মুসলিম ভারতের চিন্তার জগতে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। মহাবিদ্রোহের যাবতীয় দায় যখন ভারতীয় মুসলমানদের উপর এসে পড়ে তখন এই ধারণার বিরোধিতা করেন তিনি। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর লেখা *রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমান* বইয়ে সেই বিরোধী ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

> ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের ক্রোধ প্রশমিত করার পর স্যার সৈয়দ আহমদ এবারে স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করলেন। এই আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক লাভ করা এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিকার লাভ করা। ... ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'Translation Society'-র প্রতিষ্ঠা করেন।[২৩]

তিনি তাঁর পত্রিকায় ভারতীয় মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে বিশেষ ভাবে আহ্বান জানান।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মুসলমান সমাজে জামালুদ্দীন আফগানীর ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সম্পর্কে আনিসুজ্জামান লিখছেন-

> স্বাধীনতার মিত্র ও স্বেচ্ছাচারিতার এত বড় শত্রু সেকালের মুসলিম জাহানে আর দেখা দেননি। তাঁর ভাবধারার প্রভাবে তুরস্ক, মিশর ও পারস্যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল আর এই প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল আফগানিস্তান এবং ভারতবর্ষে।[২৪]

জামালুদ্দীন 'প্যান-ইসলামবাদে'র ধারণা প্রচার করেছিলেন। এই ধারণা ভারতেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি ভারতের হায়দরাবাদে চলে আসেন। যদিও এর আগে তিনি দু'বার ভারতে এসেছিলেন। বৃটিশ সরকার দীর্ঘদিন তাঁকে কলকাতায় 'অন্তরীন' করে রেখেছিল। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্যে তিনি প্যারিস থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে ভারতে ইংরেজ শাসন পদ্ধতির সমালোচনা করা হয়। জামালুদ্দীন আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উৎসাহ দিয়ে ছিলেন। এই চর্চাকে তিনি মনে করেছিলেন ইসলামের মৌলিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এখানেই রয়েছে ওয়াহাবীদের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মুসলমান বাঙালি সমাজে নবাব আব্দুল লতিফের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন ফরিদপুরের লোক। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করে তিনি বৃটিশ সরকারের অধীনে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৮৫০-এর পরবর্তী সময় থেকেই তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসারের বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তিনি মনে

করতেন এর জন্য ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মূলত তাঁর উদ্যোগেই হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং সেখানে মুসলমান ছাত্রদের পড়ার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়াও ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'মেহোমেডান লিটারীর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটির প্রধান কাজ ছিল "আলোচনা ও রচনাপাঠের মাধ্যমে বাংলার মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয়দান এবং নিজেদের চিন্তাধারার উন্নতি ও বিকাশসাধন"।[২৫]

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে উচ্চশিক্ষিত মুসলমান নেতাদের এই উদ্যোগের কারণে বাঙালি মুসলমানের আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। তাছাড়াও উনিশ শতকের এই সময়ে বাংলার কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত মুসলমানের সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকেও কিছুটা সক্ষম হয়ে উঠেছিল। কেননা উনিশ শতকের শেষে পাটের বাড়তি চাহিদার কারণে পাটচাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর

> পাটের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মূলত মুসলমানপ্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গের চাষীরাই মিটিয়েছিলেন। ... সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের হাতে কিছু পয়সা এসেছিল এবং তাদের মধ্যে সন্তান-সন্ততির শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল এমন অনুমান করা যায়। ... ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙালী মুসলমানদের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ দেখা দিল আগের চেয়ে বেশি এবং এই শিক্ষার প্রসার হতে না হতেই তাদের পক্ষ থেকে সরকারি চাকরীর অংশ দাবী করা হল।[২৬]

উনিশ শতকের শেষে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান বাঙলি সমাজ তাঁদের পরিচয় নির্মাণে তৎপর হয়েছিল। এই সময়ে

> নিজেদের অখণ্ড সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনার যে বোধ মুসলমান বাঙালি মধ্যশ্রেণির মধ্যে তৈরি হতে থাকে তার মূলে আক্রমণাত্মক হিন্দু

> জাতীয়তাবাদ থেকে সুসংবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয় তাগিদের পাশাপাশি উপনিবেশের শাসন নীতিরও ভূমিকা ছিল।[২৭]

বাঙালি মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আত্মপরিচয় নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা সাহিত্য রচনার মধ্যে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। তাই উনিশ শতকের শেষ দিকে মহম্মদের জীবনী, নবীদের জীবনী সংক্রান্ত বই প্রকাশিত হতে শুরু করে। এর পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনে ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসমূলক রচনা। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে লেখা ইসলামি তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিকেও এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ এখানে স্পষ্টভাবেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় তৈরির প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

মুসলমান বাঙালির তীর্থভ্রমণ কাহিনি

বিশ শতকের শুরুতে ইসলামি তীর্থকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ কাহিনি রচনার উৎসাহ লক্ষ করা যায়। এই ধারার তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তীর্থ হিসেবে হজকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি বইয়ে আজমীরের উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায়। মুসলমান বাঙালির লেখা এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় থেকেছে- ক) বাংলা থেকে বহুদূরে অবস্থিত ইসলামি তীর্থ সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য-তালিকা দিয়ে তীর্থভ্রমণ কাহিনির মাধ্যমে ভবিষ্যতের যাত্রীদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির মাধ্যমে তীর্থযাত্রাকে পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। খ) ইসলামের 'স্বর্ণযুগ'-এর কীর্তি দেখে বা স্মরণ করে এক ধরনের গৌরব বা 'পবিত্র' অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায় এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে। তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

ক) মুসলমান বাঙালির লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হজকেন্দ্রিক। বাংলা থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই তীর্থের সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য-তালিকা দিয়ে তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনা করেছেন অনেক লেখক। এর মাধ্যমে তাঁরা ভবিষ্যতের যাত্রীদের সুবিধা করে দিয়ে তাঁদের হজে যেতে উৎসাহিত করেছেন। একই সঙ্গে এই ধরনের তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে প্রায়শই দেখা যায় যে লেখক হজকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন তাঁরা। হাজী মৌলভী এয়ার মোহাম্মদ প্রণীত *হজ্জ বিবরণ ও ছফরনামা* এই ধরনের একটি রচনা বইটির প্রথমেই 'এস নাদের আলী, বি.এল., সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম হজ্জ কমিটি'-এর লেখা 'অভিমত' শিরোনামের একটি অংশ আছে। সেখানে এই বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানানো হচ্ছে—

> মোছলেম সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থস্থান মক্কা ও মদিনা শরিফ। বঙ্গবাসী অনেক মোছলেম সন্তানই ঐ সকল তীর্থে গমন করেন বটে, কিন্তু ভাষা বৈষম্যহেতু প্রায় অধিকাংশেই উহার আচার ব্যবহার রীতি নীতি এবং ক্রিয়াকলাপাদি যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারে না। ... জনাব মৌলভী হাজী এয়ার মোহাম্মদ সাহেব বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক 'হজ্জ বিবরণ ও ছফরনামা' বাহির করিয়াছেন। বহিখানি হজ্জ্ব যাত্রীর পক্ষে যষ্ঠিস্বরূপ হইয়াছে।[২৮]

'অভিমত' লেখকের দাবি মতো লেখকও নানা বিষয়ের সন্নিবেশে তাঁর রচনাকে হজযাত্রীর 'যষ্ঠি' হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

সম্পূর্ণ বইটি 'বাড়ি হইতে যাত্রা', 'বোম্বাই', 'বোম্বাই হইতে পোর্ট সৈয়দ', 'আদন', 'মিশর ভ্রমণবৃত্তান্ত', 'মদিনা যাত্রা', 'মদিনা হইতে মক্কা শরিফ যাত্রা' প্রভৃতি শিরোনামযুক্ত অংশে

বিভক্ত। সেখানে লেখক সাল-তারিখ এবং সময়ের উল্লেখ করে তাঁর যাত্রাপথের বিবরণ হাজির করেছেন-

> গত ১৯১৪ ইং সনের (১৩২০ বাং) ১৫ই জুন অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় বাড়ীস্থ স্বজন পরিজন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ... ১৭ই জুন রাত্রি ৮টার সময় গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কলকাতা ফারমে উপস্থিত হইলাম।[২৯]

একইরকম ভাবে তিনি তাঁর 'আদান বন্দর থেকে 'লোহিত সাগরে' স্টিমার-যাত্রার বর্ণনাও দিয়েছেন। কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া, দামেস্ক হয়ে লেখক প্রথমে মদিনা পৌঁছেছিলেন। লেখক তাঁর বইটিতে মদিনার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট বিবরণ হাজির করেছেন-

> মদিনা শরিফ উত্তর দক্ষিণে লম্বা। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুমান দেড় দুই মাইলের অধিক হইবে না। সহরের চতুঃপার্শ্ব প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। রওজা মোবারক ও রছুল করিমের মসজিদ পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত। উক্ত মসজিদে অনুমান ১০/১২ হাজার লোক একত্রে নামাজ পড়িতে পারে।[৩০]

মক্কার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি মদিনা থেকে মক্কার পথের মঞ্জিলগুলির তথ্য দিয়েছেন-

> মদিনা শরিফ হইতে মক্কা শরিফ পর্য্যন্ত ১০টী মঞ্জিল (স্টেশন) আছে। বখশিস অধিক পাওয়ার আশায় উষ্ট্রচালকগণ উহাকে ১২টি মঞ্জিলে বিভক্ত করিয়েছে। ... মক্কা শরিফের চারিদিকে যে হেরম শরিফ অবস্থিত, তাহার ৩৯টি দরজা আছে। আমি মক্কা শরিফে উপস্থিত হইয়া প্রথম 'বাবে বনিশয়রা' দরজার নিকট পৌঁছিলাম।[৩১]

লেখক এর পরে কত তারিখে কোন কোন 'মছজিদ ও পবিত্র জায়গাসমূহ' দেখেছেন তার তালিকা দিয়েছেন। এছাড়া লেখক হজের এহরাম বন্ধন, আরফার দিবস আরফাত মাঠের সীমার ভিতর এক মুহূর্তকাল অপেক্ষা করা, '১০ই জেলহজ্জ হইতে ১২ই জেলহজ্জের মধ্যে

তওয়াফে জেয়ারত করা', হজের পাঁচটি 'ওয়াজেব', সাতটি 'ছুন্নত' প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।[৩২] তাছাড়াও বইটিতে হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য 'হজ্জের প্রবাস ও স্বজন পরিজন হইতে বিদায়ের নিয়ম', 'ছফামারওয়ায় দৌড়িবার নিয়ম', 'মক্কা শরিফের কোন কোন স্থান দর্শনীয় তার তালিকা' দেওয়া হয়েছে।

এইভাবে নিজের হজযাত্রার বিবরণের মাধ্যমে লেখক 'বঙ্গবাসী' হজযাত্রীদের তথ্যসমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। এই তথ্যকে ব্যবহার করে তাঁদের হজযাত্রাকে সার্থক করতে চেয়েছেন। বইটির ভূমিকাস্বরূপ 'অভিমত' অংশের লেখকের ধারণা 'ভাষা বৈষম্যহেতু' অধিকাংশ মুসলমান বাঙালি হজের যথাযথ আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জানতেই পারেন না। ফলে তাঁদের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই অসুবিধা দূরীকরণে কোন 'গাইড বুক' নয়, নিজের হজের অভিজ্ঞতাকেই সরাসরি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছেন লেখক। ফলত বইটির উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই যাত্রীদের হজের 'আচার ব্যবহার রীতি নীতি এবং ক্রিয়াকলাপাদি' সম্পাদনে সুবিধা করে দেওয়া এবং তাঁদের তীর্থযাত্রায় উৎসাহী করা।

শুধুমাত্র যাত্রার তথ্য নয়, বইটির শেষ অংশে লেখক 'হজ্জের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী' শীর্ষক একটি অংশ সংযোজিত করেছেন। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হজের নিয়মকে 'প্রত্যেক ধর্মভীরু মোছলমানের গোচরীভূত' করা। এখানে হজযাত্রীকে কোন কোন আচার পালন করতে হবে তার তালিকা দেওয়ার পাশাপাশি হজ যে 'ফরজ' বা একান্ত কর্তব্য- তা কাদের উপর বর্তায়- সেই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন- "১। ইছ্লামত্ব— কেবল মোছলমানের উপর হজ্জ ফরজ, ২। স্বাধীনতা— গোলাম ব্যতীত স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তির উপর হজ ফরজ, ৩। জ্ঞান— পাগল ব্যতীত জ্ঞানীর উপর হজ ফরজ" ইত্যাদি।[৩৩]

মুসলমান বাঙালির লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থভ্রমণ কাহিনি হল খান বাহাদুর আহছান উল্লা প্রণীত *হেজাজ ভ্রমণ*। বইটি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে মুদ্রিত এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের লেখক আহাছান উল্লা ছিলেন তাঁর সমকালে সম্মাননীয় ব্যক্তি- 'বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের এসিষ্টেন্ট ডিরেক্টর, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য'।

হেজাজ ভ্রমণ বইটির ভূমিকা অংশে লেখক জানাচ্ছেন যে—

> ...আমার কতিপয় বন্ধু হজ্জ সম্পাদনের জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে। তাহাদের অনেকেই হেজাজের রাস্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পথি মধ্যে কি কি বস্ত্র অত্যাবশ্যক এবং হজ্জ্ সম্পাদন কত দিনে সম্ভব জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। তাহাদেরই অনুরোধক্রমে এই 'হেজাজ ভ্রমণ' লেখা আবশ্যক হইয়াছে। আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সেই উদ্দেশ্যে রোজনামচা আকারে প্রকাশিত হইল। ভ্রমণকালে কোথায় কোন কালে কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে যেন সকলে তা সহজেই অনুমান করিতে পারেন।[৩৪]

অর্থাৎ লেখক তাঁর হজযাত্রার কাহিনি লিখেছেন আরব যাওয়ার রাস্তা সম্পর্কে 'অনভিজ্ঞ', হজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণাবিহীন বাঙালিদের নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল করতে।

বইটি 'ডায়েরি' আঙ্গিকে লেখা হয়েছে। প্রাত্যহিকের নানা ঘটনার বিবরণের মধ্যেই লেখক হজ সম্পর্কে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে গিয়েছেন। সিন্ধু প্রদেশে মরু অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেখানকার রুক্ষ প্রকৃতি, বিরল জনবসতির কিম্বা বিচ্ছিন্ন বনভূমিতে ময়ূর হরিণের কথা যেমন উল্লেখ করেছেন তিনি, সেরকম ভাবেই বাংলার লোকের পক্ষে মরু প্রদেশের আবহাওয়া কেমন কষ্টকর তার উল্লেখও রয়েছে। যাত্রাপথের বর্ণনা ছাড়াও মক্কা

পৌঁছে তিনি হজের যে যে নিয়ম পালন বা কৃত্য সম্পাদন করছেন সে বিবরণও এখানে দেওয়া হয়েছে-

> অদ্য প্রাতে ৫টার সময় মক্কা মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইলাম। .... তৎপর মোয়াল্লেমের সহিত 'লাব্বায়েক' ও নির্দিষ্ট দোয়া পড়িয়া হাজরে আছওয়াদ তাজিমের সহিত চুম্বন করিলাম ও উক্ত হাজরে আছওয়াদকে বামদিকে রাখিয়া ডান দিক হইতে যথাক্রমে সাতবার খানায়ে কাবা তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিলাম। ... তওয়াফান্তে মোকামে এব্রাহিমে দুই রেকাত নামাজ আদায় করিলাম। ... নামাজান্তে চাহে জমজমে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় কেবলামুখী হইয়া কয়েক দমে অতিশ্রদ্ধার সহিত জম জম পান করিলাম।[৩৫]

হজের বিভিন্ন নিয়মের পাশাপাশি যাত্রীদের কোন কোন জিনিস সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে তারও তালিকা দিয়েছেন লেখক-

> করাচী হইতে তিন মাসের উপযোগী চাউল, ডাইল, আটা ও মসলাদি খরিদ করিয়া একটী বস্তার মধ্যে আবদ্ধ করিলাম। একটী লোহার চুলা, একটি ষ্টোভ, এরহামের জন্য একখানা ভাল নয়নসুখ কাপড়, কাগজী লেবু, চাটনী, ইছফগোল... ও তেঁতুল সঙ্গে লইলাম। ...বিস্কুট, জাম, জেলী ও সাবান ক্রয় করিলাম। ...মধ্যাহ্নকালে তপ্ত বালুকা বায়ু প্রবাহে চক্ষে আসিয়া পড়ে। উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চক্ষু রক্ষক চশমা ক্রয় করিলাম।[৩৬]

জেদ্দাতে যে পানীয় জলের সংকটের কারণে সমস্যা হতে পারে সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এর বাইরে লেখক আলাদা করে 'মদিনা শরিফ', 'রওজা শরিফ', 'আরববাসীদিগের আতিথেয়তা', 'হাজরে আছওয়াদ', 'হাতিম', 'মকামে ইব্রাহিম', 'চাহে জমজম', 'গোলাফে কাবা' বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন বা প্রায় টীকা ধরনের অংশ রচনা করে দিয়েছেন।

হজযাত্রা কেন্দ্রিক অপর একটি তীর্থভ্রমণ কাহিনি হল মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা-এর লেখা *ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। বইটি সম্পূর্ণ নাম *ভ্রমণ বৃত্তান্ত অর্থাৎ আরব (হেজাজ), সিরিয়া (শাম), বয়তুল মোকদ্দস (জেরুসালম), মিসর (ইজিপ্ট) এবং বোগদাদ ভ্রমণ ও দর্শন*। এটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে 'চট্টগ্রাম. কক্সবাজার হইতে' প্রকাশিত হয়েছিল।

সম্পূর্ণ *ভ্রমণ বৃত্তান্ত* বইটি পাঁচটি পর্বে বিভক্ত। এর প্রথম অংশটির নাম 'আরব ভ্রমণ'। এই অংশেই হজে যাওয়ার বিবরণ দিয়েছেন লেখক- "হজ্জ যাত্রা এবং সম্মানিত পবিত্র নগরী মক্কা-মদিনার দর্শন ও ভ্রমণের সমস্ত বিবরণ লেখা হইল"।[৩৭] হজ্জ যাত্রীদের সুবিধার জন্য লেখক এখানে যাত্রার সম্ভাব্য খরচ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত' বইটিতে সব থেকে বেশি পরিমাণে হজকে অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে দেখানো হয়েছে।

লেখক তাঁর আরব ভ্রমণের বিবরণের অংশে হজকে ঈশ্বরের 'আদেশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, পাশপাশি হজের পারমার্থিক ফলের উল্লেখ করেছেন-

> পরম করুণাময় খোদাতালার ৫ম আদেশ প্রতিপালনার্থ এই ভ্রমণ [হজ] করা হইয়া থাকে। ... তিনিই বলিয়াছেন আমার লোকান্তর গমনের পর যে ব্যক্তি আমার সমাধি দর্শন করিবে, তাহার এইরূপ বরকত (সমৃদ্ধি) লাভ হইবে যে সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় দর্শন করিল।[৩৮]

তাছাড়াও মদিনার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক যা বলেন তাতে হজকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হয়-

> হজ্জব্রত সমাপনের পর পবিত্র মদিনা দর্শন করা উচিত। কেননা যিনি পাপীগনের অন্তিমের কাণ্ডারী, যাঁহার অনুরোধাকূল্যে আমরা স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইতে পারিব বলিয়া ভরসা আছে ... তাঁহার সমাধি দর্শন করা মুসলমানের একান্ত কর্তব্য কর্ম্ম।[৩৯]

লেখক মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা এই বইটি রচনার কারণ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন হজের তীর্থস্থানগুলিতে ভ্রমণ করতে 'ধর্ম্মপ্রাণ' ব্যক্তির ইচ্ছা থাকলেও জায়গাগুলি অবস্থা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তাঁরা 'ভীরুতা প্রদর্শন করেন', আবার অনেকে এই 'তীর্থ পর্য্যটন' করেও অনভিজ্ঞতার কারণে 'রোগে শোকে জীর্ণ-শীর্ণ' হয়ে পড়েন'- এই দুই দলের ভয়, আশঙ্কা বা অনভিজ্ঞতা দূর করতেই লেখক এই বই লিখছেন। তিনি আরও বলছেন যে এই বইটি থেকে হজে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা 'গৃহে বসিয়া' তীর্থস্থান সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

হজকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে লেখক হজে যাওয়ার আগে পালনীয় কৃত্যের তালিকা দিয়েছেন এখানে। জানিয়েছেন যে হজের সংকল্প করার আগে 'তৌবা করা', ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে 'উৎপীড়িত' মানুষদের সন্তুষ্ট করা, যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করা এবং যাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব হজযাত্রীর উপর ন্যস্ত আছে তাঁদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করেই হজে যাওয়া কর্তব্য। এছাড়াও লেখক মনে করেছেন যে হজযাত্রীর পক্ষে 'ওয়াছিয়ৎনামা লিখিয়া যাওয়া' উচিত।[৪০] পাশাপাশি এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে

অসৎ উপায়ের উপার্জন বা 'সন্দেহের ধন' ত্যাগ করে শুধুমাত্র 'বৈধ উপার্জনের ধন'কে হজের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।[৪১]

'হজ্জব্রত সমাপন' এর পরে কোন্ কোন্ কৃত্য করা আবশ্যক সেটাও জানিয়েছেন লেখক-

> ৭ম জেলহজ্জ তারিখে জোহরের নামাজের পর কাবা মন্দিরে প্রথম খোতবা পাঠ করা হয়। তাহাতে হজ্জের সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা থাকে। ইহা শ্রবণ করা সোন্নত। ... ৮ম তারিখ দিবা ৪টার সময় এহরাম বন্ধনপূর্ব্বক উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া পবিত্র আরফার ময়দানে গমন করিতে হয়। ... ৯ম জেহজ্জা ব্রত সমাপনের সময়।[৪২]

১৩৫২ হিজরী অর্থাৎ ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের হজ উপলক্ষে 'হজযাত্রী বাঙ্গালী মুসলমানদের সুবিধার' জন্য *রহবরে হোজ্জাজ* নামের বহু তথ্যপূর্ণ একটি আরবী বইয়ের বাংলা অনুবাদ করা হয়। বইটির নাম *হজ্জদর্পণ*। অনুবাদকের নামহীন বইটিতে হজযাত্রাকে অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি এ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এবং বিভিন্ন খরচের হিসাব দিয়ে যাত্রীদের মানসিক, আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে যাত্রীদের হজযাত্রায় উৎসাহী করেছেন। বইটির প্রথমেই 'মুসলমানের পঞ্চম রুকন বা স্তম্ভ হজ্জের ফরজ অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকা' প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হজকে বিশেষভাবে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে-

> ... গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে বাঙ্গালার মুসলমানগণ এই অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য হজ্জকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। ...হজ্জর জন্য শরিয়ত এই রূপ শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে যে মানুষের নিকট যেন অর্থ থাকে এবং রাস্তাও যেন নিরাপদ হয়। বস্তুত বর্তমানে রাস্তাঘাট সকল দিক

দিয়াই নিরাপদ। ... ফল কথা প্রত্যেক অবস্থাপন্ন মুসলমানের এখন একান্ত কর্ত্তব্য যেন তিনি আপন প্রতিপালকের ঘরে হজ্জ করিতে আর নিজের প্রিয় রসুলের মসজিদে নামাজ পড়িবার জন্য প্রস্তুত হন।[৪৩]

লক্ষণীয় বইটির উদ্দিষ্ট পাঠক- হজকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে ভুলতে বসা 'বাঙ্গালার মুসলমানগণ'। বইটির 'হজ ও তাহার পুণ্য' অংশে হজ যে ইসলামের পঞ্চম রুকন বা 'স্তম্ভ' এবং অবস্থাপ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য হজ্জ 'ফরজ কাজ' সে বিষয়টি প্রতিপাদনের জন্য একাধিক শাস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে- "পবিত্র কোরাণের বহু আয়াতে ও সহী হদীদের বহু স্থানে হজ্জের পুণ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে এবং মুসলমানদিগকে হজ্জের জন্য উদ্বোধিত করা হইয়াছে।"[৪৪] এছাড়াও বইটিতে 'হজ্জের কল্যাণ' অংশে সাত প্রকারে কল্যাণের উল্লেখ করে হজযাত্রায় উৎসাহিত করার চেষ্টা রয়েছে- "১। হাজী আপন বিশাল মুসলমান সমাজের ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখিবার ও তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া থাকেন।... হজ্জের সময় নামাজাদিতে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়" ইত্যাদি।[৪৫]

এইভাবে হজের পারমার্থিক বিষয়গুলি আলোচনার পরে বইটির পরবর্তী অংশে 'হাজীদের আরামের সুব্যবস্থা', 'মোটরগাড়ির ব্যবস্থা', 'থাকিবার ঘরের কথা', হাজীদের বিভিন্ন কমিটির কথা, 'হাজীদের প্রতি স্বাস্থ্যগত উপদেশ', চিকিৎসার ব্যবস্থা, পোষ্ট অফিস টেলিগ্রামের ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যবহারিক তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য-সন্নিবেশের উদ্দেশ্য দূরবর্তী, ভিন্নভাষা ব্যবহারকারী তীর্থস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালিদের অনেকটাই সাহায্য করা। তবে এই বইটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে এখানে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ হজযাত্রার সম্ভাব্য খরচের তালিকা, বাজার-দর ইত্যাদি তথ্যও দেওয়া হয়েছে। এর

মাধ্যমে মুসলমান বাঙালিদের দূরদেশে হজযাত্রার স্বল্পব্যয় সম্পর্কে যথাযথ তথ্য দিয়ে আর্থিক দিক থেকেও উৎসাহিত করা হয়েছে।

মুসলমান বাঙালির লেখা অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থভ্রমণ কাহিনি হল আল্-হাজ্জ খানবাহাদুর মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর লেখা *মোসলেম কীর্ত্তি ও ইস্‌লাম জগতের সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। যদিও বইটির প্রকাশকাল এই গবেষণা নিবন্ধের আলোচ্য সময়সীমার সমাপ্তিসূচক সাল ১৯৩৩-এর দু' বছর পর- ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ। কিন্তু এখানে লেখকের ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়াও বিষয়বস্তুর কারণে বইটির আলোচনা এখানে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

মোসলেম কীর্ত্তি ও ইস্‌লাম জগতের সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত এর প্রথমেই লেখকের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে তিনি তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে তাঁর 'পাশ্চাত্য ভ্রমণবৃত্তান্তের রোজনামচা' বই আকারে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। যদিও তাঁর লেখাতে 'পাশ্চাত্যের ভ্রমণবৃত্তান্ত' নেই। কারণ হজের পরেই তিনি 'পিতামাতা ও মুরুব্বিয়ানদের কদমবুচি ও কবর জেয়ারত করা'র জন্য বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তাই 'ইউরোপ ভ্রমণের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সাময়িকভাবে চাপা' পড়ে গিয়েছিল।[৪৬] এই 'আকাঙ্ক্ষা' শুধু ইউরোপকে দেখার আকাঙ্ক্ষা নয়। এর মধ্যে বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রসারিত ইসলামের প্রতি এক ধরনের গর্বও রয়েছে-

> ... বহুদিন যাবৎ আমি এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম যে, ... আমি ভারতবর্ষের বাহিরে পারস্য, ইরাক, মেসোপটেমিয়া, শ্যাম, প্যালেস্টাইন, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশে মুসলমানদিগের... যে পবিত্র স্থান আছে তাহা জেয়ারত করিব এবং ইউরোপ যাইয়া ইংলণ্ডের ওকিং

মসজিদে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত জমাতে কোন এক ঈদের নামাজ আদায় করিয়া আমার জীবন সার্থক করিব।[৪৭]

বৃহত্তর ইসলামী জগতের মধ্যে বাঙালি মুসলমান হিসেবে নিজেকে উপলব্ধি করার আগ্রহ এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটি প্রথম অংশে লেখক কলকাতা থেকে কোয়েটা যাত্রার বিবরণ আছে। সেখানে যেমন 'Travellers Cheque' এর সুবিধার কথা জানানো হয়েছে তেমনি রয়েছে বালুচিস্থানের বাসিন্দাদের বিবরণ—

এখানকার লোকের চেহারা উজ্জ্বল ও সুন্দর এবং আকৃতি দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। এঁদের পানে তাকালেই মনে হয় এঁরা বিশেষ স্বাস্থ্যবান ও কর্ম্মঠ। এখানে অভিজাত গৃহের মেয়েরা বোরকা পরিধান করে।[৪৮]

বইটির পরবর্তী অংশে 'পারস্য', 'তেহরান', 'হামদান' ভ্রমণের বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইরাকের ভ্রমণের কথা অংশে তিনি 'বোগদাদের ঐতিহাসিক বিবরণ' দিয়েছেন। এই সূত্রে লেখক প্রায় মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। তাছাড়া এই অংশে আছে শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের পরিচয় ও 'সিরিয়া'র বিবরণ। জেরুজালেম ও মিশরের ইতিহাসও পাঠকদের জানিয়েছেন লেখক।

বইটির ষষ্ঠ অধ্যায় 'আরব'-এ রয়েছে লেখকের হজের বিবরণ। এই বিবরণে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, লেখকের আত্মপরিচয়ের ধারণার ক্ষেত্রে সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য –

২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া ছোট নৌকা যোগে জিদ্দাহ্ কাষ্টম্ হাউসের সম্মুখে পৌঁছিলাম। ... এখানে যাত্রীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ মোয়াল্লেমের নাম বলিতে হয়.... এখানে

যাত্রীদের সহিত ভাল ব্যবহার ত করা হয়ই না... ছাগ ভেড়ার মত দুর্ব্ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং 'তোম' 'তোম' শব্দে কথা বলা হয়।[৪৯]

লেখক এই ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই প্রতিবাদের ভাষা লক্ষণীয়—

...হাম হিন্দুস্থান সে আতেহেঁ। ...হাম ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কা রায়ত হোঁ। তোম লোগ যেয়ছা ব্যাদবী করতে হো হাম যব হিন্দুস্থান পৌঁছেঙ্গা ওছ ওয়াকত ইয়ে ছব বাতিঁ মেরে গবর্ণমেন্ট কো এতলা করোঙ্গা।[৫০]

এখানে লক্ষণীয় যে লেখক নিখিল বিশ্বে প্রসারিত ইসলামের অংশ হতে পেরে গর্বিত। একই সঙ্গে তিনি নিজের 'ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কা রায়ত' অথবা 'হিন্দুস্থান'বাসী পরিচয়েও গৌরববোধ করছেন।

হজ সম্পর্কে খানবাহাদুর মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী তাঁর বইটিতে সব ধরনের নিয়ম ও তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'হিন্দুস্থানের হজ্জ্বযাত্রীগণকে জিদ্দাহ্ বন্দরে' পৌঁছে বিটিশ ভাইস্ কনসালের অফিসে কি কি কর্তব্য, জেদ্দা থেকে মদিনার পথের 'কাওয়াখানা'র কথা ইত্যাদি। তাছাড়াও তিনি হজের সময়ে দেখা ধর্মীয় সৌধগুলিরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন-

...হজরত মোহাম্মদে (দঃ) এর দেহত্যাগের পর তাঁহার সমাধিস্থান নির্দ্ধারণ বিষয়ে বহু বাদানুবাদের পর হজরত আবুবকর সিদ্দিক এই মীমাংসা করিলেন যে, তিনি জীবদ্দশায় যে স্থানকে অধিক প্রিয় মনে করিতেন সেই স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইবে। ...মোহাম্মদ (দঃ) কে তাঁহার প্রিয়তম সহধর্ম্মিনী বিবি আয়েশার গৃহে সমাধিস্থ করা হয়। হজরত মোহাম্মদের সমাধিস্থানকে 'রওজা মোবারক' বলে।[৫১]

একইরকম ভাবে তিনি ‘হেবেম শরীফ’-এর কথাও বলেছেন। তাছাড়াও লেখক কাবার সহস্ত অঙ্কিত ম্যাপসহ তার বিবরণ দিয়েছেন-

> কাবা বাইশ হাত দৈর্ঘ্য, বাইশ হাত প্রস্থ এবং বাইশ হাত উচ্চ কাল বর্ণের বড় বড় পাথরে তৈয়ারী একখানা গৃহ। ইহা সমতল ছাদযুক্ত। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে দুই হাত উত্তর দিকে প্রবেশের একটি মাত্র দরওয়াজা আছে। দরওয়াজার কপাট রৌপ্য নির্ম্মিত”।[৫২] তার লেখাতে পৌরাণিক বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে। মক্কাতে গিয়ে ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতে হজযাত্রীদের দৌড়ের কারণ হিসেবে বিবি হাজরা ও তাঁর শিশুপুত্র ইছমাইলের (আঃ) পৌরাণিক গাথা বলেছেন তিনি। এই সূত্রে আবেজমজম পৌরাণিক বৃত্তান্তও উল্লেখিত হয়েছে।[৫৩]

এছাড়াও লেখক ইসলামের ইতিহাস বলেছেন কখনও কখনও।

খানবাহাদুর মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর লেখাতে গুরুত্বের সঙ্গে হজের নানা নিয়ম বা কৃত্য উপস্থাপিত হয়েছে। মক্কাতে পৌঁছে লেখক এহরামের বিষয়ে বিবরণ দিয়ে গিয়ে তিনি লিখেছেন-

> ... এখানে (জোল হায়ফা) দুই রাকাতে নফল নামাজ পাঠ করিয়া হজ্জযাত্রীগণকে এহরাম বাঁধিতে হয়। ... ‘এহরাম’-এর পর মাত্র দুইখানা সেলাই বিহীন কাপড় ব্যবহার করিতে হয়। তন্মধ্যে একখানা পরিধান করতঃ অপরখানা গায়ে দিয়া মাথা খালি রাখিতে হয়। ... এহরাম বাঁধিবার পর গাত্রে মশা মাছি বসিলে মারা নিষেধ। ‘এহরাম’-এর নিয়তের পর শরীরের লোম উঠান বা রক্ত নির্গত হওয়াও নিষেধ। উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে হজ্জ্ব সমাপ্তির পর প্রত্যেক লঙ্ঘিত

নিয়মের জন্য এক একটী বকরী বা দুম্বা কোরবাণী করিতে হয়।
...এহরামে নিয়ত দুই প্রকার। ... ওমরা নিয়ত... ও কেরাণ।[৫৪]

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জাতীয়তাবাদের বিকাশ গতিলাভ করেছিল। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হজযাত্রা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধর্মীয় রীতি বা আচারের গণ্ডি ছাড়িয়ে হজ মুসলমান বাঙালির ঐক্যবদ্ধ চেতনা নির্মাণ প্রকল্পের অংশ হয়ে ওঠে। তাই মুসলমান শিক্ষিত বাঙালি তাঁদের লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিতে হজযাত্রা বিষয়ে বার বার উৎসাহ দিয়েছে।

হজযাত্রার মাধ্যমে মুসলমান বাঙালি বৃহত্তর ইসলামি জগতকে জানার, ইসলামি কীর্তিকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। আর এর ফলেই তৈরি হয়েছে 'গৌরবময় ইসলামি ইতিহাসে'র প্রতি গর্ববোধ। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে এই ইতিহাসচেতনা বিশেষভূমিকা পালন করেছিল। সম্ভবত একারণে হজকে ধর্মীয় কর্তব্য পালনের পাশপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করা হতে থাকে। আর তাই ভৌগোলিকভাবে বাংলা থেকে বহুদূরবর্তী অজানা দেশে, প্রায় অজানা পথে, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে হজযাত্রীদের হজযাত্রায় উৎসাহিত করতে একাধিক তথ্য ও হজের নিয়মসম্বলিত বই প্রকাশ শুরু হয়।

খ) মুসলমান বাঙালির লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে ইসলামের 'স্বর্ণযুগ' সম্পর্কে এক ধরনের গৌরবের অনুভূতি সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদের লেখা *আজমীর ভ্রমণ*। বইটির সম্পূর্ণ নাম *আজমীর ভ্রমণ: আগরা ও দিল্লীর চিত্র এবং তাপসবরের জীবনী সম্বলিত*।[৫৫] এটিই

লেখকের প্রথম বই ছিল না। এর আগে তিনি *এসলামের প্রভাব ও ধর্ম্মনীতি* এবং *মোসলেমতত্ত্ব* শিরোনামের অন্য দুটি বই রচনা করেছিলেন।

আজমীর ভ্রমণ বইটি রচনার কারণ হিসেবে লেখকে জানাচ্ছেন-

> আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব নাই। নানা মাসিক পত্রিকাতেও নিত্য ভ্রমণ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। তবে আবার আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রের এই 'আজমীর ভ্রমণ'-এর আবশ্যকতা কি?... আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, যে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলির অধিকাংশই হিন্দু লেখকগণের দ্বারা লিখিত। যদিও আজি কালিকার হিন্দু লেখকগণ পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্কিমবাবু প্রমুখ হিন্দু লেখকগণের ন্যায় সংকীর্ণমনা নহেন বরং উদারভাবে মোসলেম্ সভ্যতার উৎকর্ষ প্রমাণে যথেষ্ট যত্নশীল, তথাপি এ বিষয়ে মুসলমান লেখকগণের দুই একখানা গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে পারে আমি প্রধানতঃ তাহাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছি।[৫৬]

লেখকের এই উক্তি বিশেষভাবে বিবেচ্য। তাঁর মনে হয়েছে ভ্রমণ কাহিনির লেখক হিন্দু হলে সেখানে হিন্দুর সন্তুষ্টির ভ্রমণস্থলগুলিই প্রাধান্য পাবে। মুসলমানের আগ্রহের জায়গাগুলি অনুল্লেখিতই থেকে যাবে। তাই হিন্দু লেখকের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে মুসলমান বাঙালি হিসেবে তাঁর ভ্রমণ কাহিনি লেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদ এই উক্তির মাধ্যমে হিন্দু ভ্রমণ কাহিনি লেখকদের মধ্যে দু'টি ভাগ করেছেন- উদারমনা 'আজি কালিকার [বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক] হিন্দু লেখকগণ' এবং বঙ্কিমের সমকালীন 'সংকীর্ণমনা' হিন্দু লেখক। তাঁর এই বিভাগ তৈরির

কারণ হল বঙ্কিম-সমকালীন হিন্দু লেখকদের তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে মুসলমান ইতিহাসকে উপস্থাপনের ভঙ্গি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

> ... হিন্দু মধ্যশ্রেণির আলোকায়ন সঞ্জাত র‍্যাশনালিটির কারণে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে মোঘল যুগের তুলনায় যেমন যুক্তিগ্রাহ্য বা সদর্থক হিসেবে গ্রহণ করেছিল তেমনই জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে স্বজাতির প্রতিপক্ষ হিসেবে ইসলাম এবং মুসলমানকে স্থাপন করছিল।[৫৭]

এই প্রবণতা সে সময়ের হিন্দু বাঙালির লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিতেও উঠে এসেছে। সেখানে জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে মুসলমান শাসনের পূর্ববর্তী সময়কে 'সুবর্ণ সময়', গৌরবের বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর বিপ্রতীপে মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদ যখন ভ্রমণ কাহিনি লিখছেন তখন তিনি মুসলমান বাঙালির দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তাঁর রচনায় 'মোসলেম্ সভ্যতার উৎকর্ষ' প্রমাণের বাড়তি তাগিদ থাকছে।

এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় *আজমীর ভ্রমণ* বইটির ভূমিকার পরবর্তী অংশে-

> বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আজমীর শরীফের সুপ্রসিদ্ধ দরগাহ পাক জেবারত (দর্শন) করিয়াছেন। এবং বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যেও যাঁহারা পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন উপলক্ষ করিয়া আজমীরে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজমীরের সুপ্রসিদ্ধ দরগাহ দেখিয়াছেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কেহ ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন — অথবা যে বিরাট মহাপুরুষ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই পবিত্র স্থান আপনার অলৌকিক পুণ্য প্রতিভায় আলোকিত করিয়া জীবনের শেষে এই স্থানেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে

— তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায়... আলোচনা করিয়া কোন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া আমি অবগত নহি।[৫৮]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যে লেখক মুসলমানের গৌরবময় 'প্রকৃত ইতিহাস'- যা লেখা হয়নি- তাকে তুলে ধরতে এই বই লিখছেন।

আজমীর ভ্রমণ বইটি 'আজমীরের পথে', 'আজমীরের পথে আগরা', 'আজমীর শরীফ' এবং 'আজমীর হইতে প্রত্যাগমন'- এই চারটি পর্বে বিভক্ত। মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদ ১৩২৭ বঙ্গাব্দের পূজার ছুটিতে ১১ জনের দল নিয়ে আজমীর ভ্রমণ করেছিলেন। বইটির নানা অংশে সেই যাত্রার বিবরণ রয়েছে। তাছাড়াও লেখক এখানে জামা মসজিদ, তাজমহল, সেকেন্দ্রা, দেওয়ান-ই-আম, ফতেপুর সিকরীর ইতিহাস, নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে গিয়েছেন। তাজমহলের কথা বলতে তিনি বিদেশী কবি, পর্যটকদের উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন। মূল গন্তব্য আজমীরের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি হিন্দু পাণ্ডা এবং মুসলমান মোয়াল্লেমের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন-

... হিন্দু তীর্থ পুষ্কর আজমীরের অতি নিকটেই। ...স্টেশনটি হিন্দু পাণ্ডা এবং মুসলমান মোয়াল্লেম (পাণ্ডায়) সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু মুসলমান মওয়াল্লেমগণ হিন্দু পাণ্ডাদের মতো যাত্রী লইয়া কাড়াকাড়ি করেন না। তাঁহারা যাত্রীদের হস্তে একটি পুষ্প দান করেন। ... একজন মওয়াল্লেমের নিকট কোন যাত্রী পুষ্পগ্রহণ করিলে অপর মওয়াল্লেমগণ তাঁহাকে আর বিরক্ত করেন না।[৫৯]

এছাড়াও বইটিতে লেখক খাজা মঈনুদ্দীনের জীবন, তাঁর সমাধিভবন, তারাগড়, বড়পীর সাহেবের চেল্লা, প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন। বইটির 'পরিশিষ্ট' অংশে তিনি 'আজমীর যাত্রীদের প্রতি উপদেশ' শিরোনামে একটি অংশও সংযোজন করেছেন, যেখানে এই

তীর্থভ্রমণে ইচ্ছুক যাত্রীদের সুবিধার জন্য নানা তথ্য- হাওড়া থেকে আজমীরের রেলভাড়া, যাত্রার সময়-দিন, কোথায় ট্রেন বদলাতে হবে, বিভিন্ন শহরের সরাইখানায় খাবারের খোঁজ, 'আজমীর শরীফে'র খাদিমদের ব্যবহার- যাবতীয় বিষয় জানিয়েছেন। কিন্তু তীর্থভ্রমণ কাহিনির এই সকল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি বইটিতে ইসলামের গৌরবময় অতীতের প্রতি আবেগ মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তীর্থদর্শনের পবিত্র অনুভূতির সমগোত্রীয় ইসলামের অতীত গৌরব স্মরণের এই অনুভূতি।

বইটির শুরুর দিকে লেখকের একটি মন্তব্যে সেই অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়-

> বহুকাল হইল এসলামের সুবর্ণযুগ অতীত হইয়াছে। যখন মোসলেম বীরবৃন্দের বীরনাদে... সমস্ত পৃথিবী বিকম্পিত হইত, যখন মোসলেম বিজ্ঞানীগণের বিশ্বজয়ী প্রতিভায়... মানবজাতির বর্ত্তমান অধিকাংশ সুখের উপাদান প্রস্তুত হইয়াছিল, যখন মোসলেম কবিবৃন্দের কলকণ্ঠের মধুর তরঙ্গ লহরীতে পৃথিবীময় নৈতিক আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল... এসলামের সে সুখের দিন... বহুকাল হইল কালগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তথাপি ইতিহাস পরিত্যক্ত বহু ঘটনার স্মৃতি সমূহের কঙ্কাল চিহ্ন সকল আজও তীর্থস্থানরূপে বিরাজিত আছে। ...ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনেক তীর্থস্থান আছে, তন্মধ্যে... আজমীর নগরে তাপস-কুল-রত্ন হজরত শাহ খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী সিঞ্চরী সাহেবের পবিত্র সমাধি বর্তমান।[৬০]

অর্থাৎ লেখকের আজমীর যাত্রা শুধু তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে নয়, ইসলামের যে 'সুবর্ণযুগ' সম্পর্কে তাঁর গৌরব রয়েছে- এই যাত্রায় সেই ইতিহাসকেও স্পর্শ করতে চেয়েছেন তিনি।

মুসলমান বাঙালির ভ্রমণমূলক রচনাতে 'ইসলামের স্বর্ণযুগ' বিষয়ে গৌরবের প্রকাশ অন্যত্রও দেখতে পাওয়া যায়। রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা তাঁর 'আপন হতে বাহিরে: আত্মপরিচয়ের খোঁজ ও মুসলমান বাঙালির দুটি ভ্রমণ আখ্যান' প্রবন্ধে মতীয়র রহমানের 'প্রবাসের স্মৃতি' বইটি আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে লিখছেন-

> ভ্রমণকারী হিসেবে পূর্ব ইতিহাস খোঁজের আনন্দ তাঁদের [মুসলমান বাঙালি লেখক] এমন বিহ্বল করে তুলেছে যে ইতিহাসের 'অবজেক্টেভিটি'-র তুলনায় সেই 'অতীত' এক ধরনের রোমান্টিক উচ্ছ্বাস প্রকাশই তাঁর ভ্রমণের মূল হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে এই অতীত অন্বেষণ বা নির্মাণ সে সময় মুসলমান বাঙালির ব্যক্তি বা সমষ্টিগত সত্তা নির্মাণে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই কারণে ভ্রমণকাহিনিতে বিশেষ স্থানের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর ইতিহাস বর্ণনা জরুরী হয়ে পড়ে। এমনই নিদর্শন মিলবে মতীয়র রহমানের 'প্রবাসের স্মৃতি'তে। লেখক ভ্রমণকারী হিসেবে যে যে দ্রষ্টব্যস্থানে গেছেন তার উল্লেখের পরক্ষণেই অতীত ভ্রমণ বা স্মৃতি লোকে যাত্রা করেছেন। ... রোমান্টিক পিছুটান বা নস্ট্যালজিয়া নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালির একটি অনিবার্য প্রবণতা। পাণিপথ, দিল্লি প্রভৃতি দর্শনে এই উচ্ছ্বাসের বিবরণ রয়েছে।[৬১]

সিদ্ধান্ত

নানা ধরনের সংস্কার আন্দোলন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে গড়ে উঠতে থাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালি সমাজ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছিল সেই সূত্রেই-

> অতঃপর ১৮৮২ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যবর্তীসময়ে প্যান-ইসলামি চিন্তাধারা প্রসারের জন্য বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যে পিউরিটানিক

> ও রূপকথাভিত্তিক প্রভাব ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে পরবর্তী পর্যায়ে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯০৫ সাল থেকে খেলাফৎ আন্দোলন (১৯২০-'২২) পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্যান- ইসলামি ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার দৃঢ় প্রকাশ লক্ষণীয়।[৬২]

এই চিন্তা চেতনার প্রকাশ মুসলমান বাঙালি লিখিত তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির মধ্যেও প্রকাশিত। তীর্থভ্রমণ ও তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনা ধর্মীয় পরিসরের সীমা অতিক্রম করে মুসলমান বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধান এবং ঐক্যবদ্ধ চেতনা নির্মাণের বিশেষ অংশ হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূ

১। আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা (১ম খণ্ড),* নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৪

২। ওই, পৃ. ৪

৩। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮),* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, , ২০০০, পৃ. ৩৪

৪। আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা (১ম খণ্ড),* নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩, পৃ. ১৫

৫। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮),* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃ. ৩৫

৬। ওই, পৃ. ৩৪

৭। সরকার জগদীশনারায়ণ, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ),* কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৮, পৃ. ৩৮

৮। ওই, পৃ. ৪৪

৯। Ahmed Rafeuddin, *The Bengal Muslims (1871-1906): A Quest for Identity*, Delhi, Oxford University Press, 1996

১০। আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা (১ম খণ্ড),* নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৪

১১। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮),* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃ. ৩০

১২। আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা (১ম খণ্ড),* নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৩৮

১৩। ওই, পৃ. ৪০

১৪। ওই, পৃ. ৩২

১৫। ওই, পৃ. ৩৪

১৬। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, , ২০০০, পৃ. ৪৪

১৭। আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা (১ম খণ্ড)*, নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৪৩

১৮। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, *ভূমিকা, আপন হতে বাহিরে: মুসলমান বাঙালি সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নির্বাচিত রচনা সংকলন*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০২২, পৃ. ১৪

১৯। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃ. ৪৮

২০। ওই, পৃ. ৪৮

২১। ওই, পৃ. ৫১

২২। ওই, পৃ. ৫২

২৩। ওই, পৃ. ৬৭

২৪। ওই, পৃ. ৭১

২৫। ওই, পৃ. ৭৬

২৬। ওই, পৃ. ৭৯

২৭। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, *ভূমিকা, আপন হতে বাহিরে: মুসলমান বাঙালি সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নির্বাচিত রচনা সংকলন*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০২২, পৃ. ১৪

২৮। নাদের আলী এস, অভিমত, মৌলভী হাজী এয়ার মোহাম্মদ, *হজ্জ বিবরণ ও ছফরনামা,* চট্টগ্রাম, ১৩৩২

২৯। ওই, পৃ. ২

৩০। ওই, পৃ. ৬৩

৩১। ওই, পৃ. ৬৬

৩২। ওই, পৃ. ৮০

৩৩। ওই, পৃ. ৮৭

৩৪। আহছান উল্লা খান বাহাদুর, *ভূমিকা, হেজাজ ভ্রমণ,* চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩১

৩৫। ওই, পৃ. ৭৬

৩৬। ওই, পৃ. ৯

৩৭। বদরুদ্দোজা মোহাম্মদ, *নিবেদন, ভ্রমণ বৃত্তান্ত,* চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৩২৩

৩৮। ওই, পৃ. ৮

৩৯। ওই, পৃ. ৩৫

৪০। ওই, পৃ. ১২

৪১। ওই, পৃ. ১২

৪২। ওই, পৃ. ৩০

৪৩। *ভূমিকা, হজ্জদর্পণ, রহবরে হোজ্জাজের বঙ্গানুবাদ,* কলিকাতা, হিন্দ প্রেস, ১৯৩৪

৪৪। ওই, পৃ. ৪০

৪৫। ওই, পৃ. ৪১

৪৬। চৌধুরী খানবাহাদুর মোহাম্মদ গাজী, *সূচনা, মোসলেম কীর্ত্তি ও ইস্‌লাম জগতের সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত,* নোয়াখালী, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৪২

৪৭। ওই

৪৮। ওই পৃ. ২১

৪৯। ওই, পৃ. ১৬০

৫০। ওই, পৃ. ১৬০

৫১। ওই, পৃ. ১৬৯

৫২। ওই, পৃ. ১৮৪

৫৩। ওই, পৃ. ১৮২

৫৪। ওই, পৃ. ১৭৯

৫৫। মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদ, *আজমীর ভ্রমণ: আগরা ও দিল্লীর চিত্র এবং তাপসবরের জীবনী সম্বলিত,* কলিকাতা, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩২৯

৫৬। ওই

৫৭। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর, *আপন হতে বাহিরে: আত্মপরিচয়ের খোঁজ ও মুসলমান বাঙালির দুটি ভ্রমণ আখ্যান,* সাম্পান, ভ্রমণসাহিত্য সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৫৪০

৫৮। মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদ, *ভূমিকা, আজমীর ভ্রমণ: আগরা ও দিল্লীর চিত্র এবং তাপসবরের জীবনী সম্বলিত,* কলিকাতা, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩২৯

৫৯। ওই, পৃ. ৬০

৬০। ওই, পৃ. ২

৬১। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর, *আপন হতে বাহিরে: আত্মপরিচয়ের খোঁজ ও মুসলমান বাঙালির দুটি ভ্রমণ আখ্যান,* সাম্পান, ভ্রমণসাহিত্য সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৫৪০ পৃ. ৫৪১

৬২। মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, *আত্ম অন্বেষায় বাঙালি মুসলমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৪০২, পৃ. ১

উপসংহার

১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম তীর্থভ্রমণ কাহিনি লেখা হয়েছিল। তার পর থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সংরূপ হিসেবে তীর্থভ্রমণ কাহিনি বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। ১৯৩৩ পরবর্তী সময়ে ভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণ কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসের সংরূপগত দূরত্ব কমতে থাকে। ভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণকে কেন্দ্র করে, তীর্থস্থানকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করে উপন্যাস রচনার নতুন প্রবণতা তৈরি হতে থাকে। এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল ১৭৭০ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় পর্বে রচিত হতে থাকা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির সম্ভাব্য বিকল্প পাঠ।

তীর্থভ্রমণ কাহিনি অভিধাটির সঙ্গে 'তীর্থ' প্রসঙ্গ যুক্ত থাকার কারণে এই ধরনের রচনাগুলিকে সাধারণভাবে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ক লেখা হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই গবেষণা সন্দর্ভে অনেকগুলি তীর্থভ্রমণ কাহিনির নিবিড় বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে স্বরূপত সংশ্লিষ্ট সময়পর্বে লেখা বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি শুধুমাত্র তীর্থের আলোচনা কেন্দ্রিক রচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি।

বরং ওই রচনাগুলিতে বাংলার ইতিহাসের একটি বিশেষ সক্রিয় সময়পর্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার নানা চিহ্নগুলি ধরা রয়েছে।

বাংলা ভ্রমণকাহিনির একটি বিশেষ অংশ হল বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি। যদিও বাংলা ভাষায় ভ্রমণকাহিনি রচনার সূত্রপাত হয়েছিল বিজয়রাম সেনের লেখা *তীর্থমঙ্গল* কাহিনির মাধ্যমে। এই গবেষণা সন্দর্ভের প্রথমে ভ্রমণ কাহিনির স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আঠারো শতকের শেষ পর্বে বাংলায় তীর্থভ্রমণ কাহিনির সূচনা হলেও এর পূর্বসূত্র হিসেবে বাংলা

সাহিত্যের মধ্যযুগের বিভিন্ন রচনার অন্তর্গত তীর্থভ্রমণের বিবরণমূলক অংশগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রচনাগুলি আঠারো শতকে লেখা *তীর্থমঙ্গল* এবং জয়নারায়ণ ঘোষালের লেখা *কাশী-পরিক্রমা* – এই দু'টি তীর্থভ্রমণ কাহিনিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। উনিশ শতকে নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি কারণের প্রেক্ষাপটে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি রচনা ও প্রকাশের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই গবেষণা সন্দর্ভে ওই কারণগুলিকে নির্দেশ করে আলোচনা করা হয়েছে বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনি লিখিত হওয়ার ইতিহাস।

১৭৭০ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি সংরূপগত দিক থেকে বিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া সেই প্রবণতাগুলির সুনির্দিষ্টকরণের কাজটি এই গবেষণা সন্দর্ভে সম্পাদিত হয়েছে। উনিশ ও বিশ শতকের তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে তীর্থের মাহাত্ম্যের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ, প্রাচীন আর্য গরিমা প্রকাশের প্রবণতা যেমন স্থান করে নিয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার এবং সাহিত্যের প্রভাবে সেই সকল কাহিনিগুলির উপস্থাপনায় উঠে এসেছে 'সেকুলার' মনোভাব। তাছাড়াও তীর্থভ্রমণ কাহিনির প্রকাশ ভঙ্গিমায় রোমান্টিক সৌন্দর্য্যচেতনা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তীর্থভ্রমণ কাহিনির 'গাইড বুকে'র দিকে যাত্রাকেও চিহ্নিত করা হয়েছে এই সন্দর্ভে। উনিশ এবং বিশ শতকের বাঙালির হিমালয়কে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতাও বিশ্লেষিত হয়েছে এখানে।

বাংলার বাইরের একাধিক তীর্থকেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনি লেখা হলেও বাংলার তীর্থকে কেন্দ্র করে কম সংখ্যায় কাহিনি তৈরির কারণ এই সন্দর্ভে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। বিশ শতকের প্রথমে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক চেতনা কীভাবে বাংলার তীর্থকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিকে প্রভাবিত করেছে- সেই বিশেষ প্রবণতাটিকে এই সন্দর্ভে

উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমে বাঙালি মুসলমানের লেখা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিকে এই গবেষণা সন্দর্ভে বিশ্লেষণ করে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে গড়ে উঠতে থাকা বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটেছে এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিতে। ধর্মীয় প্রসঙ্গের সীমা অতিক্রম করে এখানে কীভাবে এই রচনাগুলি বাঙালি মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ চেতনানির্মাণের অংশ হয়ে উঠেছে- সেই বিষয়টিও এই নিবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে।

তাই বলা যায় ১৭৭০ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বাংলা তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলিকে শুধুমাত্র ধর্ম-অন্বিত রচনা হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। এই কাহিনিগুলির বিকল্প পাঠের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বে বাঙালির চিন্তা-চেতনার নানা বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে এই তীর্থভ্রমণ কাহিনিগুলি বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান হয়ে ওঠে।

গ্রন্থপঞ্জি

অভিধান ও কোষগ্রন্থ

বাংলা

- আকাদেমি বানান উপসমিতি সম্পাদিত। *আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১।
- দাশ শিশিরকুমার সম্পাদিত। *সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী*। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০০৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। নতুন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৪।

ইংরেজি

- Childs Peter, Fowler Roger. *The Routledge Dictionary of Literary Terms*. London and New York, Routledge, 2006.
- Cuddon J. A. *Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. Wiley-Blackwell, 2013.

আকর গ্রন্থ

- অধিকারী হরকিশোর। *চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য*। চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৬
- আহমদ মৌলবী খোন্দকার গোলাম। *আজমীর ভ্রমণ: আগরা ও দিল্লীর চিত্র এবং তাপসবরের জীবনী সম্বলিত*। কলিকাতা, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৩২৯
- আহছান উল্লা খান বাহাদুর। *হেজাজ ভ্রমণ*। চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৩১
- ঘোষ পঞ্চানন। *কুলিয়ার পাট*। কুলিয়া, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩৫

- ঘোষাল জয়নারায়ণ। *কাশী-পরিক্রমা*। বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৩
- চক্রবর্ত্তী মন্মমথনাথ। *সচিত্র কাশীধাম*। কলিকাতা, শ্যামলাল চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩১৮
- চক্রবর্তী সতীশচন্দ্র সম্পাদিত। *শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*। কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯২৭
- চট্টোপাধ্যায় সূর্য্যকুমার। *কালীক্ষেত্র দীপিকা*। কলকাতা, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রকাশিত, ১৮৯১
- চৌধুরী খানবাহাদুর মোহাম্মদ গাজী। *মোসলেম কীর্ত্তি ও ইস্‌লাম জগতের সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। নোয়াখালী, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৪২
- দাস বীরেন্দ্রনাথ।*ভারতের তীর্থযাত্রা*। গয়া, মাধপ্রসাদ বর্ম্মণ প্রকাশিত, ১৩৩৬ দাস
- দাস বীরেশচন্দ্র। *কেদার-বদরীর পথে*। কলিকাতা, এম.সি. সরকার, ১৩২৮
- দেবী আনন্দময়ী। *গুরুর কৃপায় তীর্থদর্শন*। কলকাতা, সুরেশ চন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত, ১৯১০
- দেব্যা রাজলক্ষ্মী। *কেদার বদ্‌রী ভ্রমণ-কাহিনী ও অন্যান্য তীর্থচিত্র*। কলকাতা, দে'জ, ২০০৫
- ধর কন্দর্পনারায়ণ অনূদিত। *শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর মাহাত্ম্য* । জটিলবিহারী চক্রবর্তী প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৫
- ধর গোষ্ঠবিহারী। *সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী*। কলকাতা, দি বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি, ১৯১৩
- বদরুদ্দোজা মোহাম্মদ। *ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৩
- বসু দ্বিজেন্দ্রলাল।*গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী*। কলিকাতা, এস. বি চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩৩০
- মুখোপাধ্যায় ত্রিষ্টুপ সম্পাদিত। *দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা*। কলকাতা, বি এন সরকার এণ্ড কোং, ১৩৩৪

- মুখোপাধ্যায় দুর্গাচরণ। *চতুর্ধাম ও সপ্ততীর্থ*। কলিকাতা, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩৩১
- মোহাম্মদ মৌলভী হাজী এয়ার। *হজ্জ বিবরণ ও ছফরনামা*। চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৩২
- রক্ষিত দুর্গাচরণ। *সচিত্র ভারত প্রদক্ষিণ*। কলকাতা, দি বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরি, ১৩১০
- রায় মহেন্দ্রচন্দ্র। *বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ ও সাধু জীবনী*। কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০
- রায় সুরেন্দ্রনাথ। *উত্তরপশ্চিম ভ্রমণ*। কলিকাতা, পশুপতি প্রেস, ১৩১৪
- লাহিড়ী চৌধুরী ধরণীকান্ত। *ভারত ভ্রমণ*। ময়মন সিংহ, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকশিত, ১৩১৭
- *হজ্জদর্পণ রহবরে হোজ্জাজের বঙ্গানুবাদ*। কলিকাতা, হিন্দ প্রেস, ১৯৩৪
- শর্ম্মা শ্রীনন্দী। *কাশীর কিঞ্চিৎ*। বেনারস সিটি, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩২২
- শ্রীসারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ। *উত্তরাখণ্ড পরিক্রমা*। কলিকাতা, সুধাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রকাশিত, ১৩১৯
- সর্বাধিকারী যদুনাথ। *তীর্থভ্রমণ*। বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২
- সরকার কালীপদ। *বারাণসী বা কাশী*। কাশীধাম, দে, মিত্র এণ্ড কোং, ১৩৩৬
- সেন বিজয়রাম। *তীর্থমঙ্গল*। কলকাতা, পরশ পাথর প্রকাশন, ২০০৯
- সেনগুপ্ত বরদাকান্ত। *ভারত ভ্রমণ*। কলকাতা, কে সি দাঁ এণ্ড কোং, ১৮৮৪
- সেন রাজেন্দ্রকুমার। *আসাম হইতে বদ্রিকাশ্রম পরিভ্রমণ*। কলিকাতা, এস.কে. লাহিড়ী প্রকাশিত, ১৩৩২
- স্বামী রামানন্দ ভারতী। *হিমারণ্য*। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৭

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

- আনিসুজ্জামান। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০
- আহমেদ ওয়াকিল। *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা। (১ম খণ্ড)*। নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৮৩
- কবিরাজ কৃষ্ণদাস। *চৈতন্যচরিতামৃত*। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ২০০৫
- চক্রবর্তী বনানী। *বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর*। কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৩
- চট্টোপাধ্যায় অনাথবন্ধু সম্পাদিত। *বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের জলযাত্রা (কালনা থেকে রংপুর)*। কলকাতা, রূপালী, ২০১৬
- চট্টোপাধ্যায় বসন্তকুমার। *ভ্রমণ কাহিনি*। পাতাউর জামান সম্পাদিত। হুগলি, ছোঁয়া, ২০১৭
- চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্র। *পালামৌ*। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫১
- চৌধুরী মহেশচন্দ্র। *ভৌগোলিক পদ্যাবলী*। উলুবেড়িয়া। শরত চন্দ্র চৌধুরী প্রকাশিত, ১৩০০
- তর্করত্ন পঞ্চানন সম্পাদিত। *মৎস্যপুরাণম্*। কলিকাতা, নটবর চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩১৬
- দত্ত রমেশচন্দ্রের অনূদিত। *ঋগ্বেদ-সংহিতা*। কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৩৮৩
- দাশগুপ্ত কার্ত্তিকচন্দ্র। *হিমালয়ের হিমতীর্থে*। কলকাতা, পত্রলেখা, ২০১২
- দাশগুপ্ত দময়ন্তী সংগৃহীত। *আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত। (৩য় পর্ব)*। কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৯
- দাশগুপ্ত দময়ন্তী সংগৃহীত। *আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত। (২য় পর্ব)*। কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৭
- দাশগুপ্ত শান্তিকুমার, মুখুটি হরিবন্ধু সম্পাদিত। *ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী।(প্রথম খণ্ড)।* কলিকাতা, দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স, ১৩৬১

- দাস বৃন্দাবন। *চৈতন্যভাগবত*। বসু কাঞ্চন সম্পাদিত। কলকাতা, রিফ্লেক্ট, ২০০১
- ন্যায়রত্ন অজিতনাথ অনূদিত। *মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত স্কন্দ পুরাণ*। (কাশীখণ্ড)। কলকাতা, ধীরমৃতলাল মান্না ফ্রেণ্ড এবং কোম্পানি, ১২৮৬
- বন্দ্যোপাধ্যায় তারাপদ। *দার্জিলিঙ্গ-প্রবাসীর পত্র*। অভিষেক সরকার সম্পাদিত। কলকাতা পার্চমেন্ট, ২০১৮
- বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত।*সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫
- বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত। *পরিষৎ-পরিচয়*। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা
- বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ। *ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪
- বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী। *আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার*। কলকাতা, গাঙচিল, ২০০৮
- বসু মালাধর। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত। কলকাতা, দে'জ, ২০০৮
- বসু রাজশেখর সারানুবাদ।*বাল্মীকি রামায়ণ*। কলকাতা, এম. সি. সরকার, ১৩৫৩
- বসু রাজশেখর সারানুবাদ। *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত*। কলকাতা, এম. সি. সরকার, ১৩৫৬
- বিশ্বাস অচিন্ত্য সম্পাদিত। *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*। কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০২
- ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন সম্পাদিত।*বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*। কলকাতা, দে'জ, ২০০৮
- ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ। *বঙ্গভঙ্গ: স্বদেশী: বিপ্লববাদ*। কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৬

- মুখোপাধ্যায় সুবোধ কুমার, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৮
- মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ সম্পাদিত। *কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ*। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭
- রহমান মোহাম্মদ সিদ্দিকুর। *আত্ম অন্বেষায় বাঙালি মুসলমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৪০২
- *রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত*, কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেস, ১৩১৫
- রীত প্রত্যূষকুমার সম্পাদিত। *বারাণসী কথা*। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৩
- শাণ্ডিল্য কালীপ্রসাদ। *উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-বৃত্তান্ত*। কলকাতা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭০
- শাস্ত্রী শিবনাথ।*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৭
- *সচিত্র কাশীদাসী অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত*। কলিকাতা, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত। ১৩৩২
- সরকার জগদীশনারায়ণ। *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)*। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৮
- সরকার সুমিত। *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*। কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৩
- সাহা বীরেন। *আধুনিক বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ক্রমবিকাশ*। কলকাতা, গাঙচিল, ২০২০
- সেন ক্ষিতিমোহন। *ভারতের সংস্কৃতি*। (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)। কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৫০
- সেন সুকুমার। *ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা, দে'জ, ১৩৯৯

- সেন সুকুমার সম্পাদিত। *কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*। দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭
- স্বামী মেধসানন্দ। *উনিশ শতকের বারাণসী*। বিশ্বনাথ দাস অনূদিত। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫
- সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত। *আপন হতে বাহিরে: মুসলমান বাঙালি সম্পাদিত সাময়িকপত্রের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নির্বাচিত রচনা সংকলন*। কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০২২

সহায়ক গ্রন্থ

ইংরেজি

- Ahmed, Rafeuddin. *The Bengal Muslims (1871-1906): A Quest for Identity*. Delhi, Oxford University Press, 1996
- Arya, Samarendra Narayan. *History of Pilgrimage in Ancient India (AD 300-1200)*. New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 2004
- Bandyopadhyay, Shekhar. *From Plassey to Partition.* Delhi, Orient Longman, 2006
- Banerjee, Dipankar. *Brahmo Samaj and North-East India*. New Delhi, Anamika Publishers and Distributors, 2006
- Banerjee Sandeep, Basu Subho. *Secularizing the sacred, Imagining the Nation-Space: The Himalaya in Bengali travelogues 1856-1901*. (Modern Asian Studies, 49/3). Cambridge University Press, 2014
- Bharadwaj, Surinder Mohan. *Hindu Places of Pilgrimage: A Study in Cultural Geography*. Berkeley, University of California Press, 1973
- Bharati, Agehananda. *Pilgrimage in Indian Tradition.* (History of Religion, Vol. 3, No. 1). The University of Chicago Press, 1963
- Bhattacharya, Haridas Ed. *The Cultural Heritage of India, Volume IV- The Religions*. Calcutta, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1983

- Bhatt, G. P. Ed. *Ancient Indian Tradition & Mythology,* (Volume 42, The Padma Purana, part IV). Motilal Banarasi Dass, Delhi, 1990
- Chunder, Bholanauth, *The Travels of a Hindoo to Various Parts of Bengal and Upper India*. N. Trubner & Co., London, 1869
- Das Nandini and Youngs Tim Ed. *The Cambridge History of Travel Writing*. Cambridge University Press, 2019
- Daud, Ali Ed. *Invoking the Past: The Uses of History in South Asia.* Oxford University Press, 1999
- Dube, Ishita Banerjee. *Divine Affairs: Religion, Pilgrimage and the State in Colonial and Post Colonial India*. Shimla, Indian Institute of Advanced Studies, 2001
- Eck Diana L. *Indian's Tirthas: "Crossings" in the Sacred Geography*. Paul Copp & Christian K. Wedemeyer Ed, *History of Religion.* University of Chicago, 1981
- Gupta, Swarupa. *Notion of Nationhood in Bengal, Perspective on Samaj, C. 1867-1905*. Leiden Boston, BRILL, 2009
- Huddleston, G. *History of the East Indian Railway*. Calcutta, Thacker, Spink, 1906
- Jacobsen Knut A. *Pilgrimage in the Hindu Tradition Salvific space*. Routledge, New York, 2013
- Mondal, Somdatta Ed. *The Indian Travel Narratives*. Jaipur, Rawat Publications, 2010
- Morinis, E. Alan. *Pilgrimage in Hindu Tradition: A Case Study of West Bengal*. New Delhi, Oxford University Press, 1986
- Mukherjee, Hena. *The Early History of the East Indian Railway.* Calcutta, Firma KLM, 1960
- Mukhopadhyay, Bhaskar. *Writing Home, Writing Travel: The Poetics and Politics of Dwelling in Bengali Modernity*. (Comparative Studies in Socities in History, Vol-44, No. 2). Cambridge University Press, 2002
- Nandi, Ramendra Nath. *Social Root of Religion in ancient India*. Calcutta, K P Bagchi, 1986

- Raban, Jonathan. *For Love and Money: Writing- Reading- Travelling 1968-1987.* London, Picador, 1988
- Sarkar, Sumit. *Modern India (1885-1947)*. Delhi, Macmillan India, 1959
- Sen, Simonti. *Travels to Europe, Self and Other in Bengali Travel Narratives 1870-1910*. Delhi, Orient Longman, 2005
- Sherring, Rev. M.A.. *The Sacred City of the Hindus: An Account of Benares in Ancient and Modern Times*. London, 1868
- Singh, Rana P. B. *Hindu Tradition of Pilgrimage: Sacred Space and System.* New Delhi, Dev Publishers, 2013
- Smith, George. *The Life of William Carey Shoe-maker and Missionary*. London, J.M. Dent & Sons, 1909
- Thompson, Carl. *Travel Writing*. London and New York, Routledge, 2011
- Timothy Dallen J. and Olsen Daniel H. Ed. *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*. New York, Routledge, 2006

অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ

বাংলা

- রেখা ভট্টাচার্য। *বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনি* (১৭৭০-১৯৬২)। অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬

ইংরেজি

- Mukherjee, Suman. *Tourism, Leisure and Recreation in Nineteenth Century Bengal: A Socio-Cultural Study*. Unpublished Ph.D thesis. BU, 2017

বৈদ্যুতিন উৎস

- himalaya.socanth.cam.ac.uk: Deb, Arabinda. Tibet and Bengal: A Study -in Trade Policy and Trade Pattern (1775-1875)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrimage
- https://en.wikipedia.org/wiki/Travel_literature
- https://en.wikipedia.org/wiki/Tirtha

পত্র-পত্রিকা

বাংলা

- মিশ্র সুবিমল। *উনিশ শতক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য*। সাম্পান ভ্রমণসাহিত্য সংখ্যা জানুয়ারি ২০২২
- লাহিড়ী রণবীর। *বাঙালি ভদ্রলোকের হিমালয় দর্শন*। ভাষাবন্ধন শারদীয়া ২০০৭
- বন্দ্যোপাধ্যায় তাপস। *শক্তিপীঠের উৎসের খোঁজে*। সপ্তডিঙা কালীপুজো সংখ্যা ১৪২৫
- সেন সীমন্তী। উনিশ শতকে বাঙাল ভ্রমণকারীর বিলেত বৃত্তান্ত। বিতর্কিকা মাঘ ১৪০৬
- সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর। *বাঙালির ভ্রমণ, ভ্রমণকাহিনি এবং তীর্থভ্রমণ বিষয়ে একটি প্রস্তাব*। অনুষ্টুপ প্রাক্ শারদীয়া ২০১২
- সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর। *আপন হতে বাহিরে: আত্মপরিচয়ের খোঁজ ও মুসলমান বাঙালির দুটি ভ্রমণ আখ্যান*। সাম্পান ভ্রমণসাহিত্য সংখ্যা জানুয়ারি ২০২২

ইংরেজি

- Bray, John. *Krishnakanta Basu, Rammohan Roy and Early 19th Century British contacts with Bhutan and Tibet*. The Tibet Journal Vol.34/35 No.3/2 Autumn 2009-Summer 2010
- Sen, Simonti. *Emergence of Secular Travel in Bengali Cultural Universe: Some Passing Thoughts*. Rupkatha Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities Vol. 12 No. 3 2020